সাংবাদিকতার হালচাল

এটি নিয়মিত সংবাদপত্র নয়। দেশের সংবাদমাধ্যম শিল্পকে কেন্দ্র করে চলমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের লক্ষ্যে দৃকের প্রকাশিত এককালীন বুলেটিন।

বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ । ৯ আশ্বিন ১৪৩৩ । ১২ রবিউস সানি ১৪৪৮ ৪০ পৃষ্ঠা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

সংবাদমাধ্যমে অব্যাহত দখল ও ছাঁটাই সংস্কৃতি

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পরপরই বেসরকারি চ্যানেল এনটিভির গাড়ি ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। খামারবাড়ি, ঢাকা। ৫ আগস্ট ২০২৪। *আলোকচিত্রী: এস এম আরিফুল আমিন*

সামিয়া রহমান প্রিমা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরপরই সংবাদমাধ্যমগুলোতে নৈরাজ্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে গণমাধ্যমের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি হলেও পূর্বের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। আওয়ামী পন্থী নেতৃত্বকে সরিয়ে সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ বা দখলে নিয়েছে ক্ষমতামুখী নতুন নেতৃত্ব। দেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ও চাকরিচ্যুত সাবেক সংবাদকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অন্তত ৪০টি সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। শুধু ঢাকাতেই চাকরি হারানোর সংখ্যা দুই শতাধিক। বার্তাকক্ষগুলোতে নেই কোনও স্থিতিশীলতা। মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রথমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও পরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় সংবাদমাধ্যমের এই রদবদল ঘটেছে। নিষ্ক্রিয় ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

প্রতিনিয়ত কর্মস্থলে চাকরি হারানোর ভয়ে দিন পার করছেন সাধারণ সংবাদকর্মীরা। তাদের অভিযোগ, বার্তাকক্ষে নতুন নেতৃত্ব পাওয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যোগ্যতা নয়, বরং তাদের অনুগত কর্মীর সন্ধানে আছেন। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ চাকরি হারাচ্ছেন, আবার নতুন কর্মী নিয়োগ পাচ্ছেন।

৫ আগস্টের পর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষার্থী নেতা নাহিদ ইসলাম। প্রায় সাত মাস পর পদত্যাগ করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি মাহফুজ আলম। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম বিশ্লেষকদের মতে, জুলাইয়ের সম্মুখসারির এই দুইজন নেতা ক্ষমতার আসনে বসেও কোনো পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেননি। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বার্থে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার পতন ও সংবাদমাধ্যমে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাট

৫ আগস্ট ২০২৪। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা, শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার খবর দেশবাসী জানেন। জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতার ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো পুলিশ তখন জনরোষের ভয়ে রাস্তা ছেড়েছে। এই সুযোগেই সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলা চালাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী। সেদিন ঢাকায় কমপক্ষে পাঁচটি বেসরকারি টেলিভিশন কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়। *সময় টিভি*-তে হামলার ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএনপির অঙ্গসংগঠন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন। হামলাকারীরা তৎকালীন পরিচালক আহমেদ জোবায়েরের কাছ থেকে দুই কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরের দিন ৬ আগস্ট, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ছাত্রশিবিরের একটি দলও টেলিভিশনটির কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় বলে জানিয়েছেন সংবাদকর্মীরা।

ফেসবুকে একটি ভিডিওতে লক্ষ করা যায়, একজন হামলাকারী চেঁচিয়ে বলছেন, 'ইনশাআল্লাহ সময় টিভি আমরা দখলে নিলাম।' এই হামলায় সাংবাদিকেরা নির্যাতনের শিকার হন।

একই সময়ে রাজধানীর বারিধারায় *একাত্তর টেলিভিশনে*-র কার্যালয়ের সামনে একাধিক গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। কার্যালয়ের ভেতরেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। কারওয়ান বাজারেও বেসরকারি চ্যানেল *এটিএন নিউজ*-এর সামনে প্রতিষ্ঠানটির গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই মালিকানার প্রতিষ্ঠান *এটিএন বাংলা*-র সামনেও গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন দেওয়া হয়। টেলিভিশনটির কার্যালয়ের ভেতরেও হামলা চালানো হয়। তেজগাঁওয়ে *ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন*-এর কার্যালয়ের নিচেও একই পদ্ধতিতে চলে ভাঙচুর।

এসব ঘটনায় লুটপাট হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এ সকল কার্যালয়ে হামলার পেছনে কারণ হিসেবে এসেছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে জুলাই আন্দোলনে একতরফাভাবে শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষপাতিত্ব করা হয়। পুলিশি হত্যাকাণ্ড ও এর বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিবাদের বাস্তব ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষার্থী-জনতার আন্দোলনকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

মালিকানার হাতবদল ও নির্বিচার ছাঁটাই

সংবাদমাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি শুধু ২০২৪-এর ৫ আগস্টেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে দখল সংস্কৃতি ও একের পর এক চাকরিচ্যুত করার ঘটনা।

একাত্তর টেলিভিশন এ যখন হামলা চলে, তখন প্রতিষ্ঠানটির সংবাদকর্মীরা জানতে পারেন বিএনপি বিটের সিনিয়র রিপোর্টার শফিক আহমেদ মালিকপক্ষ মেঘনা গ্রুপের সাথে মিটিংয়ে বসেছেন। প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও ভাঙচুর ঠেকাতে বিএনপির নেতাদের সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় নিকটবর্তী আরেকটি ভবনের গ্যারেজে আশ্রয় নেন সংবাদকর্মীরা। হামলাকারীরা সরে গেলে একপর্যায়ে কর্মস্থলে প্রবেশ করেন। রাত ১২টার পর বার্তাকক্ষে এসে শফিক আহমেদ জানান, *একাত্তর টিভি*-র বার্তা প্রধান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এসব পদে যারা বহাল ছিলেন তাদের বা পূর্বের সরকার-ঘনিষ্ঠ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত করা হবে। এরপর থেকেই চলতে থাকে একের পর এক ছাঁটাই। এই প্রতিষ্ঠানের একাধিক সংবাদকর্মী জানান, শফিক আহমেদ দায়িত্ব নেওয়ার পরবর্তী দেড় বছরে প্রতিনিয়ত চাকরি হারানোর ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বের হর্তাকর্তা সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু ও সাবেক বার্তা প্রধান শাকিল আহমেদ ও সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রূপা একাধিক হত্যা মামলায় এখনও কারাগারে আছেন। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের পতনের পর এই কর্মস্থলে তারা আর প্রবেশ করেননি।

একুশে টিভি-তে কর্মরত একজন সাংবাদিক জানান ৫ আগস্ট রাতের মধ্যেই কীভাবে মালিকানার বদল ঘটল।

এই সাংবাদিকের বর্ণনামতে, 'এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজে ততক্ষণে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের নিচে গাড়িতে জ্বলছে আগুন, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আমার অফিসের সামনে থেকেই দেখা যাচ্ছে। এ সময় হুট করেই প্রায় ১০ বছর আগে মালিকানা হারানো আব্দুস সালাম স্যার ও তার স্ত্রীকে একটি গাড়িতে করে বাসা থেকে নিয়ে এসেছেন তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রবিউল হাসান অভী। অফিসের নিচে বিএনপির কিছু কর্মীকে লাঠি হাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো, যাতে ভাঙচুর ঠেকানো যায়। সালাম স্যার ওপরে উঠতেই সবাই স্বাগত জানালেন। অবশ্য অনেকেরই *৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

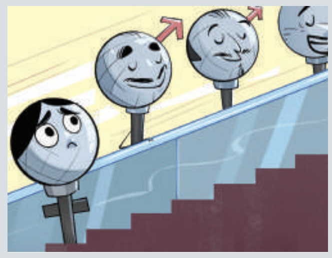

'আমরা সাংবাদিক, কারও মা-বোন না' পৃষ্ঠা ৭

নেকড়ের নয়া পাল? পৃষ্ঠা ৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম: সামরিক-বেসামরিক নজরদারিতে বন্দী সাংবাদিকতা পৃষ্ঠা ১৯

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার হিসাব পৃষ্ঠা ১৩

জুলাই শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের মোবাইলে তার নিজের একটি ভিডিও পাওয়া যায়, সেখান থেকে এই স্ক্রিনগ্র্যাবটি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন ও হাসিনা সরকার পতনের পর, শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি আঁকেন দেশজুড়ে। সংবাদমাধ্যমকে কেন্দ্র করে এই গ্রাফিতিটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আঁকা, সিলেট। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

আলোকচিত্রী: এএসএম রাহাত খান/দৃক

সম্পাদনা দল
সায়দিয়া গুলরুখ
সামিয়া রহমান প্রিমা
মীর হুযাইফা আল-মামদূহ

কপি এডিটিং
রেহনুমা আহমেদ

গবেষক দল
ইসাবা শুহরাত
সায়রাত সালেকীন
নাফিসা নাওয়াল
পারভেজ আহমদ রনি

গ্রাফিক ডিজাইন
মনোরঞ্জন রায়
শিমুল চৌধুরী

কার্টুন
মেহেদী হক

মুদ্রণ সংশোধন
আহমেদ শাহেদ

উপদেষ্টাগণ
মো. কামাল হোসেন
এএসএম রেজাউর রহমান
শহিদুল আলম

পৃষ্ঠাবিন্যাস ও নকশা
মো. মোজাম্মেল সরকার

সম্পাদকীয়

১৮ জুলাই ২০২৪। শহীদ মীর মুগ্ধ ফেসবুকে স্ট্যাটাস পোস্ট করেছিলেন, 'একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনি আমিই এখন মিডিয়া। দেশে আর কোনও মিডিয়া নাই। যারা ছিল তারা নিজেদের বেইচ্চা দিছে।' এই স্ট্যাটাস লেখার কয়েক ঘন্টা পরে উত্তরায় পুলিশের গুলিতে মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ শহীদ হন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে দেশের গণমাধ্যমগুলো আওয়ামী প্রোপাগান্ডা প্রচারেই ব্যস্ত ছিল। ২৪শে জুলাই দেশের মানুষ যখন ক্ষোভে, শোকে উত্তাল, তখন শেখ হাসিনার সাথে এক মতবিনিময় সভায় নেতৃস্থানীয় অনেক সাংবাদিক আওয়ামী লীগের শাসনে আস্থা প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনকারীদের 'দুস্কৃতকারী' খেতাব দিয়ে শক্ত হাতে দমন করার কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে আওয়ামী মন্ত্রী-সাংসদ, অর্থনৈতিকভাবে প্রতাপশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসাজশে মিডিয়া সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মিডিয়াকে কব্জা করে ফেলে। কখনও বিরোধী দলের নেতা কিংবা বিরুদ্ধ মতের অধিকারীকে টকশো-তে হেনস্তা করে জনপরিসরে হামলা-মামলা-গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে ফেলার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে, আবার কখনও সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে জনরোষকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার – অর্থাৎ, মিডিয়া জনগণের মনোযোগ সরানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। মিডিয়া হয়ে উঠেছিল শাসনের অনুষঙ্গ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের চোখে সাংবাদিক হয়ে ওঠে 'সাংঘাতিক', গড়পরতায় জনগণ মিডিয়ার উপর আস্থা হারায় যে অনাস্থার প্রতিফলনই দেখি আমরা শহীদ মীর মুগ্ধের ফেসবুক পোস্টে। শুধু মীর মুগ্ধ না, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ঢাকায় অনেক জায়গাতেই আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের ছবি তুলতে, বা সংবাদ সংগ্রহে বাধা প্রদান করেছে। তবে এই নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বাস্তবতাতেও অনেক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে এবং অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি, কীভাবে জুম্মাতুল বিদা, শামীমা সুলতানা লাবু, নাদিয়া শারমিন – পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, গুলি, ছাত্রলীগের হামলা উপেক্ষা করে ও আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সারাদেশে ছয়জন সাংবাদিক – মেহেদী হাসান, শাকিল হোসেন পারভেজ, তাহির জামান প্রিয়, আবু তাহের মো. তুরাব, প্রদীপ কুমার ভৌমিক ও সোহেল আখঞ্জী, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক সাংবাদিক। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত সাংবাদিকগণ তাদের সাহসিকতার মাধ্যমে বাংলাদেশে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ধারার মৃত্যুকে প্রতিহত করেছেন। তাদের সাহস ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে সংবাদমাধ্যমের বাস্তবতা ও রাজনীতি প্রসঙ্গে এই এককালীন প্রকাশনা বের করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। কমিশনটি সারা দেশে সাংবাদিক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটা প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রদান করেন। তারা মিডিয়া সেক্টরে একচেটিয়া ক্ষমতা, শাসকের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠাকে প্রতিরোধের নানা প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত পদক্ষেপ প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা ছাড়া সরকার গণমাধ্যম সংস্কার প্রশ্নে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। একদিকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচ্যসূচি থেকে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন বাদ পড়ে। অন্যদিকে, প্রায় প্রকাশ্যেই চলে প্রিন্ট, ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে মালিকানার দখল-বেদখল-পাল্টা দখলের প্রক্রিয়া। দেশজুড়ে সাংবাদিক সংগঠন ও প্রেস ক্লাব গুলোতে একই দলীয়করণের চিত্র দেখা যায়।

সাইবার সিকিউরিটি আইনের নিপীড়নমূলক ধারাগুলো বাতিল করা হয়, কিন্তু তার পরিবর্তে মিথ্যা খুনের ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দিয়ে আওয়ামীপন্থী সাংবাদিকদের হয়রানির নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ট্যাগিংয়ের রাজনীতির অবসানের বদলে নতুন ট্যাগ ও নতুন হয়রানির বাস্তবতা তৈরি হয়। পতিত সরকারের আজ্ঞাবাহী-সুবিধাভোগী প্রভাবশালী সাংবাদিকদের জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় কিছু প্রশ্ন সামনে আসে: ফ্যাসিবাদী সরকারকে বৈধতাদানকারী সাংবাদিকতাকে কী আইনগতভাবে বিচারের আওতায় আনা যায়? মতাদর্শিক অপরাধের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার আইনগত কাঠামো বা প্রক্রিয়া কী হবে? এই জরুরি প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখেই ঢালাওভাবে হত্যা মামলা, গ্রেপ্তার, ও হয়রানি অব্যাহত থাকে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতন, ডানপন্থী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের উত্থান, অন্তর্বর্তী সরকারের ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভিত্তিক নিউজ পোর্টালগুলোকে মতাদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। খবর উৎপাদন ও তথ্য প্রবাহের ময়দান সবসময়ই মতাদর্শিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র, কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনসহ নানাবিধ হামলা-মামলা-গুমের ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল – একটি রাজনৈতিক রূপান্তরকালীন সময়কালে 'সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক সাংবাদিকতা' লাগামহীন রূপ লাভ করে, যার চূড়ান্ত প্রতিফলন আমরা দেখি *দ্য ডেইলি স্টার* ও *প্রথম আলো*-তে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচার, সংবাদের মাধ্যমে চরিত্রহনন, নারীবিদ্বেষী কনটেন্ট ছড়ানো, মব তৈরি করে খবর বানানো বা খবর হয়ে ওঠার ঘটনা, আরও কিছু জরুরি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে: কনটেন্ট নির্মাতা মাত্রই কী সাংবাদিক? 'ক্ষতিকর সাংবাদিকতা'র ভিকটিম প্রতিকারের জন্য কোথায় যাবেন?

তবে বাংলাদেশে মিডিয়া সেক্টরের কিছু কাঠামোগত দিক আছে যা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারেও অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে – যেমন সাংবাদিকের লঙ্ঘিত শ্রম অধিকার, মিডিয়া হাউজগুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠনে অনাগ্রহ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবাদিকতার উপর সামরিক-বেসামরিক নজরদারি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গণমাধ্যম সংস্কারের প্রশ্নটিকে উত্থাপন করলেও দ্রুত ফাইল বন্দী করে। এখন নতুন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায়। গণমাধ্যম সংস্কার প্রশ্নকে আবারও জনপরিসরে উত্থাপন করার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রকাশনা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার: সংবাদমাধ্যমে অব্যাহত দখল ও ছাঁটাই সংস্কৃতি

১-এর পৃষ্ঠার পর
মুখ বেশ শুকনো ছিল। ততক্ষণে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে সালাম স্যার একুশে টিভির নিয়ন্ত্রণ ফেরত পেয়েছেন।

আওয়ামী আমলে তার মালিকানা হাতছাড়া হওয়ার পর যারা চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন, তাদের ঢল নামল অফিসে। সালাম স্যার মালিকানা ফেরত পেয়ে পুনরায় চেয়ারম্যান হলেন এবং তার স্ত্রী তাসনুভা মাহবুব সালাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। এরই মধ্যে রবিউল হাসান অভী পদত্যাগ করেছেন। এরপর পুরাতন কর্মীদের অনেকেই কাজ শুরু করলেন।'

৫ আগস্টের পর *একুশে টিভি*-র প্রায় সব বিভাগেই পূর্ব মালিকানা এস আলম গ্রুপ কর্তৃক নিয়োগকৃত বা পূর্বের মালিকপন্থী কর্মীরা চাকরিচ্যুত হয়েছেন। একইসঙ্গে এক ঝাঁক কর্মী নিয়োগ পান। বিশেষ করে বার্তা প্রধান রাশেদ চৌধুরীকে সরিয়ে এই পদে নিয়োগ পান হারুন অর রশীদ। হাসান জাকির হলেন চিফ নিউজ এডিটর (সিএনই)। এ ছাড়া মঞ্জুরুল আলম পান্না, পবন আহমেদ, আলী আহম্মেদ, সঞ্জয় অধিকারীসহ অনেকেই নতুন নিয়োগ পান। পরের কয়েক দিনের মধ্যে চাকরি হারালেন ডেপুটি হেড অব নিউজ সাঈফ ইসলাম দিলাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক সংবাদ প্রধান আতিয়ার রহমান সবুজ।

মূলত ৫ আগস্টের পর সংবাদমাধ্যম-গুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত উচ্চপদস্থরা কর্মস্থলে ফেরেন নাই। পরবর্তী সময়ে অনেকে ফেরার চেষ্টা করলে তাদের কর্মস্থলে ফিরতে নিষেধ করা হয়। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদেও পরিবর্তন আনা হয়।

ডিবিসি নিউজ টেলিভিশনের শীর্ষ পদে থাকা সম্পাদক জায়েদুল আহসান পিন্টু, সম্পাদক প্রণব সাহা, বার্তা প্রধান নঈম তারিক ও অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর মাসুদ কার্জন বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরিচ্যুত হন। পাশাপাশি সিনিয়র রিপোর্টার কাওসারা চৌধুরী কুমু, নাদিম মাহমুদসহ কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিবেদক চাকরিচ্যুত হন। বিএনপি ঘনিষ্ঠ দৈনিক সমকাল-এর সহযোগী সম্পাদক লোটন একরাম *ডিবিসি*তে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পান। তবে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী স্বপদে বহাল আছেন। প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জুরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও কোনো পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তারা কর্মস্থলে ফেরেননি।

বৈশাখী টিভি থেকে আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী বার্তা প্রধান অশোক চৌধুরী পদ ছাড়তে বাধ্য হন। একসময় *দিগন্ত টিভি*-তে (আওয়ামী আমলে বন্ধ প্রতিষ্ঠান) কাজ করা জিয়াউল কবির সুমন এই পদে নিয়োগ পান। প্রধান বার্তা সম্পাদক সাইফুল ইসলামকে সরিয়ে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় দীর্ঘদিন বিএনপি বিটে কর্মরত তৌহিদুল ইসলাম শান্তকে। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন সংবাদকর্মী ও প্রতিবেদক চাকরিচ্যুত হন।

দৈনিক পত্রিকা *সমকাল*-এর সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থক আলমগীর হোসেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হা-মীম গ্রুপের মালিক আবুল কালাম আজাদ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন। দৈনিক *যুগান্তর*-এর সম্পাদক সাইফুল আলম পদত্যাগ করলে সম্পাদকের দায়িত্ব নেন বিএনপি-সংশ্লিষ্ট কবি আবদুল হাই শিকদার। দৈনিক *দেশ রূপান্তর* থেকে মোস্তফা মামুন পদত্যাগ করলে সম্পাদকের দায়িত্ব নেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ।

বেক্সিমকো গ্রুপের *ইনডিপেনডেন্ট টিভি*-র প্রধান বার্তা সম্পাদক আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ আশীষ সৈকত শেখ হাসিনার পতনের পর আর কর্মস্থলে ফেরেননি। পরবর্তী সময়ে বিএনপি-ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক মোস্তফা আকমলকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। দেশ টিভি-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান আওয়ামী লীগের পতনের পর কারাগারে আছেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেও আওয়ামী লীগ বিটের প্রতিবেদকসহ বেশ কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

নাগরিক টিভি থেকে বার্তা প্রধান দীপ আজাদ ও উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন আওয়ামী-সমর্থক সাংবাদিক হাসিনা সরকারের পতনের পর পদত্যাগ করেন। মোহাম্মদী গ্রুপ ও পোশাক কারখানার মালিক রুবানা হকের মালিকানাধীন এই বেসরকারি চ্যানেল থেকে কমপক্ষে ৪০ জন সংবাদকর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। *এটিএন বাংলা* থেকে চাকরিচ্যুত হন প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জ ই মামুন এবং *এটিএন নিউজ* থেকে চাকরিচ্যুত হন বার্তা প্রধান প্রভাষ আমীন। দৈনিক *মানবজমিন* পত্রিকায় কর্মমত থাকাকালীন শহীদুল আজম *এটিএন নিউজ*-এ বার্তা প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান।

২০২৪-এর ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হাসনাত আব্দুল্লাহ একটি দল নিয়ে *সময় টিভি*-র বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপের কার্যালয়ে গিয়ে এই টিভি থেকে প্রায় ১০ জনকে চাকরিচ্যুত করার তালিকা দেন। এই ঘটনায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ মিললেও সিটি গ্রুপের সাথে দেখা করার বিষয়টি অস্বীকার করেননি হাসনাত আব্দুল্লাহ। পরবর্তী সময়ে *সময় টিভি* থেকে কয়েকজনকে জোরপূর্বক অব্যাহতি দেওয়া হয়। সিটি গ্রুপের পরিচালক শম্পা রহমানকে এই টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরিচ্যুতদের মধ্যে রয়েছেন ইনপুট এডিটর ওমর ফারুক, আউটপুট এডিটর আরিফুল সাজ্জাদ, ডিজিটাল হেড কামাল শাহরিয়ার, সহযোগী বিশেষ প্রতিবেদক দেবাশীষ রায় ও সিনিয়র রিপোর্টার বুলবুল রেজা, লোপা আহমেদ, খান মুহাম্মদ রুমেলসহ অনেকেই।

জোরপূর্বক চাকরিচ্যুতদের বাইরে যারা স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়েছেন অনেকেই। তারা জানান, কর্মস্থলে বিভিন্ন সুবিধা বাতিল করা থেকে শুরু করে নানা উপায়ে একটি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করার ফলে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি-বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীকে প্রশ্ন করার জেরে তিনটি বেসরকারি চ্যানেল থেকে তিনজন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এই তিনজন হলেন চ্যানেল আই এর সাংবাদিক রফিকুল বাসার, *দীপ্ত টিভি*-র সাংবাদিক মিজানুর রহমান ও এটিএন বাংলা-র সাংবাদিক ফজলে রাব্বি। এই সংবাদ সম্মেলন বা ঘটনার পরের দিন *দীপ্ত টিভি* তাদের স্ক্রলে জানায়, সংবাদ সম্প্রচার বন্ধ রয়েছে। বেলা দুইটার পর থেকে মোট পাঁচটি বুলেটিন প্রচারিত হয়নি। রাত ১১টায় আবার সংবাদে ফেরে তারা।

সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, বিশেষ করে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স (জেআরএ) ফেসবুক পেজ থেকে তিনজন সাংবাদিকের ছবিসহ বারবার পোস্ট দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানায়, এই তিনজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে মব এড়ানোর লক্ষ্যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরপর চাকরিচ্যুতির ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেন। চাকরি চলে যাওয়ার বিষয়ে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই জানিয়ে তিনি লেখেন, 'প্রত্যেক চ্যানেলেরই নিজস্ব এডিটরিয়াল পলিসি থাকে। তারা সেই পলিসির আলোকে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা তাদের ব্যাপার।'

দীপ্ত টিভি-র সংবাদ সম্প্রচার সাময়িক বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, 'সংবাদ কার্যক্রম বন্ধ করতে সরকার বলেনি। জুলাই গণহত্যার পক্ষ নিয়ে প্রশ্ন করায় টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আওয়ামী লীগ আমলে যেই প্রক্রিয়ায় টিভি চ্যানেল অনুমোদন পায় ঠিক একই প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ' নেক্সট টিভি' ও 'লাইভ টিভি' অনুমোদন পান। *নেক্সট টিভি*-র লাইসেন্স নেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন, যিনি এর আগে একটি ইংরেজি দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। *লাইভ টিভি* লাইসেন্স পান এনসিপি-ঘনিষ্ঠ আরিফুর রহমান, যিনি শিক্ষার্থী থাকাকালীন আরেকটি দৈনিকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ছিলেন।

আওয়ামী লীগের টানা চার মেয়াদের কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে দলের রাজনীতিক ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের প্রায় ৩০টি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব চ্যানেলের নিরপেক্ষতা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। এ ছাড়া গণঅভ্যুত্থানের পর সম্প্রচারে এসেছে *স্টার নিউজ* নামে আরেকটি বেসরকারি চ্যানেল। এই টিভির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, যা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী-সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য, আওয়ামী আমলে বন্ধ হওয়া সংবাদমাধ্যমের মধ্যে চ্যানেল ওয়ান পুনরায় কার্যক্রম শুরু করেছে। কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়ায় আছে *দিগন্ত টিভি*। ২০২৪-এর সরকার পতনের পর দৈনিক *আমার দেশ* পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে।

গণঅভ্যুত্থানের আগে-পরে বসুন্ধরা গ্রুপের মিডিয়া হালচাল

বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন দৈনিক *কালের কণ্ঠ* ১৯ জুলাই থেকে পুলিশের গুলিতে ঢাকার রাস্তায় মানুষের নিহত হওয়ার সংখ্যা প্রকাশ করা হলেও প্রথম পাতায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করা হতো। পত্রিকাটিতে কর্মরত একজন সাংবাদিক জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির নিউজ বা দলীয় প্রোপাগান্ডা নিয়মিত প্রথম ও শেষ পাতায় প্রায় হুবহু ছাপা হতো। ভেতরের পাতাগুলোতে মাঝে মাঝে রাখা হতো 'সংঘর্ষ' এর ছবি। এসব তদারকি করতেন উপসম্পাদক হায়দার আলী। রাজনৈতিক রিপোর্ট তদারকি করতেন আওয়ামী লীগ বিটের তৎকালীন রিপোর্টার তৈমুর ফারুক তুষার (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে)। পরবর্তী দিনগুলোতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।

যেমন ৪ আগস্ট ২০২৪ গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ হত্যাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রধান শিরোনাম করা হয়, '*২০ জেলায় ১৪ পুলিশসহ নিহত ৯৭*'এবং পাশাপাশি রাখা হয় শেখ হাসিনার বক্তব্য '*নৈরাজ্যবাদীদের কঠোর হাতে দমনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর*'। পরদিন ৫ আগস্ট এই খবর প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তৃতীয় পাতায় বিএনপিসহ সরকারের সমালোচনাকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য ও অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবাদের খবর ছাপা হতো।

৫ আগস্ট ২০২৪, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর এই পলিসি সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। সেদিন বিকেল নাগাদ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদকেরা জানতে পারেন, মূল পত্রিকার সাথে 'জ্যাকেট পাতা'যুক্ত করা হবে এবং '*কোটা আন্দোলন থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান*' শিরোনামে একটি টাইমলাইন প্রকাশ করা হবে, যা ৬ আগস্ট ২০২৪ প্রকাশিত হয়। টাইমলাইনটি প্রস্তুতের পর উপসম্পাদক হায়দার আলী সেখানে জুলাই শহীদ আবু সাঈদের ছবি রাখার নির্দেশ দেন। সেদিন কট্টর আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাংবাদিকরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

৫ আগস্ট ২০২৪-পরবর্তী সময়ে বসুন্ধরা গ্রুপের অতীত কর্মকাণ্ড তথা পতিত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে এই পত্রিকার সংবাদকর্মীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। একই সঙ্গে তারা লক্ষ করেন, *কালের কণ্ঠ* কার্যালয়ে অন্তত দুইবার এসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ঘন ঘন সাক্ষাৎ করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান।

এই আগস্ট মাসেই বিএনপির পদধারী সাংবাদিক নেতা কাদের গনি চৌধুরীকে বসুন্ধরার ইস্ট ওয়েস্টে মিডিয়া গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে এই নিয়োগে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট হন। একইসাথে দলটিতে তার পদ স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে বসুন্ধরা মালিকানাধীন বেসরকারি চ্যানেল *নিউজ টোয়েন্টিফোর*-এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। আর কাদের গনি চৌধুরীর স্থলে কারামুক্ত হওয়ার পর বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বন্ধু ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন নিয়োগ পান।

ইমদাদুল হক মিলনকে সরিয়ে ২৭ আগস্ট ২০২৪ কালের কণ্ঠের সম্পাদক হন জাতীয় প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিএনপিপন্থী হিসেবে পরিচিত সাংবাদিক হাসান হাফিজ। এছাড়া এই পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ পান বিএনপিপন্থী একাধিক সংবাদকর্মী।

২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী একটি মব তৈরি করলে প্রভাবশালী কর্মী হায়দার আলী *কালের কণ্ঠ* থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তাকে বসুন্ধরা ল্যান্ড বিভাগে যুক্ত করা হয়। কয়েক মাস পর তিনি আবারও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে এই পত্রিকায় ফেরেন। এ সময় যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পান বিএনপিপন্থী সাংবাদিক নেতা হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান। সাঈদ খান নিয়োগের পর হায়দার আলীর সঙ্গে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে *কালের কণ্ঠ*-এর কর্মীদের বেতন বিলম্বিত হয়ে পড়ে।

২০২৪-এর অক্টোবরে জুলাই শহীদ আবু সাঈদের ভাই রমজান আলীকে *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এর রংপুর ব্যুরো অফিসের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী এবং আরেক ভাই আবু হোসেনকে টিভি চ্যানেল *নিউজ টোয়েন্টিফোর*-এর রংপুর ব্যুরো অফিসের জ্যেষ্ঠ নিবার্হী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে দুই ভাইয়ের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার খবর জানান আবু সাঈদের পরিবার।

বসুন্ধরা গ্রুপ মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল *নিউজ টোয়েন্টিফোর*-এর আওয়ামী-ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী নির্বাহী সম্পাদক রাহুল রাহাকে সরিয়ে একই বার্তাকক্ষের ফরহাদুল ইসলাম ফরিদকে এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বার্তা প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সকল পদে পরিবর্তন আনা হয়। অনলাইন মিডিয়া *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর*-এর প্রধান সম্পাদক জুয়েল মাজহারের পদে নিয়োগ পান লুৎফর রহমান হিমেল। পরবর্তীতে এই পদে পরিবর্তন আসে, যোগ দেন তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।

উল্লেখ্য, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে বসুন্ধরা গ্রুপ মালিকানাধীন সকল সংবাদমাধ্যমে যথা কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর, নিউজ টোয়েন্টিফোর ও রেডিও ক্যাপিটালের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক আয়াতুল্লাহ বেহেশতীর নেতৃত্বে একাধিক তরুণকে সমন্বয়ক পরিচয়ে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের সঙ্গে সরাসরি কাজ করতে দেখা যায়।

জনকণ্ঠ পত্রিকায় দেড় বছরে ধারাবাহিক অস্থিরতা

দৈনিক পত্রিকা *জনকণ্ঠ*-তে দফায় দফায় হামলা, লুটপাট ও ছাঁটাইসহ অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা ঘটে। ঘটনার সূত্রপাত ধরা যায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শেষ সময় থেকেই। ২৬ জুলাই ২০২৪, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর- ডিজিএফআইয়ের সাবেক কর্মকর্তা মেজর (অব.) আফিজুর রহমান আফিজ *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) হিসেবে নিযুক্ত হন। জনাব আফিজ সাধারণত নিজেকে 'বঙ্গবন্ধু গবেষক' হিসেবেও পরিচয় দেন। আওয়ামী আমলে বিতর্কিত ব্যবসায়ী চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের পত্রিকা *দৈনিক বাংলা*-র নির্বাহী পরিচালক ছিলেন এবং পতিত তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহযোগীও ছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে যে আত্মীয়তার সূত্রে জামায়াতে ইসলামীর সাথেও ওনার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এই ব্যক্তি পত্রিকাটিতে যোগদানের কয়েক দিনের

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক *যায়যায়দিন* এর মালিকানা বদল

৯০ দিনের মধ্যে দখল, ডিক্লারেশন বাতিল ও প্রত্যাবর্তন

ডিসেম্বর ২০২৪ - মার্চ ২০২৫

২০০৭ সালে তৎকালীন সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাবে *যায়যায়দিন* পত্রিকাটির মালিকানার বদল ঘটে। জোরপূর্বক যায়যায়দিন পাবলিকেসন্স এর শেয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শফিক রেহমানের কাছ থেকে এইচআরসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সাঈদ হোসেন চৌধুরীর কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ১৭ জুলাই ২০০৭ অতিরিক্ত ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হয়ে প্রকাশক হিসেবে পদ ছাড়তে বাধ্য হন শফিক রেহমান। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক নিপীড়নের শিকার হয়ে ২০১৮ সালে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। যুক্তরাজ্যে প্রবাস জীবন কাটিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ এর আগস্টে দেশে ফেরেন *যায়যায়দিন* এর এই প্রতিষ্ঠাতা।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক *যায়যায়দিন* পত্রিকার প্রধান কার্যালয় ও ছাপাখানা দখলের অভিযোগ ওঠে। মূল লোগোর সাথে হুবুহু মিল রেখে দৈনিক "*যায়যায়দিন প্রতিদিন*" নামে নতুন প্রকাশনা বের হয়। এসময় মূল পত্রিকার সাংবাদিকরা জানান এ ধরনের কার্যক্রম অবৈধ ও অনৈতিক। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয়ে কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন সাংবাদিকরা।

১১ মার্চ ২০২৫

সাবেক সম্পাদক ও প্রকাশক শফিক রেহমানের তরফ থেকে প্রকাশনার নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ঢাকা জেলা প্রশাসন *যায়যায়দিন* পত্রিকাটির ডিক্লারেশন বাতিল করে। ফলে হঠাৎ করেই কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রায় ৭০০ সংবাদকর্মী। বাতিল করার ৭ দিনের মধ্যেই শফিক রেহমানকে পত্রিকাটির 'ডিক্লারেশন' ফেরত দেয়া হয়।

১২ মার্চ ২০২৫

ভবন ও ছাপাখানা দখলের পাল্টা অভিযোগ জানান তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জানান, সাংবাদিক শফিক রেহমানকে সামনে রেখে একটি চক্র তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় এইচআরসি মিডিয়া ভবন ও ছাপাখানা দখল করার কারণে, ভিন্ন ছাপাখানা থেকে পত্রিকাটি বের করতে হয়। এই ভিন্ন ছাপাখানা থেকে প্রকাশের অভিযোগ তুলে চক্রান্তের মাধ্যমে পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়েছে।

১৮ মার্চ ২০২৫

এই অভিযোগের মধ্য দিয়ে ১৮ বছর পর দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার ডিক্লারেশন ফিরে পান শফিক রেহমান। এরপর থেকে "*যায়যায়দিন প্রতিদিন*" নামে নতুন প্রকাশনাটি আর বের করা হয়নি। এই কার্যক্রম ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫ এর ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ষড়যন্ত্র করে দখলের অভিযোগের বিষয়ে শফিক রেহমান গণমাধ্যমে বলেছেন, "১/১১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পত্রিকাটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল"। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে সেই একই জোরপূর্বক প্রক্রিয়ার মালিকানা ফেরত কিংবা বদলের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার: সংবাদমাধ্যমে অব্যাহত দখল ও ছাঁটাই সংস্কৃতি

৪-এর পৃষ্ঠার পর মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলেও রাতারাতি এখানকার নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদকর্মীদের বেতন আটকে যায়।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জনকণ্ঠে নিয়োগ প্রক্রিয়া

আওয়ামীপন্থী নির্বাহী সম্পাদক ওবায়দুল কবীর ও উপদেষ্টা সম্পাদক কামরুল ইসলাম খানকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়। কয়েক মাস ধরে সংবাদকর্মীদের বেতন বকেয়া থাকার মাঝেই হুট করে সিওও জনাব আফিজ নতুন কর্মী নিয়োগ দিতে থাকায় অসন্তোষ বেড়ে যায়। এই পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের তথ্যমতে, নতুন কর্মীদের সংবাদমাধ্যমে পূর্বে তেমন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বড় বড় পদে নিয়োগ পান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন শিশির, যিনি পরিকল্পনা সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পান। জামায়াতে ইসলামী ঘনিষ্ঠ মনির আহমাদ জারিফ জয়েন্ট নিউজ এডিটর হিসেবে নিয়োগ পান, যিনি সাবেক কর্মস্থল মানবকণ্ঠতে সিনিয়র সাব এডিটর ছিলেন। শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক থেকে সরাসরি ডেপুটি চিফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ইসরাফিল ফরায়েজী। ডিজিটাল টিমের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান সাবরিনা বিনতে আহমদ, যিনি বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিমের স্ত্রী। এ ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন মীর জসিম নামে একজন এবং প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের একজন ভুক্তভোগী সাংবাদিক বলেন, 'পুরাতনদের বেতন বকেয়া রেখে মেজর আফিজ এনসিপি, জামায়াত, বিএনপি-সংশ্লিষ্ট ও দলীয় পদধারীদের নিয়োগ দিতে থাকেন। এই সংখ্যা ২০-এর অধিক, যাদের বেশির ভাগই জামায়াতে ইসলামী-সংশ্লিষ্ট।'

বার্তাকক্ষের উচ্চপদস্থদের সাথে পরামর্শ না করে বার্তাকক্ষে নতুন নিয়োগে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মাঝেও অসন্তোষ তৈরি হয়। এর মাঝে 'ফ্যাসিবাদের দোসর' আখ্যা দিয়ে পাঁচজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে দীর্ঘ বছরের পুরোনো সংবাদকর্মীরা ২২ সদস্যবিশিষ্ট 'সাংবাদিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করেন।

২০২৫ সালের ৪ মে, জনকণ্ঠে আন্দোলনরত সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় ছাঁটাইয়ের দাবিতে সেদিন বিকেল চারটা থেকে কর্মবিরতি পালন করে সাংবাদিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। ৪ঠা মে সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে তাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। শুরুতে গেটের বাইরে অবস্থান নেন হামলাকারীরা। বহিরাগত এই অংশটির বক্তব্য, তাদের নেতা জয়নাল আবেদীন শিশিরকে জনকণ্ঠ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ঘটনার একটি ভিডিওতে লক্ষ করা যায়, ভেতরে থাকা কর্মীরা বাইরের উত্তেজিত দলটিকে আশ্বস্ত করে বলছেন, 'কাউকে আটকে রাখা হয় নাই, উনি চাইলেই নিচে আসতে পারেন।'

তবে এই কথায় কর্ণপাত না করে কিছু সময়ের মধ্যেই গেট ভেঙে প্রায় ৫০-৬০ জনের দলটি ভেতরে প্রবেশ করে, কর্মবিরতি পালনকারী সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় আক্রান্ত সংবাদকর্মীরা থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ কোনো সাড়া দেয়নি।

জনকণ্ঠ পত্রিকার সাংবাদিকরা জানান, অফিসের সামনে শিশিরকে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে দাবি করে বিক্ষোভ হচ্ছে জানার পর তাকে বারবার নিচে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি যাননি। উনি বলেছেন, 'আমি এখানে চাকরি করছি, আমি কেন নিচে যাব?' অথচ হামলাকারীরা বলছেন, 'তাদের নেতা শিশিরকে আটকে রাখা হয়েছে'।

ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা জানান, বকেয়া বেতনের দাবিতে ও নির্বিচারে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে সিঁড়িতে বসে কর্মবিরতি পালন করছি। রাত আটটা নাগাদ এনসিপি ও জামায়াত-সমর্থকদের একটি দল গেট ভেঙে ভেতরে এসে আমাদের ওপর হামলা চালায়। বকেয়া বেতন ছাড়া তো আর কোনো দাবি ছিল না।

এই হামলার ঘটনায় একজন ভুক্তভোগী বলেন, 'জনকণ্ঠ ভবনের রিসেপশনে সাংবাদিক কর্মচারীদের নেতা জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী মো. আফজাল হোসেনকে প্রায় ২০ জন মিলে মারধর করেন। আফজালের শরীরে রক্তের দাগ দেখা যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অনেকে আহত হয়েছেন। তিনি কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিউজরুমে চলে যান। এরপর আবারও তাকে পেটাতে পেটাতে সাবরিনা ও শিশিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। শিশির ও সাবরিনা তাকে টার্মিনেশন লেটার দিয়ে দেন।'

তার পরের দিন যারা হামলার শিকার হন ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের কর্মস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আবার সবাইকে চাকরিচ্যুতও করা হয়নি। ওই দিনের ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। এই ট্রমা থেকে বের হতে ২০২৫ এর জুন মাসে আরও দুইজন পদত্যাগ করেন।

চাকরিচ্যুত সাংবাদিকেরা বলেন, যদি প্রতিষ্ঠান মনে করে তাদেরকে প্রয়োজন নাই, মালিকের ছাঁটাইয়ের অধিকার আছে। কিন্তু শ্রম আইন মোতাবেক হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে। ভুক্তভোগীরা জানান, ৩২ বছর ধরে কাজ করা ব্যক্তিও বিনা নোটিশে চাকরি হারিয়েছেন।

২০২৫ সালের আগস্টে, জনকণ্ঠে পরিকল্পিত হামলা

সংবাদকর্মীদের ওপর এই হামলার ঘটনার পর ২০২৫-এর আগস্টে *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় দ্বিতীয় দফায় আরেকটি সন্দেহজনক ঘটনা ঘটে। ২ আগস্ট ২০২৫, প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে আবারও হামলার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের আমলে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যে শোকের মাস পালন করা হতো, তা সামনে রেখেই এই ঘটনা ঘটানো হয়। সেদিন পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে পত্রিকাটির মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে দুটি আশ্চর্যজনক খবর প্রকাশ করা হয়। *'মালিকের হাত ধরে জনকণ্ঠে আবারও সক্রিয় হয়েছে 'র'* এবং *'জনকণ্ঠের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে জনকণ্ঠে কর্মরত সাংবাদিকেরা'* শিরোনামে দুটি খবর প্রকাশ করা হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৪ আগস্ট ২০২৫, একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দৈনিক *জনকণ্ঠ*-এর সম্পাদক ও প্রকাশক শামীমা এ খান জানান, পেশিশক্তি ও মবোক্রেসির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বের করে দিয়ে তার কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি বিবৃতিতে বলেন, 'গত ১ আগস্ট রাতে আফিজুর রহমানের পরামর্শে ও তার সহযোগীরা দৈনিক জনকণ্ঠের অনলাইনে পরিকল্পিতভাবে টেমপ্লেট লাল থেকে কালো রঙের করে। এর আগে গত জুনে প্ল্যানিং এডিটর জয়নাল আবেদীন শিশিরের মাধ্যমে সম্পাদকের কাছে ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। দফায় দফায় চেষ্টা চালিয়ে তারা চাঁদা আদায় করতে না পেরে মব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছে। পরদিন ২ আগস্ট সম্পাদকের নির্দেশে জনকণ্ঠ ছাপা পত্রিকার মলাট জুলাই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে লাল রঙে প্রকাশ করা হয়।'

'দেশের সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে এটি অন্যায় অপকর্ম এবং দেশের প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে একটি বিরল ঘটনা' বলেও মন্তব্য করেন শামীমা এ খান। এ সময় পরিকল্পিতভাবে দখলের উদ্দেশ্যে বিগত সরকার ও শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শোকের মাসে সংহতি জানিয়ে টেমপ্লেট কালো রঙ করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করেছেন জানিয়ে প্রায় ২০ জনকে চাকরিচ্যুত করেন গ্লোব-জনকণ্ঠ শিল্প কর্তৃপক্ষ।

এদিকে এনসিপি নেতা জয়নাল আবেদীন শিশিরসহ যাদের বিরুদ্ধে এই অসৎ পরিকল্পনার অভিযোগ আসে, তাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা জানান, গ্লোব-জনকণ্ঠ শিল্প গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জিশাল এ খান আগস্ট মাস কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে অনুসরণ করে ফেসবুকে নিউজ আপলোডের টেমপ্লেট কালো রঙ করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ টেমপ্লেট লাল থেকে কালো করার বিষয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠে আসে।

এর ধারাবাহিকতায় ৬ আগস্ট ২০২৫, মালিক-সম্পাদক-প্রকাশক শামীমা এ খান ও গ্লোব-জনকণ্ঠ শিল্প নেতৃত্বকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এনসিপি নেতা শিশিরের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। *জনকণ্ঠ*-এর সাংবাদিকরা জানান, এক্ষেত্রে মেজর (অব.) আফিজুর রহমানের স্পষ্ট ইন্ধন রয়েছে। উল্লেখ্য, এই বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এই সাবেক সেনা কর্মকর্তার মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন। এই গ্রুপটি শামীমা এ খানসহ গ্লোব-জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় মামলাও দায়ের করেন। এরপর পাল্টা আইনের আশ্রয় নেয় মালিকপক্ষ। একপর্যায়ে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় এই সংকট মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জনকণ্ঠ-এর ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা বলেন, 'মেজর আফিজ ও শিশিরের নেতৃত্বে এই বিভিন্ন দলের অসাধু নেতারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য, অবৈধ আয়ের উৎস তৈরি করার লক্ষ্যেই দফায় দফায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছেন। এই পত্রিকা দখল করাই ছিল এই গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য।'

জানা যায়, মেজর (অব.) আফিজুর রহমান সবশেষ ঘটনার পর আর কর্মস্থলে ফেরেননি। তবে আওয়ামী লীগের পতনের পর তার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত ও পরবর্তী সময়ে মালিক-সম্পাদক-প্রকাশককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা এনসিপির জয়নাল আবেদীন শিশিরসহ জামায়াত ও বিএনপির দলীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এখনো এই কর্মস্থলে নিযুক্ত আছেন। মেজর (অব.) আফিজুর রহমান ও জয়নাল আবেদীন শিশির উভয়েই জনকণ্ঠ দখলের পাঁয়তারা, হামলার মদদদাতা হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বছর গড়ালেও চাকরিচ্যুতদের পাওনা পরিশোধ করেনি দৈনিক জনকণ্ঠ।

মালিক গোষ্ঠীর দায়মুক্তি ও অন্তর্বর্তী সরকারের নিষ্ক্রিয়তা

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার নির্বিচারে গণমাধ্যম দখল, ছাঁটাই ও নৈরাজ্য ঠেকাতে আদৌ কোনো চেষ্টা করেছে কি না, প্রশ্নের জবাবে সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, 'সংবাদমাধ্যম দখলের বিষয়টা রাজনৈতিক দলের। রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো পলিসি সরকারের ছিল না।'

অতীতে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হলে পর্যায়ক্রমে এই দলের সমর্থক সাংবাদিকেরা একইভাবে নেতৃত্ব দখলে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর সংবাদমাধ্যমগুলোতে ক্ষমতামুখী তোষণ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর শেখ হাসিনার সরকার ঢাকাসহ সারা দেশের সংবাদমাধ্যমে একক আধিপত্য চালায়। ফলে নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হন বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের অনুগত সাংবাদিকেরা। বিগত আমলে প্রায় সকল সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষের শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানে ছিল। তবে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলে রাতারাতি মালিকগোষ্ঠী রাজনৈতিক আনুগত্য বদলে ফেলে। মালিকপক্ষের হয়ে আওয়ামী ক্ষমতার বলয়ে সাংবাদিকতা করে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে অনেকেই চাকরিচ্যুত হয়েছেন, মামলার শিকার হয়েছেন, কারাভোগ করছেন, পলাতকও রয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিপর্যায়ে যে পরিমাণে সংবাদকর্মী চাকরি হারিয়েছেন, হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, সংবাদমাধ্যমগুলোর মালিকানায় সে পরিবর্তন আসেনি। বার্তাকক্ষের নতুন নেতৃত্ব ও কর্মী পর্যায়ে যে সকল রদবদল ঘটেছে, তা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়নি। পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা কিংবা জোরপূর্বক পরিবর্তনের ফলে মালিকপক্ষ ও নতুন কর্তৃপক্ষ পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় সংবাদকর্মী ও সংবাদপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রেখেছে।

সংবাদমাধ্যমের মালিকদের একপ্রকার দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন, 'বিচার হলে সংবাদমাধ্যমের মালিকদের বিচার হওয়া দরকার। মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে নিজের স্বার্থে ক্ষমতার সান্নিধ্যে থেকেছে। কর্মীদের ব্যবহার করে ফায়দা লুটেছে। আবার একই মালিক ৫ আগস্টের পর তার কর্মীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। অন্যায় সব তারা করবে আর সাংবাদিকদের ওপর সেই দায় চাপিয়ে দেবে, এটা তো হতে পারে না। তাই মালিকদের জবাবদিহিতে আনা জরুরি ছিল।'

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ বলেন, 'এসব ছাঁটাই রাজনৈতিক কারণে কিছুটা হয়েছে, সেটা পটপরিবর্তনের কারণে হয়েছে, যা মালিকেরা করেছেন মালিকদের স্বার্থে, আবার যারা বিগত শাসনামলে বঞ্চিত হয়েছেন, তারা করেছেন সুযোগ নেওয়ার জন্য বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। এই জন্যই আমরা সুপারিশে (গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন) বলেছি যে এখানে (সংবাদমাধ্যম শিল্প) আগে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, সংস্কার করা প্রয়োজন, তবেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে।'

এই প্রতিবেদনটি দৃকনিউজে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ প্রকাশিত হয়।

‘ক্ষতিকর সাংবাদিকতার ভিকটিমদের সুরক্ষায় কঠোর আইনি বিধান থাকতে হবে’

১১-এর পৃষ্ঠার পর

আনা যায়?

শেখ হাসিনার আমলে এটা ভয়াবহ ছিল। তারা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে ভয়ানকভাবে ওয়েপনাইজ করেছে। মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করেছে। কারণ এখন সব কণ্ঠই অনলাইনে। সত্যিকার অর্থে এখন জেনারেল মিডিয়া বলে কিছু নাই। মিডিয়া মানেই সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াকে কণ্ঠরোধ করার জন্য তারা ব্রুটালি ক্র্যাকডাউন করেছে। সাত-আট হাজার কেস হয়েছে। প্রচুর লোক জেল খেটেছে। শুধু রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট হার্ট করার জন্য, আওয়ামী লীগের কোনও লিডারের বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য, শেখ মুজিবের নামে কটূক্তি করার জন্য, হাসিনার বিরুদ্ধে বলার জন্য, এমনকি আওয়ামী লীগের লোকাল লেভেলের এমপি নিয়ে কটূক্তি করলেও জেল হয়েছে। এখন আমরা [অন্তর্বর্তীকালীন সরকার] কী করছি? আমরা স্পিচ রিলেটেড কেসগুলো উইথড্র করছি। স্পিচ রিলেটেড কোনও অফেন্স এই নতুন সময়ে রাখা হয়নি। ফলে যেটা হয়েছে, সাংবাদিকদের এক ধরনের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে, আপনি অনলাইন দেখলে দেখবেন যা-তা বলা হচ্ছে। মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে, আউটরাইট মিথ্যা কথা বলছে। প্রতিদিন আর্মিকে ইনস্টিগেট করছে যে আর্মিতে ক্যু হচ্ছে। কোন সভ্য সমাজ এই ধরনের জার্নালিজম অ্যালাও করে? বাংলাদেশে আমি দেখছি সাংবাদিকের মহাসুরক্ষা আছে। আপনি যদি জেনুইন জার্নালিজম করেন, গত ১৭-১৮ মাসে জেনুইন জার্নালিজমের কারণে কাকে হেনস্তা করা হয়েছে?

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: এই অপসাংবাদিকতা বা আপনি যা ব্যাড জার্নালিজম বলছেন তার থেকে প্রতিকারের বা এই ধরনের অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রেস কাউন্সিল কী জরুরি? প্রেস কাউন্সিলের সংস্কার প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী?

শফিকুল আলম: আমি মনে করি না, প্রেস কাউন্সিল থাকার দরকার আছে। আমার মতে, আমাদের যুক্তরাজ্যের মডেল অনুসরণ করা উচিত। সাংবাদিকতায় ভুল করলে সিভিল ল থাকতে হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। যার যতটুকু প্রাপ্য, সেই অনুযায়ী শাস্তি। যে ব্যক্তি সাংবাদিকতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তিনি কখনো এত বছরে প্রেস কাউন্সিল থেকে কোনও প্রতিকার পেয়েছেন? ৫৪ বছরে এমন কোনও উদাহরণ দেখেছেন? প্রেস কাউন্সিল আসলে কিছু সম্পাদককে খুশি রাখার একটা ক্লাব। এটা দিয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় ন্যূনতম কোয়ালিটেটিভ পরিবর্তন হয়নি। এখানেও মিডিয়া রিফর্ম কমিশন ভুল করেছে। আমরা যে যুগে এসেছি, আমাদের দরকার ইউকে, ইউএসএ বা পশ্চিমা বিশ্বের মতো আইন, যেখানে ক্ষতিকর সাংবাদিকতার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়। আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ডিফেমেটরি (মানহানিকর) কিছু লেখেন, তাহলে আপনাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। ধরুন, একটি বড় কোম্পানি কোনও ভালো মানুষের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখছে। ২০টি নিউজ করেছে, কারণ ওই ব্যক্তি তাদের স্বার্থ রক্ষা করেননি। এতে তো তাকে সিংহের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তাকে কে প্রোটেকশন দেবে? প্রেস কাউন্সিল কি তাকে প্রোটেকশন দিতে পারবে? এ পর্যন্ত এমন কোনও উদাহরণ আছে?

আইডিয়ালিস্টিক কথা শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু আমাদের ‘টাফ ল’ দরকার। ভুল নিউজ হতেই পারে, সাংবাদিকতায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমি ভুল করেছি, আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু আমরা ভুল থেকে শিখি এবং সংশোধন করি।

কিন্তু কেউ যদি টার্গেটেডভাবে কারও বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করে, কোনও মাইনোরিটির বিরুদ্ধে সিস্টেমেটিকভাবে ঘৃণা উৎপাদন করে, তাহলে শাস্তি থাকতে হবে। এবং সেই শাস্তি কঠোর হতে হবে। যদি প্রমাণ হয়, আপনি ২০টি রিপোর্ট করে একটি মাইনোরিটি গ্রুপের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ঘৃণা ছড়িয়েছেন, তাহলে ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা হওয়া উচিত। সেই জরিমানা আদায় করতে হবে। শুধু মামলা হলো, তারপর শেষ – এটা না। জরিমানা আদায় করতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া করে দিতে হবে। বিদেশে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। আমাদেরও দরকার। আপনি ভুল নিউজ করবেন, আমি আপনাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলব, তাতে তো আপনি রিওয়ার্ডেড হচ্ছেন। পরের বার আবার ভুল করবেন। আজ একটি গ্রুপ কারও বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে লাভ পেল, অন্য গ্রুপ ভাববে, আমিও একই কাজ করি।

সরকারি কর্মচারীরা খুব কম বেতন পান। তাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো রিপোর্ট করা হয়। একজন জনপ্রশাসন সচিবের বিরুদ্ধে একটি পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা নিউজ করেছে। আমরা থার্ড পার্টি দিয়ে যাচাই করিয়ে দেখেছি, এগুলো এআই দিয়ে বানানো ফেইক ম্যাটেরিয়াল। কিন্তু পত্রিকাটি ক্ষমা চায়নি, বরং আরও বড় বড় কথা বলেছে। বিষয়টি থেকে গেছে। যার বিরুদ্ধে নিউজ করা হয়েছে, তিনি আমাকে বলেছেন, তার সন্তানরা বিদেশে থাকে। সারাদিন তারা জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি কী করেছ? সবাই আমাদের চোরের ছেলে বলে। আগে যদি একটি নিউজপেপারে ছাপা হতো, একদিন পড়ে শেষ হয়ে যেত। এখন একটি মিথ্যা নিউজ অনলাইনে গেলে তার সেলফ লাইফ প্রায় চিরস্থায়ী। তাকে আপনি কোনও প্রোটেকশন দেবেন না? অনেক বড় বড় আইডিয়ালিস্টিক কথা বলা যায়। কিন্তু আমাদের সমাজে একটা ব্যালেন্স আনা দরকার।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: নির্বাচিত সরকারের কাছে আপনার কোনও প্রস্তাবনা আছে? তারা কীভাবে মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন মোকাবিলা করতে পারে, এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

শফিকুল আলম: আমার মনে হয়, কপিরাইটের ক্ষেত্রে ভয়াবহ রকমের ক্র্যাকডাউন দরকার। কেউ এক মাস কষ্ট করে একটি রিপোর্ট করল, কেউ ১০ মাস অপেক্ষা করে একটি ভালো ছবি তুলল, তার কাজকে সুরক্ষা দিতে হবে। এটা নিশ্চিত করা গেলে অনেক আলতু-ফালতু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। আরেকটি বিষয় হলো অনলাইন হেট স্পিচ (বিদ্বেষমূলক বক্তব্য) নিয়ন্ত্রণ করা। পশ্চিমা মানবাধিকারের সঙ্গে যদি কিছু ক্ষেত্রে সংঘাতও হয়, আমাদের আর্থসামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ এর ফল ভোগ করে আমাদের মাইনোরিটিগুলো। আমাদের হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, লৈঙ্গিক সংখ্যালঘু, তাদের সুরক্ষা দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের দায়িত্ব। এই জায়গায় পশ্চিমা বিশ্ব কী বলল, সেটা দেখার আগে আমাদের নিজেদের বাস্তবতা দেখতে হবে। প্রয়োজনে ১০, ৫০ বা ১০০টি ওয়েবসাইট বন্ধ করতে হলেও করতে হবে। প্রয়োজনে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্সের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ করতে হবে। তাদের বলতে হবে, তোমরা যাদের প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছ, তার দায়ও তোমাদের নিতে হবে। এতে অবশ্য সংঘাত তৈরি হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে অনেকেই প্রশ্ন তুলবে, কেন ওয়েবসাইট বন্ধ করা হচ্ছে? কিন্তু সরকারের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়া।

আমরা বারবার ফেল করছি কারণ প্ল্যাটফর্ম রেগুলেট করতে পারিনি, হেট স্পিচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। এমনকি প্রথম আলো বা ডেইলি স্টারের ক্ষেত্রেও হেট স্পিচ হয়েছে। এসব বিষয়ে সমাজে একটি কনসেনসাস দরকার। আপনি যদি আইন করেন আর পুরো সিভিল সোসাইটি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে সেটা কার্যকর করা কঠিন। তাই সবার সঙ্গে বসে, প্রয়োজনে লেজিসলেশন ছাড়াও এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন একটি দেশের সার্বভৌমত্বকেও চ্যালেঞ্জ করে। শত্রুভাবাপন্ন পক্ষ আপনার নামে, আপনার সামরিক বাহিনীর নামে, আপনার সরকারের নামে ওয়েবসাইট খুলে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে। এবং একসময় মানুষ তা বিশ্বাস করতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা লাগবে। ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য এটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি সিভিল সোসাইটির ভাই-বোনদের বলব, আপনারা বিষয়গুলোকে শুধু একাডেমিক ডিসকোর্স থেকে বিচার করবেন না। পশ্চিমা মানবাধিকার, সিডও, সাংবাদিকতার নীতিমালা, ফ্রিডম অফ প্রেস, এসব সম্পর্কে আপনারা অবগত। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। পশ্চিমা মডেল কপি করে যে ধরনের সমালোচনা করা হচ্ছে, তা বাংলাদেশের বাস্তবতায় সবার জন্য সহায়ক হচ্ছে না।

শফিকুল আলম জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় এএফপির ঢাকা ব্যুরো প্রধান ছিলেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে দৈনিক পত্রিকা ওয়াদার সম্পাদক। মীর হুযাইফা আল-মামদূহ, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আগে ৩ জানুয়ারি ২০২৬, সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন।

যমুনা টিভির প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন

২৬-এর পৃষ্ঠার পর

১১টার পর অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কেউ কোনো ধরনের শব্দ পেয়েছেন কি না, ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদকের এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচারিত প্রতিবেদনে যখন আপত্তিজনক সুরে এই প্রশ্ন করা হয় এবং এর কোনো উত্তর প্রতিবেদনে পাওয়া যায় না – তখন এই প্রশ্ন থেকে প্রতিবেদকের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে তিনি ধর্ষণের অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণের লক্ষ্যেই হয়তো কাজ করছেন।

অসঙ্গতি ৪) ভিকটিমের বাবা ও মামলার বাদীকে *যমুনাটিভি*-র এই প্রতিবেদক জানান, মেডিক্যাল রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এরপর ভিকটিমের বাবা জানালেন ‘আমরা রিপোর্ট খুঁজলাম, আমাদের কে তো দেয় নাই।’ উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ষণের ঘটনায় মেডিক্যাল রিপোর্ট নেগেটিভ দেয়ার অলিখিত বিধান নিয়ে অনেক অধিকারকর্মী অতীতে বহুবার প্রশ্ন তুলেছেন। ২০১৮ সালে দুইজন সামরিক সদস্য কর্তৃক মারমা নারী ধর্ষণের ঘটনায় ভিকটিমদের এক প্রকার নজরবন্দী রাখা হয়েছিল রাঙামাটি সদর হাসপাতালে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন ‘মেডিক্যাল রিপোর্ট নেগেটিভ’ তা অতীতে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হিসেবেও অনুসন্ধান করার সুযোগ প্রতিবেদকের ছিল।

ভিকটিম পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার আগে তাদের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন ও ছাড়পত্রের কাগজ কেড়ে নিয়েছে পুলিশ। *যমুনাটিভি*-তে সংবাদ প্রচারের পরেরদিন পুলিশ বাড়ি এসে মেডিক্যাল রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে জানালেও তাদেরকে কোনো রিপোর্ট দেওয়া হয়নি।

পরিবারটি আরও জানিয়েছে, যমুনা টিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশনে এই খবর প্রচার হলে খাগড়াছড়ির অনেক মিডিয়া থেকেই পরিবারটিকে বিরক্ত করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক তাদের বাড়ি গিয়ে অনুমতি ছাড়া তাদের ভিডিও ধারণ ও জোরপূর্বক কথা বলানোর চেষ্টা করেছে। ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা চালিয়েছে। ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন ভিকটিম কিশোরী ও তার পরিবার। সব মিলিয়ে ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা তাদের।

বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই শুধুমাত্র একটি মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে ‘ধর্ষণের আলামত মেলেনি’ এই শিরোনামে খবর প্রচার করা – সাংবাদিক হিসেবে কাজটি সঠিক হয়েছে কি না জানতে চাইলে *যমুনাটিভি*-র সিনিয়র রিপোর্টার রিয়াজ রায়হান জানান, মেডিক্যাল রিপোর্ট হাতে এসেছে এই বিষয়ে বার্তাকক্ষের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এডিটরিয়াল পলিসি অনুযায়ী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রচার করবে, তখনই প্রচার হয়েছে।

এই বিষয়ে *যমুনাটিভি*-র প্রধান নির্বাহী ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্য ফাহিম আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জানান, রিপোর্ট দুটি পুনরায় দেখে মন্তব্য জানাবেন। পরবর্তীতে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া মেলেনি।

এই প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আদিবাসী ও নারী অধিকারকর্মীরা উত্থাপন করেছেন, যেমন: এই আইনি নথি যা আদালতে যাওয়ার কথা, তা কার ইশারায় একজন সাংবাদিকের কাছে পৌঁছালো? সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন কী এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে? সাংবাদিকের ‘বাঙালি মুসলমান পরিচয়’ সাংবাদিক হিসেবে তার নৈতিকতাকে প্রভাবিত করেছে? প্রতিবেদক কী পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘বাঙালি সেটেলার স্বার্থ রক্ষা’র উদ্দেশ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে ধর্ষণের অভিযোগকারী কিশোরী ও তার পরিবারের প্রতি এমন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন? প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়। ●

কর্তৃত্ববাদ থেকে ডিজিটাল হুমকি ও হয়রানি: দেশে সাংবাদিকতার নতুন সংগ্রাম

৭-এর পৃষ্ঠার পর

লাইব্রেরির একজন কর্মীর দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হন। এ ঘটনায় একটি রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা হস্তক্ষেপ করে। তখন আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম – এই ধরনের ঘটনায় কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের হস্তক্ষেপ কি গ্রহণযোগ্য, এবং এর অর্থ কী দাঁড়ায়? এই সাধারণ প্রশ্ন তোলার কারণেই আমাকে ‘ইসলামবিরোধী’ বলে চিহ্নিত করা হয়।

৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে এক ধরনের উদ্বেগজনক সামাজিক বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। উপরোক্ত ঘটনার অভিযুক্ত নিপীড়ককে আদালতে ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল – যা দেখায়, কীভাবে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়াটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, আর নারীর অধিকারের প্রতি সম্মান কীভাবে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

নারী সাংবাদিকরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন – কারণ তারা একসঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক চাপ, রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভয়ভীতি ও হয়রানির মুখে পড়ছেন। যেসকল সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিছু ডানপন্থী সংগঠনকে কঠিন প্রশ্ন করে থাকেন, তারা অনলাইনে দলবদ্ধ হয়রানি ও আক্রমণের শিকার হন। আমাকে অনলাইনে সরাসরি গণধর্ষণের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আক্রমণগুলো যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তুলে ধরে, তা মোকাবিলায় রাষ্ট্র এখনও ব্যর্থ। অনলাইন মব সীমানা ছাড়া, নাম-পরিচয় ছাড়া কাজ করে, এবং খুব সহজেই সাংবাদিকদের বাস্তব জীবনে সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে।

বৈশ্বিক পরিসরেও এই ঝুঁকি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মাল্টার অনুসন্ধানী সাংবাদিক ড্যাফনি কারুয়ানাহ গ্যালিৎজিয়া ২০১৭ সালে গাড়িবোমা হামলায় নিহত হওয়ার আগে বছরের পর বছর ধরে অনলাইন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। ভারতীয় সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট গৌরী লাঙ্কেশ, যিনি হিন্দু ডানপন্থী রাজনীতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের একজন সোচ্চার সমালোচক ছিলেন, একসময় তার সহকর্মীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তোমরা বড়রা যদি আরও জোরালো অবস্থান নিতে না পারো, তাহলে আমরা কীভাবে তা করব?’ তিনি উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে ক্রমাগত হুমকি ও অনলাইন আক্রমণের শিকার হন, তাকে ‘দেশদ্রোহী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ২০১৭ সালে তার বাড়ির সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসা দীর্ঘদিন ধরে আইনি নিপীড়নের পাশাপাশি সমন্বিত অনলাইন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন; তার কাজকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং তার সাংবাদিকতায় বাধা সৃষ্টি করতে পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল আক্রমণ চালানো হতো।

এই ঘটনাগুলো দেখায়, অনলাইন হুমকি শুধু কথার কথা নয়; এগুলো অনেক সময় বাস্তব জীবনে ক্ষতি, এমনকি হত্যার পূর্বাভাস দেয়। একই সঙ্গে এগুলো নিপীড়নকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তোলে, মানুষের সহানুভূতি কমিয়ে দেয় এবং সমাজ কী পর্যন্ত সহ্য করবে – সেই সীমাও বাড়িয়ে দেয়। এর ধরনটি স্পষ্ট: সাংবাদিককে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তারপর যা অকল্পনীয়, তাকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করা।

এই হুমকির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হলো এর অদৃশ্যতা। এটি অবিরাম চলতে থাকে, খুব কমই নথিভুক্ত হয় এবং প্রায়শই জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। বেশিরভাগ হুমকিই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে আসে, যার কারণে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এর প্রভাব যেকোনও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সমতুল্য। এটি এমন একটি অপরাধ যা প্রায়শই অপ্রকাশিত থেকে যায় ও ভুক্তভোগীদের নীরব থাকতে বাধ্য করে, যে নীরবতা বিপজ্জনক।

এই অপরাধ মোকাবিলায় সরকারকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। অনলাইন ও অফলাইন হুমকির জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের শনাক্ত ও শাস্তি দেওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে সহযোগিতামূলক যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সাংবাদিকদের, বিশেষ করে নারী সাংবাদিকদের, সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের জবাবদিহিতার চর্চা চালু করতে হবে, যাতে একটি সত্যিকারের স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্ত সাংবাদিকতা টিকে থাকতে পারে, বিকশিত হতে পারে।

হান্না আরেন্ট আমাদের সতর্ক করেছিলেন, ‘মানবিক সহানুভূতির মৃত্যু হলো নৃশংসতার দিকে ধাবমান একটি সংস্কৃতির অন্যতম প্রাথমিক ও সুস্পষ্ট লক্ষণ।’ আজকের বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি এবং অনলাইন আক্রমণের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা সেই সহানুভূতি থেকে এক বিপজ্জনক বিচ্যুতির ইঙ্গিত দেয়। যদি কোনও সমাজ সত্যবাদীদের কণ্ঠরোধ করাকে সহ্য করতে শুরু করে, তবে তা কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেই সংকুচিত করে না, বরং একটি দেশের নৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিকেও ক্ষয় করা শুরু করে। ●

কাজী জেসিন একজন গণমাধ্যমকর্মী ও বিশ্লেষক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক।

নারী সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে বাধা

‘আমরা সাংবাদিক, কারও মা-বোন না’

নিজস্ব প্রতিবেদক

‘আমার পা নড়ে না। আমার শিরদাঁড়া ঠান্ডা হয়ে যায়। আমার শুধু মনে হয়, কেউ খারাপ ব্যবহার করবে বা খারাপ কিছু হবে। একজন সাংবাদিক পরিচয়ে যখন পেশাগত জায়গায় কোনো সম্মান থাকে না, আমার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে।’-এই কথাগুলো বলছিলেন বরিশালে দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক মনিকা চৌধুরী।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাংবাদিক হিসেবে হয়রানি ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন নারী সাংবাদিকরা। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে খবর সংগ্রহে কয়েকজন নারী সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনে গেলে বাধার সম্মুখীন হন। নারী সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি সংবাদ সম্মেলন থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

সাংবাদিক মনিকা চৌধুরীর সঙ্গে ঘটনাটি ঘটে ৩ মে ২০২৫, বরিশাল প্রেসক্লাবে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির, মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীমের সংবাদ সম্মেলনে, দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক মনিকা চৌধুরীকে কর্মরত অবস্থায় আয়োজকরা এসে বের করে দেন। সাংবাদিক মনিকা চৌধুরী জানান, তিনি এই ঘটনার ট্রমা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মনিকা যখন সংবাদ সম্মেলন কক্ষে ক্যামেরায় ফুটেজ নিচ্ছিলেন কাজের মাঝেই তখন কয়েকজন এসে তাকে বলেন, ‘আপনি একজন নারী। এখানে থাকতে পারবেন না। আপা, আপনি এখান থেকে চলে যান।’ মনিকা তার পরিচয় দিলে তারা জানান, তাদের নারী সাংবাদিক প্রয়োজন নেই। এখানে আসা হুজুরদের এতে অসুবিধা হবে। বেরিয়ে যেতে হবে। সে সময় উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রতিবাদ জানালে আবারও আয়োজকরা স্পষ্ট করে জানান, ‘নারী সাংবাদিক এখানে কিছুতেই থাকতে পারবেন না।’

ঘটনার দিন মনিকা চৌধুরী বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে কান্নারত অবস্থায় বক্তব্য দিয়ে জানান তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি নারী হই, পুরুষ হই, ট্রান্সজেন্ডার হই; আমি তো সেখানে একজন সংবাদকর্মীর পরিচয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলাম।’ আরও বলেন, ‘আমার সাংবাদিকতার আঁতুড়ঘর আমাদের প্রেস ক্লাব। সেখান থেকে, মানে আমার বাসা থেকে, আমাকে বের করে দিল?’

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মেয়র পদ শূন্য হলে বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দলের নায়েবে আমিরকে বিজয়ী ঘোষণার দাবিতে এই সংবাদ সম্মেলন করে দলটি। সংবাদ সম্মেলন থেকে নারী সাংবাদিককে বের করে দেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দলটির নায়েবে আমির, ‘আমি আমার ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করি’ উল্লেখ করে বলেন, ‘এ দেশে সবকিছু চলবে দেশের আইন অনুযায়ী। আর আমি চলব, যেহেতু সবার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে, সংবিধান এই স্বাধীনতা দিয়েছে আমার ধর্ম পালন করার জন্য। যেখানে আমি পর্দা করতে পারি, এটা আমার এখতিয়ার।’ অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার করে জানান, ইসলামভিত্তিক এই রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে কোনো নারী থাকতে পারবেন না।

> *...নারী সাংবাদিক এখানে কিছুতেই থাকতে পারবেন না।*
>
> **—ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**
>
> *...আমার সাংবাদিকতার আঁতুড়ঘর, আমাদের প্রেস ক্লাব। সেখান থেকে, মানে আমার বাসা থেকে, আমাকে বের করে দিল?*
>
> **—সাংবাদিক মনিকা চৌধুরী**

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘কওমি উদ্যোক্তা’ আয়োজিত ‘কওমি উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০২৫’ নামে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এই অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহের আমন্ত্রণ পেলে প্রায় সব সংবাদমাধ্যম থেকেই প্রতিবেদক পাঠানো হয়। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে আয়োজকরা নারী সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে বাধা দেন। ফলে ফিরে যান নারী সাংবাদিকরা। শুধুমাত্র পুরুষ সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় বেসরকারি সংবাদ সংস্থা ইউএনবিতে কর্মরত সাংবাদিক এমি জান্নাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে ঘটনার বিস্তারিত জানান। এমি জান্নাত তার পোস্টে লেখেন, ‘একজন নারী সাংবাদিক বলে নিউজ কাভার করতে পারবেন না, এটা কতটা দুঃখজনক ও অবমাননাকর, বলতে পারেন?’

এরপর ফেসবুকে এ নিয়ে আলাপ উঠলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে একটি লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কওমি উদ্যোক্তা সম্মেলনে এরূপ কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে সেটি অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে এরূপ ঘটনার জন্য অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিকে দায়ী করাটা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ পোস্ট নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’ মূলত এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই দায় সেরেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গত ২৪ মে ২০২৫, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে নারী সাংবাদিককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বাধা প্রদানকারীরা নারী সাংবাদিককে বলেছেন, ‘মা-বোন অ্যালাও না’। বেসরকারি টেলিভিশন *নিউজ টোয়েন্টিফোর*-এর রিপোর্টার মাসুদা লাবণী ঘটনার দিন একটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এই তথ্য জানান। ফেসবুক পোস্টের একটি অংশে তিনি লেখেন, ‘আমাকে বলা হলো মা-বোন অ্যালাও না। আমি বললাম, আমি সাংবাদিক। বললো, না, মা-বোন অ্যালাও না।’

এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমে নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়ে একটি অন্তর্নিহিত বার্তা পাঠানো হচ্ছে বলে মনে করেন গণমাধ্যমকর্মী ও বিশ্লেষক কাজী জেসিন। তিনি বলেন, ‘একটি দল ঘরে থাকার জন্য নারীদের ‘পুরস্কার’ দেওয়ার কথা বলছে এবং মহিলাদের কর্মঘণ্টা কমানোর প্রস্তাব দিচ্ছে। যখন এই বিষয়গুলো একত্রিত করা হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কেন ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সমাবেশের মঞ্চ থেকে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যদের ‘বেশ্যা’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।’

দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সহসভাপতি তাসমিমা হোসেন এসব ঘটনায় তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, ‘রাষ্ট্র ও ধর্ম এক নয়। ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে মেলানো যাবে না। আমাদের অশিক্ষিত সমাজ। যারা এসব করছে, তারা কোরআন ঠিকমতো পড়েন নাই। আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা আর সামনে অগ্রসর হতে পারছি না।’

সাংবাদিকরা জানান, দেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ও মর্যাদার অংশীদার। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে তা মেনে চলতে হবে।

উল্লিখিত এই তিনটি ঘটনায় নারী সাংবাদিকরা চুপ থাকেননি। তারা এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় ঘটনাগুলো সামনে এসেছে। এছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের নারী সংবাদকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন, এমনকি জীবননাশসহ নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন।

সাংবাদিকদের মতে, এই বাস্তবতায় সাংবাদিকদের অধিকার ও পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুবিধাবাদী, লেজুড়বৃত্তিক ও নিষ্ক্রিয় সংগঠন ভেঙে প্রকৃত সাংবাদিক সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। ●

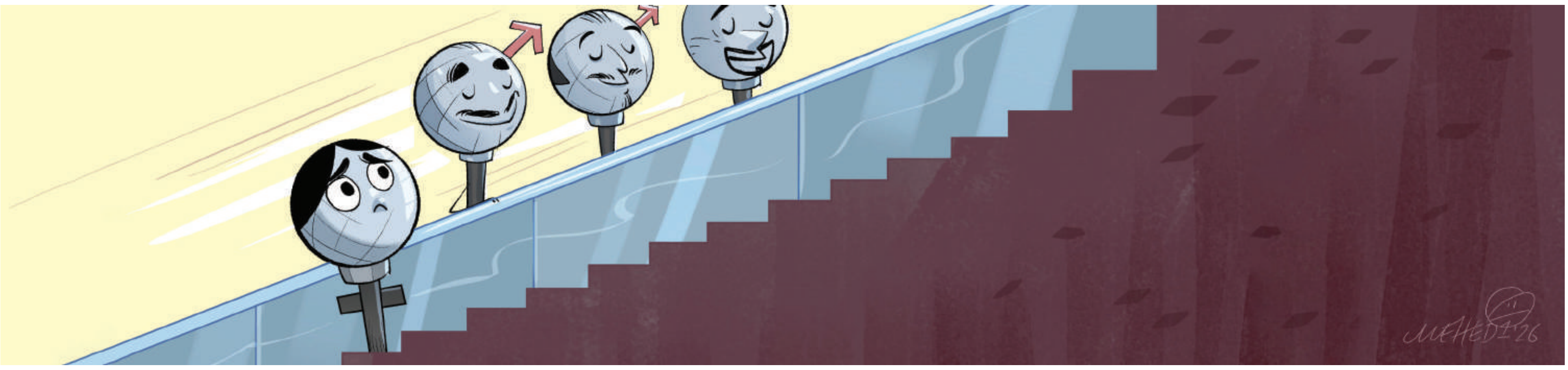

কর্তৃত্ববাদ থেকে ডিজিটাল হুমকি ও হয়রানি

দেশে সাংবাদিকতার নতুন সংগ্রাম

কাজী জেসিন

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে একটি গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশে প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায়, যার কারণে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুহূর্তের জন্য তখন আশাগুলোকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে মনে হয়েছিল – হয়তো ভয় কমে যাবে, স্বাধীনভাবে সত্য বলা যাবে এবং সাংবাদিকতায় ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না। কিন্তু পরিবর্তন তো এতো সহজ নয়, সত্য নিয়ন্ত্রণের নতুন কায়দার মুখোমুখি আজ আমরা।

২০১০ থেকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত সাংবাদিকরা হত্যা, গুম এবং গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছেন। আলোকচিত্রী ও অ্যাক্টিভিস্ট শহিদুল আলম ১০০ দিনেরও বেশি কারাভোগ করেছিলেন; গুমের পর সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল; ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কোবরাকে শুধু সত্য বলার জন্য কারাবন্দী করা হয়েছিল। নির্যাতনের শিকার হয়ে লেখক মুশতাক আহমেদ কারা হেফাজতে মারা যান; কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরও অমানবিক পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ও কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেন্সরশিপ মেনে না নেওয়ায় আমিও কালো তালিকাভুক্ত হই এবং ক্রমাগত হুমকি ও নিপীড়নের শিকার হই। আরও অনেকেই বিভিন্ন ধরনের দমনপীড়নের শিকার হয়েছেন – তাদের সবার গল্প বলতে গেলে এই লেখা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সততার মূল্য বাস্তবেই চড়া ছিল – নীরবতা, নির্বাসন এবং ক্ষতি।

৫ আগস্ট পরবর্তী সময়টা বাংলাদেশে মুক্ত সাংবাদিকতার সময় হওয়ার কথা ছিল। তা না হয়ে এই সময় অত্যন্ত দ্রুত আমাদের কণ্ঠরোধ করার এক নতুন ও অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতার আবির্ভাব ঘটে। সাংবাদিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে সাইবার বুলিয়িং, চরিত্রহনন, মিথ্যা অভিযোগ এবং অনলাইন হয়রানির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছেন – যার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো ‘ইসলাম-বিরোধী’ হিসেবে চিহ্নিত করা। আর একজন নারী হলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিকল্পিত চরিত্রহনন। এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে একজন সাংবাদিককে শুধু সেন্সরশিপের মধ্যে আটকে রাখা হচ্ছে না, তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ভঙ্গুর করে তোলা হচ্ছে। এই নতুন পদ্ধতি শুধু সাংবাদিকদের ঝুঁকিপূর্ণ করছে না – সাংবাদিকতাকেই পরিকল্পিতভাবে বিপজ্জনক করে তোলা হচ্ছে। আমি নিজেও প্রতিনিয়ত এই হয়রানির মুখোমুখি হচ্ছি।

গত বছরের একটি ঘটনা এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। প্রকাশ্যে ধূমপান করার জন্য স্থানীয়দের বাধার মুখে দুই নারীকে আটক করা হয়। যখন আমি প্রশ্ন তুলি – নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকারের আওতায় পড়া একটি কাজের জন্য কেন তাদের হয়রানি করা হচ্ছে, এবং ধূমপানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন মানদণ্ড আছে কি না – তখন আমার হাতে সিগারেট বসিয়ে আমার ছবি বিকৃত করে ফটোকার্ড বানানো হয়। একজন পুরুষ ধূমপান করলে আমি সেটি অপছন্দ করতে পারি, আবার একজন নারী ধূমপান করলেও সেটি অপছন্দ করতে পারি – কিন্তু রাষ্ট্র কি কোনো পক্ষ নিতে পারে? এই সামান্য প্রশ্ন তোলার কারণেই আমাকে ধূমপায়ী বানিয়ে মিথ্যা ট্যাগ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংগঠিত মব-প্রচার চালানো হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে এমন প্রশ্ন তোলা থেকে আমাকে বিরত রাখা।

আরেকটি ঘটনায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থী ‘ঠিকমতো ওড়না না পরার’ অভিযোগে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘মিডিয়া সেক্টরেও সত্য, কাউকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হতে দেয়া যাবে না’

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রভাব, কোনোটিই আলোচনায় আসেনি কেন?

কামাল আহমেদ: এআই এর প্রভাব খুব বেশি আসেনি, এটা সত্যি কথা। কারণ হচ্ছে যে, তখনো পর্যন্ত এআই মিডিয়াতে অতটা আত্মীভূত হয়নি। যে কারণে আমরা এআই প্রসঙ্গটা অতটা আলোচনায় আনিনি। আপনি যদি বলেন, পণ্য হিসেবে বিক্রি করা, ডিজিটাল কনটেন্ট, ভিডিও ক্লিপ, অডিও, যাই বলি না কেন, সংবাদ তো সবসময় পণ্য হিসেবে ছিল। বিনোদন তো সবসময়ই পণ্য হিসেবে ছিল, আপনি কি খবরের কাগজ বিনামূল্যে পেতেন?

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আমি বলতে চাচ্ছি, আগে একটা খবরের কাগজ পুরোটাকে একটা পণ্য হিসেবে দেখতাম, কিন্তু এখন প্রত্যেকটা নিউজ আলাদা করে পণ্য হয়ে গেছে।

কামাল আহমেদ: ফ্রাগমেন্টেশন (খণ্ডিতকরণ) হচ্ছে। ছোট ছোট কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে, সেটা বলতে পারেন। কারণ ছোট ছোট কনটেন্টেরও বাজার আছে এবং ছোট ছোট কনটেন্টে রেভিনিউ জেনারেশন হয়, রাজস্ব আয় হয়। আপনার কথার মধ্যে একটু পার্থক্য টানা দরকার, যে ডিজিটাল কনটেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া এক না। সবকিছুই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে ডিজিটাইজড হচ্ছে। সেই হিসাবে সংবাদপত্রও ডিজিটাইজড হচ্ছে। টেলিভিশনও ডিজিটাইজড আছে। যদিও সেটা ওয়েব ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে আসার কথা। রেডিও, যেটা বেতার তরঙ্গে প্রচারিত হতো সেটাও এখন ডিজিটাল মাধ্যমে আসছে। ডিজিটাল মাধ্যমের এই রূপান্তরের কথা কিন্তু আমরা বলেছি, এখন আর ওই ট্রাডিশনাল অর্থে আপনি সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন এগুলোকে আলাদা করতে পারবেন না। এগুলো সবই একটা মাল্টিমিডিয়া পোর্টাল বা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাক্টে পরিণত হয়েছে, ডিজিটাল প্রোডাক্টে পরিণত হয়েছে সে কথা আমরা বলেছি।

কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে এটা এক করা যাবে না, সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ডিফারেন্ট। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তফাৎ কিন্তু গুরুতর। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় যা যাচ্ছে, সেখানে কোনও প্রকাশক নেই। প্রকাশক হচ্ছেন যিনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন, তিনি নিজেই পাবলিশার এবং ইউজার দুটোই। তিনি নিজের যা মনে চাইছে তাই প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর ট্রাডিশনাল মিডিয়া যেটা, ডিজিটাল মাধ্যমে আসলেও তার একটা প্রকাশক আছে এবং সেই প্রকাশনার পদ্ধতি আছে, নিউজরুম আছে, সম্পাদনা হচ্ছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক আছে, এবং সেই সম্পাদকরা সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করে কোন কনটেন্ট তার ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। তফাৎটা খুব স্পষ্ট।

এখন এই প্রত্যেকটা কনটেন্ট আলাদা আলাদা করে বিপণন করার সুযোগ আছে। সবাই সব জিনিসের গ্রাহক না, সবাই সব খবর পড়তে চায় না। কেউ পড়তে চায় সংগীতের খবর, কেউ পড়তে চায় খেলার খবর, কেউ পড়তে চায় রাজনীতির খবর। যে যেটা পড়তে চায় তার সেটারই গ্রাহক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যে কারণে আপনার আলাদা আলাদা ভিডিও কনটেন্ট, ভিডিও এলিমেন্ট এগুলোর মার্কেটিং হচ্ছে। এবং এই অপরচুনিটিটাকে সবাই কাজে লাগিয়ে সেটাকে কীভাবে মনিটাইজ করা যায়, সেখান থেকে আয় করা যায়, উপার্জন করা যায়, সেই চেষ্টা গণমাধ্যমগুলো করছে। সেটা তো একটা ইতিবাচক পরিবর্তন। এখন এই ইতিবাচক পরিবর্তন কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে হচ্ছে। এত দ্রুততার সাথে হচ্ছে, যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের নিউজরুম তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

আপনি এআই এর কথা বললেন এআই এখনো বাংলাদেশের ৮০% গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে না, কিন্তু যে ২০% হচ্ছে তারাও কিন্তু বিশ্বের বাকি বিশ্বের অন্যান্য নিউজরুমের সাথে পাল্লা দিয়ে পারছে না, পিছিয়ে আছে। কিন্তু পরিবর্তন এত দ্রুত হচ্ছে, আমাদের থেকে অন্যান্য উন্নত বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের বার্তাকক্ষগুলো অনেক অনেক গুণ এগিয়ে গেছে এই এআই ব্যবহারে। এই যে প্রযুক্তিগত রূপান্তর, আরও দ্রুততার সাথে হয়ত হবে, যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত আর তিন বছর পরে বা এক বছর পরেই আরেকটা নতুন গণমাধ্যম কমিশন প্রয়োজন হবে, যারা এই ডিজিটাল চ্যালেঞ্জকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, সেই জিনিসটায় নজর দিয়ে সেই বিষয়ে সুপারিশমালা তৈরি করবে বা করণীয় ঠিক করবে। আমরা জানি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা যখন তৈরি হয়েছে ২০২৫ সালের মার্চে, সেই সময় পর্যন্ত ডিজিটাল মাধ্যমে যতটুকু রূপান্তর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং চ্যালেঞ্জ গুলো দেখেছি – সেই চ্যালেঞ্জ গুলোর কথা তুলে ধরেছি এবং সেই অনুযায়ী সুপারিশ দিয়েছি।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: সুপারিশমালার মধ্যে এক মালিকানার অধীনে যে অনেক কয়টা মিডিয়া আছে, সেগুলোকে বাতিল করার কথা বলেছেন। বাংলাদেশে যাদের ক্রস ওনারশিপ আছে, আমরা যদি বসুন্ধরা বলি কিংবা জেমকন বলি, তাদের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সরকারের সাথে তাদের যে নেক্সাস, সেই প্রেক্ষিতে এগুলো বাতিল করা সম্ভব কি না?

কামাল আহমেদ: যদি এই নীতিমালা অনুসরণ না করা হয়, এই সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা দানব দেখব, মহাদানব দেখব। অতীতেও দেখেছি, এই যে একই হাউজের অধীনে বা একই মালিকের অধীনে চারটা-পাঁচটা পত্রিকা, কিংবা আরও দুটো টেলিভিশন, তারা গণভবনে সমর্থন দিয়ে এসেছিলেন না, যে আজীবন দেখতে চান এবং সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিরোধী দল, তাদেরকে আজীবনের জন্যে নিষিদ্ধ করতে বলেননি! তাদের জেলখানায় পাঠাতে বলেননি! আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তার সম্পর্কে কী বক্তব্য দিয়েছিলেন জুলাইয়ের শেষ দিকে যে গণভবনে বৈঠক হলো, সেই বৈঠকে বক্তৃতা দিয়ে। স্মরণ করে দেখেন। পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে দেখেন পত্রিকায়। তো এখন যদি আপনি তাদেরকে এভাবে দানবে রূপান্তরিত হতে দেন ভবিষ্যতে তার পরিণতি আপনাদেরকেই বহন করতে হবে। দেশের মানুষকেই বহন করতে হবে।

সুতরাং কাউকেই অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হতে দেওয়া যাবে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে চাচ্ছি। দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কার হচ্ছে, সেই রাজনৈতিক সংস্কারে কী বলা হচ্ছে ভারসাম্য দরকার। ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার, এবং একাধিক কেন্দ্র দরকার। মানে রাষ্ট্রপতিকেও কিছুটা ক্ষমতা দেন। বিচার বিভাগকেও কিছুটা বিচারিক ক্ষমতা দেন, যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, নির্বাহী বিভাগের উপরে বা প্রধানমন্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। আমরা সংসদকে আরও ক্ষমতাশালী করতে চাচ্ছি, যেন ‘জি হুজুর’ পার্লামেন্ট না হয়। আপনি যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বন্ধ করা জরুরি বলে মনে করেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে বেসরকারি পরিসর, বিশেষ করে – গণমাধ্যমের যে ব্যাপক পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষমতা, সেখানে যদি আপনি কাউকে একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে দেন তাহলে সেটা কি হবে! সেজন্যেই মনোপোলি এবং অ্যান্টি কম্পিটিটিভ কনসেন্ট্রেশন বন্ধ করতে হবে। এর বিকল্প নেই। আজ হোক, কাল হোক করতে হবে। না করলে, এটার ভোগান্তি সবাইকেই ভুগতে হবে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শেষ হয়ে নতুন রাজনৈতিক সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনাদের তৈরি করা রিপোর্টটি বর্তমান সরকার গ্রহণ করবে কি না বা এ নিয়ে আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

কামাল আহমেদ: আপনাদেরকে প্রশ্নটা করতে হবে বিএনপির কাছে। প্রশ্নটা করতে হবে নতুন তথ্যমন্ত্রীর কাছে। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে। তথ্যের যে একজন উপদেষ্টা দেওয়া হয়েছে তার কাছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যে তারা কী মনে করেন? তারা কী এই সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করবেন না করবেন না? এই সুপারিশমালা সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন কী? তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এটা তারা বলতে পারবেন। এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার কাছে নেই।

আমি আমার দিক থেকে, আমাদের কমিশনের দিক থেকে যেটা ভালো মনে করেছি, সেটাই আমরা দিয়েছি। এবং শুধু মনে করা না, এটা এভিডেন্স বেজড, একেবারে সাক্ষ্য-প্রমাণ ভিত্তিক। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা, দেশের অভিজ্ঞতা, নথিপত্রে যা প্রমাণ পেয়েছি, এবং আগের কমিশনগুলো যে কাজ করেছে সেগুলোর ভিত্তিতে – আমরা সুস্পষ্টভাবে রোগগুলো কী এবং কী ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে এবং কীভাবে সম্ভব, সেই পথগুলোর কথা বলে দিয়েছি। এখন এটা বাস্তবায়ন হলে পরিবর্তন হবে, বাস্তবায়ন না হলে পরিবর্তন হবে না। বাস্তবায়ন হবে কি না, সেটা একমাত্র বলতে পারে, যাদের বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাটা কেবলমাত্র সরকারেরই আছে। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকার ছিল, অন্তর্বর্তী সরকার করতে পারতেন, করেননি। এখন রাজনৈতিক সরকার এসেছে, রাজনৈতিক সরকার করবেন কি করবেন না, সেটা কেবলমাত্র তারাই বলতে পারেন। ●

মীর হুযাইফা আল মামদূহ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১২ এপ্রিল ২০২৬।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার াবিতে জুলাই গ্রাফিতি। ইডেন কলেজ সংলগ্ন দেয়াল, ঢাকা। ৬ জুলাই ২০২৬। *আলোকচিত্রী: সুমন কান্তি পাল/দৃক*

নেকড়ের নয়া পাল?

শহিদুল আলম

এই গল্পের একটি ভালো দিক আছে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একটি দল একটি টেলিভিশন কেন্দ্রে 'দেখা' করতে গিয়ে কর্মকর্তাদের বলেন, তাদের কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নিতে হবে। তার কারণ? তাদের খবরের ধরন দলটির পছন্দ না। এ নিয়ে দেশে এখনও বেশ আলোচনা হচ্ছে – এটাই হলো ভালো দিক। এই ঘটনার সাথে ডিজিএফআই (প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর) এর কোনও সম্পৃক্ততা নেই। প্রকাশ্যে কোনও অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। কোনও মিথ্যা মামলা দাখিল করা হয়নি। আমাদের জানামতে, কোনও শেয়ার মালিকানার হাতবদল ঘটেনি। একদিকে দেখা যাচ্ছে, যারা ঘটনার শিকার তারা প্রতিবাদ জানানোর দুঃসাহস দেখিয়েছেন, আর অন্যদিকে, প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলটির আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হচ্ছে। তারপরও কেন এত হৈচৈ?

সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী ছাত্রনেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ যখন তার দলবল নিয়ে সিটি গ্রুপ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাসানের অফিসকক্ষে ঢুকে তাকে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন মো. হাসান জানতেন তিনি এই নির্দেশটি ফেলে দিতে পারবেন না। কিন্তু এই কাহিনীর নানান বয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি মো. হাসানের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি কোনও সাড়া দেননি। *বিবিসি বাংলা* তাকে উদ্ধৃত করে বলে যে, হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থী সময় টেলিভিশনের ১০ জন কর্মীর নামের একটি তালিকা তাকে দিয়ে এবং তাদের বরখাস্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তবে হাসনাত এ বিষয়ে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, তিনি মো. হাসানকে কোনও তালিকা দেননি।

হাসনাত যে সময় এর সংবাদ পরিবেশনের ধরনে অসন্তুষ্ট ছিলেন, এটা সবাই জানেন। তিনি এএফপিকে বলেন, 'সময় টেলিভিশন প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছিল, আমার মন্তব্য বিকৃত করছিল এবং একটি পতিত রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল।' ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ১৫-২০জন শিক্ষার্থীসহ হাসনাত সময় টিভির হোল্ডিং কোম্পানি সিটি গ্রুপ এর অফিসে গিয়ে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ঠিক কীভাবে এই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, তা নিয়েই যত বিতর্ক।

জুলাই গ্রাফিতি। এই গ্রাফিতির পরিপ্রেক্ষিত: মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি বাংলাদেশের অস্তিত্বকে 'বাপের সম্পত্তি' করে তোলার অভিযোগ জনমনে ছিল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার প্রতি। ধানমণ্ডি, ঢাকা। ১ জানুয়ারি ২০২৫।

আলোকচিত্রী: শহিদুল আলম/দৃক

যদি একই ঘটনা ৫ আগস্ট ২০২৪ এর আগে ঘটত, তাহলে এ নিয়ে এত আলোচনা হতো না। কিন্তু এখনের স্ক্রিপ্ট তো আগের স্ক্রিপ্ট থেকে একেবারে ভিন্ন। মব শাসন আগেও ছিল। মিডিয়ার স্বাধীনতা বরাবরই হুমকিগ্রস্ত ছিল, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক। তাহলে আমি এত চিন্তিত কেন? বিশেষ করে কারণ যার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ, তিনি তো পরবর্তীতে উক্ত টিভি চ্যানেল আমার সাথে যেই দুর্ব্যবহার করেছিল সেই প্রসঙ্গটিও তুলেন। আমি এমন একজনের কথা বলছি, যার তো 'আমাদের পক্ষে'ই থাকার কথা।

আমাকে অকৃতজ্ঞ বলতে পারেন, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে করা আক্রমণকে ব্যবহার করে একটি টেলিভিশন কেন্দ্রকে আক্রমণ করাটা আমার ভালো লাগেনি। এটি সত্য যে *সময় টিভি*-র কার্যকলাপ জঘন্য ছিল। এটি ছিল প্রকাশ্যে দেখা সবচেয়ে নির্লজ্জ, নিকৃষ্ট ও চাটুকার চ্যানেল। এটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রোপাগান্ডা প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। সরাসরি কারও ওপর গুলি না চালালেও, এই চ্যানেল যে অনেকের আহত ও নিহত হওয়ার পেছনে পরোক্ষ অবদান রেখেছে তা নিশ্চিত। হলুদ সাংবাদিকতার হীনতম নিদর্শন ছিল এই চ্যানেল। কিন্তু সমস্যা হলো হলুদ সাংবাদিকতা তো কোনও ফৌজদারি অপরাধ না। তাদের কাজ যতই অপছন্দ করি না কেন, আমাদের মিডিয়ার অধঃপতন নিয়ে যতই আফসোস করি না কেন, তাদের সাংবাদিকতার ধরন জনসমক্ষে তুলে ধরা ও জনগণ খবরের ভালো উৎস বাছাইয়ে বিচক্ষণতা দেখাবেন – এই প্রত্যাশা করা ছাড়া আমার আসলে আর কিছু করার নেই।

হ্যাঁ, সাহসী শিক্ষার্থী আর প্রতিবাদী জনতার সাথে আমিও রাজপথে ছিলাম যখন শেখ হাসিনার খুনি বাহিনী রাস্তায় মানুষ হত্যা করছিল। হ্যাঁ, সরকারের দুর্নীতি আর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে যাদের মূল্য দিতে হয়েছিল আমিও তাদের মধ্যে একজন। হ্যাঁ, এই বিপ্লব নিয়ে আমিও গর্বিত ও আনন্দিত। আমরা শেষমেষ এক স্বৈরাচারীর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি! কিন্তু যখন ছাত্র সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ একটি টিভি চ্যানেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণ করার 'নির্দেশ' দেওয়ার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন, তখন আমি ভাবি ওই পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কী আর কোনও বিকল্প ছিল। *সময় টিভি* ডেভিড বার্গম্যান, লিসা গাজী, কদরুদ্দিন শিশির ও আমার সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছিল, হাসনাত তা উল্লেখ করে নিজের অদ্ভুত আচরণের ন্যায্যতা তৈরির চেষ্টা করেন। কিন্তু এটি যে তার অগ্রহণযোগ্য কাজকে ধামাচাপা দেওয়ার একটি দুর্বল প্রচেষ্টা, আমি আশা করি সেটি তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন।

এর বাইরেও ভাবনার আরও বিষয় আছে। এই ঘটনা নিয়ে মূলধারার মিডিয়ার নীরবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মিডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে যত বড় বড় কথা বলা হয়, বাস্তবতা আসলে তা না। সাহসী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিডিয়া খুব কমই কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। বিগত শাসনামলে অনেক ভয়ভীতি ছিল, তা সত্য। কিন্তু তাই বলে কি তাদের এতটা ভীত হওয়ার দরকার ছিল? হাসিনা চলে যাওয়ার পর, তারা কী এখন প্রেতাত্মার ভয়ে ভীত? কী বলে তারা, তাদের এই নীরবতার পক্ষে সাফাই গাইবে? নতুন একপাল নেকড়ের সামনে তারা কী আবারও ভেড়ার পাল হয়েই থাকবে, নাকি নিজেরাও ওই নেকড়ের পালে যোগ দেবে? আর সরকার? এ রকম গুরুতর অভিযোগকে স্রেফ টিভি চ্যানেলটির 'অভ্যন্তরীণ মামলা' বলে এড়িয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব? চ্যানেল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দাখিল না করলে নাকি তাদের পক্ষে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব না। সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি রাজনৈতিক দল এভাবে সরাসরি ভয়ভীতি প্রদর্শন করলে সরকারের হস্তক্ষেপ করার কী কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই? তাদের নীরবতা কী বার্তা দেয়?

আমি হাসনাতের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। তিনি দ্রুতই ফিরতি যোগাযোগ করেন এবং আমাদের লম্বা সময় ধরে কথা হয়। এরপর আমি তাকে কিছু ফলো আপ প্রশ্ন লিখে পাঠাই: (১) আপনি তাদেরকে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নিতে বলার পর তাদের কাছ থেকে কী আশা করেছিলেন? (২) ঘটনার ফলাফল নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? (৩) আপনি বলেছিলেন আপনাদের কথোপকথনের সময় মো. হাসান অত্যন্ত সদয় ছিলেন। আপনি কি মনে করেন সাংবাদিকরা যে ধরনের খবর প্রচার করেন তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব? (৪) আপনার কি মনে হয় আপনি যে তরিকায় ব্যাপারটি মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিলেন তা সঠিক ছিল? আপনি কি মনে করেন দেশও একইভাবে পরিচালনা করা উচিত? হাসনাত যদিও ওই সময় সফরে ছিলেন, তবুও তিনি আমাকে তাৎক্ষণিক উত্তর দেন – 'আমি ফিরে আসা মাত্রই আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব।' কিন্তু এরপর তার থেকে আর কোনও সাড়া মেলেনি। যদিও আমি আবারও বার্তা পাঠিয়েছিলাম তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। এদিকে *জাগোনিউজে* একটি প্রতিবেদন পড়ে মনে হলো হাসনাত তার আগের বয়ান থেকে সরে এসেছে। পূর্বের 'সদয়বান' মো. হাসান এখন খলনায়কে পরিণত হয়েছেন, তার কারণে হাসনাতের সম্মানহানি ঘটেছে। 'এটি পরিকল্পিত,' হাসনাত জোর দিয়ে বলেন, 'এবং আমি ভুল করে সেই ফাঁদে পা দিয়েছি।'

মো. হাসান আমার সাথে কোনও যোগাযোগ করেননি। তিনি আমার প্রথম বার্তার কোনও উত্তর দেননি, পরের বার্তারও না। এএফপির সাবেক ব্যুরো প্রধান শফিকুল আলম আমার পুরোনো বন্ধু। বিভিন্ন সংকটপূর্ণ সময়ে উপস্থিত থাকা অল্প কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের একজন হওয়াতে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম। অফিসে টেবিলে না বসে, তিনি ঘটনাস্থল থেকে খবর লিখে পাঠাতেন। পূর্ববর্তী সরকার যখন তাদের হত্যাযজ্ঞ লুকানোর জন্য ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন শফিক প্রচণ্ড ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সাথে বাকি দুনিয়ার যোগাযোগ নিশ্চিত করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। তার ভূমিকা এখন ভিন্ন। আমি আশা করেছিলাম তিনি তার সাংবাদিকতার শিকড়ের সাথে যুক্ত থাকবেন। ব্যক্তিগত আলাপে তিনি সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন যেন আমি তাদের সমালোচনা করা এবং ভুল ধরিয়ে দেওয়া চালিয়ে যাই। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার এড়িয়ে যাওয়া উত্তর ও বিভিন্ন প্রশ্নে সাড়া দিতে পারার অক্ষমতা এটিই ইঙ্গিত করে যে এখন যোগাযোগের নিয়মাবলি বদলে গেছে। একটি প্রভাবশালী দল যদি একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে হুমকি দেয়, সে ক্ষেত্রে সরকারের কিছু করার নেই – এহেন অবস্থান দায় এড়ানো ছাড়া আর কিছুই না। যা বোঝা গেল, বেড়ার ওপার থেকে ব্যাপারস্যাপার ভিন্ন দেখায়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত তাদের অভ্যাস না পাল্টালে, এই বেড়াও বেশি দিন থাকবে না। নামিয়ে ফেলা হবে। ●

শহিদুল আলম একজন আলোকচিত্রী ও অ্যাক্টিভিস্ট। মূল লেখা প্রকাশিত হয় দৈনিক New Age এ 'A New Set of Wolves,' ০২.০১.২০২৫। বাংলা অনুবাদ করেছেন নাফিসা নাওয়াল। লেখকের সম্মতিক্রমে সামান্য সম্পাদনা করা হয়েছে।

‘হাইব্রিড রেজিমের যুগে, হাইব্রিড মিডিয়া সিস্টেমে ওয়ান মিডিয়া, ওয়ান ওনার থিওরি আর খাটে না’

২১-এর পৃষ্ঠার পর চ্যানেল হতো এবং বলত, ‘লগি-বৈঠা আন্দোলন ঠিক ছিল না।’ কিন্তু তারা সেটা বলেনি, কারণ তারা বুঝেছিল ক্লায়েন্ট বদলাচ্ছে। একইভাবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে-পরে দেখা গেছে, সব চ্যানেল আওয়ামী লীগ ঘরানার মালিকানাধীন হলেও তারা সরাসরি রাজনৈতিক ভাষায় কথা বলেনি। কারণ তারা বুঝেছে, ক্লায়েন্ট বদলে গেছে।

এটাই বাংলাদেশের ইউনিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর কোথাও একসাথে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি আর রাজনৈতিক ক্লায়েন্টেলিজম এত স্পষ্টভাবে কাজ করে না। এই দুইটা একসাথে থাকলে সেটাকে বলা যায় ‘পলিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টালাইজেশন’। এটা নতুন কোনো থিওরি না, কিন্তু কমিশন এটা ধরতে পারেনি। এর সঙ্গে আরেকটা বিষয় যুক্ত হয়েছে, ‘করপোরেট ক্লায়েন্টেলিজম’। রাজনৈতিক আর করপোরেট নেক্সাস মিলিয়ে এখানে এক ধরনের অদ্ভুত মিডিয়া সিস্টেম তৈরি হয়েছে, যেটা এই রিপোর্টে অনুপস্থিত। করপোরেট ক্লায়েন্টেলিজম নিয়ে তারা একেবারেই ভাবেননি।

হাইব্রিড রেজিমের যুগে, হাইব্রিড মিডিয়া সিস্টেমে ‘ওয়ান মিডিয়া, ওয়ান ওনার’ থিওরি আর খাটে না। একসময় প্রথম আলোর শুধু প্রিন্ট ছিল। এখন তাদের কাছে কী নেই? *দ্য ডেইলি স্টার*, *সমকাল*, সবাই মাল্টিপ্ল্যাটফর্ম। সবচেয়ে বড় কথা, তারা বিজনেস মডেল চিন্তা করেননি। আপনি যদি ম্যাক্রো লেভেলে ভাবেন, তাহলে বিজনেস মডেল ভাবতেই হবে। আগে মিডিয়ার ব্যবসা ছিল মূলত সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর। এখনও আছে, বিশেষ করে দেয়াল পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে। তারা সার্কুলেশন দেখিয়ে ডিএফপি থেকে অনুমোদন নেয়, তারপর সরকারি বিজ্ঞাপন পায়।

কিন্তু বড় মিডিয়াগুলো এখন আর শুধু সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল না। এমনকি করপোরেট বিজ্ঞাপনের ওপরও পুরোপুরি না। আগে আপনি গ্রামীণ ফোনের বিরুদ্ধে নিউজ করতেন না, কারণ বিজ্ঞাপন। এখন আপনি নিউজ করবেন, কারণ আপনার বড় আয়ের উৎস Google AdSense। আপনি গ্রামীণের বিরুদ্ধে নিউজ করলে গ্রামীণ হয়তো আপনাকে দেশীয় বিজ্ঞাপন দেবে না – কোনো সমস্যা নেই। ইউটিউবে তখন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞাপন আসবে, যেখানে বাংলা ভাষাভাষী আছে। মানে মিডিয়ার বিজনেস মডেল বদলে গেছে। কিন্তু রিপোর্টে মনে হয়েছে, ওনারা ধরে নিয়েছেন আমরা এখনো আগের মতো সরকারের বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। আসলে নির্ভরশীল কারা? যারা দেয়াল পত্রিকা চালায়। যারা পত্রিকা বের করে সার্কুলেশনের জন্য না, বরং অবৈধভাবে নিউজপ্রিন্ট এনে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রির জন্য। এই জায়গাটায় কোনো কনসার্ন নেই।

আপনি যদি মিডিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে চান, সার্কুলেশন নিয়ে কাজ করতেই পারেন। কিন্তু তার জন্য স্পষ্ট ক্রাইটেরিয়া দরকার। প্রত্যেকটা মিডিয়া হাউজকে ইনকাম-এক্সপেন্স, সার্কুলেশন, ওয়েজ বোর্ড – সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। একটা পত্রিকা কেন এসব হিসাব দেয় না – এই প্রশ্নটা কি গত এক বছর বা ১৬ মাসে একবারও করা হয়েছে? সংস্কার করার আগে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি স্বচ্ছ হতে চান। এটা প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার করবে না – তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার মূল্যায়ন হলো, উদ্যোগটা ভালো ছিল, কিন্তু খুবই মাইক্রো লেভেলের।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: কমিশনের প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে বেশ কিছু প্রস্তাব আছে, সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের একটি খসড়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিকদের দায়বদ্ধতার জায়গায় তেমন জোর দেওয়া হয়নি বরং প্রেস কাউন্সিল পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। আপনি এই বিষয়টা কীভাবে দেখেন?

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: উদাহরণ দিই। একজন নারী সাংবাদিককে তার সহকর্মী পছন্দ করলেন, প্রস্তাব দিলেন, নারী রাজি হলেন না। পরে ওই ব্যক্তি তার বিকৃত বা অশ্লীল ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে দিল। নারী সাংবাদিক ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে (ডিএসএ) মামলা করলেন। আমরা রিপোর্ট করলাম – ‘সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা।’ আবার আরেকটা কেস – একজন সাংবাদিক একটি কলেজছাত্রীকে হ্যারাস করেছে, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে, বাবা মামলা করেছেন। আমরা বলছি – ‘সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে মামলা।’

কিন্তু একই ঘটনা যদি একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হতো, তখন আমরা ডিএসএকে ভালো আইন বলতাম। আরও মজার উদাহরণ আছে। কোর্টরুমে এক মুহুরি দুপুরে একটু ঘুমাচ্ছিলেন। কেউ সেটা ভিডিও করে এক সাংবাদিককে দিলেন। সাংবাদিক সেটা টিভি বা পত্রিকায় দেয়নি – ফেসবুকে লাইভ করেছে, আদালতে কী হচ্ছে তা দেখাচ্ছে বলে। আদালত তাকে কনটেম্পট অফ কোর্টে না নিয়ে ডিএসএতে মামলা করেছে। আর আমরা বলছি – ‘সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে মামলা।’

সাংবাদিক হলেই কেউ মহামানব হয়ে যায় – এই ধারণা ঠিক না। একজন মালিক বা সম্পাদক যদি মানবপাচারের মতো অপরাধ করে, আমি বা আপনি করলে যে অপরাধ হতো, তার ক্ষেত্রেও তাই হবে। আইনে কোথাও লেখা নেই যে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা সুবিধা থাকবে। তাই আমার শাস্তি যেমন হবে, তারও তেমনই হবে। আমরা এখানে একধরনের ককটেল বানিয়ে ফেলেছি। এটা আমাদের সিস্টেমের দুর্বলতা, আবার এটাকে কেউ কেউ ইউনিকনেসও বলে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিএনপি আমলে সাংবাদিকরা নিউজ করতে পারেনি – এটা প্রমাণিত। কিন্তু ডিএসএ থাকার কারণে সাংবাদিকরা নিউজ করতে পারেনি – এটা প্রমাণিত নয়।

এটা বলছি আইনের গোড়ায় যেতে হবে বলে। কারণ ডিএসএ না থাকলেও মানহানি আইনে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৯ থেকে ৫০২ ধারায়, একসঙ্গে ৬৪ জেলায় মামলা করা যেত। থার্ড পার্টি মানহানি মামলা করতে পারে – ডিএসএতেও পারত। তাই আপনি শুধু একটি নিবর্তনমূলক আইন বাদ দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। রুট আইনগুলো – ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি – সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

মানহানি, অন্যান্য অপরাধ – সব একত্র করে নতুন নামে আরও বড় একটি শাস্তি নিবর্তন কাঠামো বানানো হয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার আইন নেই – এই কথা বলা যাবে না। দার্শনিকভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সব দেশেই আছে, পার্থক্যটা হলো রাজনৈতিক সিস্টেমে। ইংল্যান্ডে আইন আছে, কিন্তু তারা ব্যবহার করে না – কারণ তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে জনগণের ওপর এই আইন প্রয়োগ করা যাবে না।

আপনি ডিএসএ বাদ দিয়েছেন, সাইবার সিকিউরিটি আইন সংশোধন করেছেন – কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন রেখে দিয়েছেন। ওই আইনে আপনি সাংবাদিককে ধরতে পারবেন। সাংবাদিককে খুনের মামলায় ফাঁসানো হলে কোন ‘সাংবাদিক সুরক্ষা আইন’ তাকে বাঁচাবে?

আবার উল্টো উদাহরণও আছে। ভালো আইন থাকলেও কাজ হয় না। ২০১১ সালে হুইসেল-ব্লোয়ার আইন হলো – জনস্বার্থে তথ্য ফাঁস করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই আইন কার্যকরভাবে ব্যবহার হয়নি। শেষ উদাহরণ দেই – যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল, সেটা বিদেশে থাকা এক সাংবাদিক ফাঁস করেছেন। সরকার খুঁজে বের করে কোন কর্মকর্তা তথ্য দিয়েছে সেটা বের করে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়, অথচ ওই আইনের অধীনে তাকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা ছিল।

ভালো আইন আমাদের আছে। কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না। আইন থাকলেই হয় না – আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হয়। হুইসেল-ব্লোয়ার আইনের কথাই ধরুন – ওই কর্মকর্তার জন্য সেটাই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাকে সুরক্ষা না দিয়ে উল্টো বিশেষ ক্ষমতা আইনে ফেলা হলো।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আইন তো আছে, কিন্তু সাংবাদিকদের দায়বদ্ধ করার যে ব্যবস্থাটা দরকার, সেটা আসে না। ডিএসএ কিংবা একই ধরনের আইন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত অপরাধ, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার ঠেকায় না। সাংবাদিককে দায়বদ্ধ করার জন্য প্রেস কাউন্সিল আছে। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট?

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: কোড অব কন্ডাক্ট থাকা দরকার – শুধু সাংবাদিকের জন্য না, পুরো সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য, মালিকসহ সবার জন্য। আপনি বলছেন ‘স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান’, কিন্তু কাগজে-কলমের স্বায়ত্তশাসন আর বাস্তব স্বায়ত্তশাসন এক জিনিস না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাগজে স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু বাস্তবে কী? ২০২৪ সালের আন্দোলনের সময় ভিসি যদি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখতে চাইতেন, পারতেন? একদম না। মানে প্রয়োজনে, বাস্তবতার চাপে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের ধারণাটাই ভুলে যাই। তাই শুধু স্বায়ত্তশাসিত কাঠামো দিয়ে হবে না – সেফগার্ড দরকার।

সেফগার্ডের প্রথম শর্ত হলো আয়ের সক্ষমতা। ক্ষুধার্ত মানুষকে আপনি চুরি না করতে কীভাবে বলবেন? পাশে পুলিশ রাখলে সে বাধ্য হয়ে পুলিশকেই কামড়াবে। বাংলাদেশের মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মিডিয়া যদি বাঁচতেই না পারে, তাহলে নৈতিকতা টিকবে কীভাবে?

সামাজিক নিরাপত্তা যত গাণিতিক হারে কমে, সাংবাদিকের ঝুঁকি তত জ্যামিতিক হারে বাড়ে – কারণ সাংবাদিক সেই নিরাপত্তাহীনতাই এক্সপোজ করে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ঠিক না হলে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন কোনো কাজেই করবে না। যদি রাষ্ট্রের দর্শনই হয় – ‘তুমি আমার সমর্থক না, তাই তোমাকে কেউ মারলেও সে শাস্তি পাবে না’ – তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের সাংবাদিক মার খেলে সেখানেও কোনো রেমেডি থাকবে না।

খুব সহজ কথা – গণমাধ্যমকে যদি ‘বিচ্ছিন্ন দ্বীপ’ ধরে সংস্কার করতে চান, তাহলে কোনোদিনই সংস্কার হবে না। এটা অসম্ভব।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: মিডিয়ার কথা বলতে গেলে আমরা দেখি – গত সরকারের সময়ে যে টিভি চ্যানেলগুলো লাইসেন্স পেয়েছে, তারা সরাসরি ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’, ‘উন্নয়ন’ – এই ভাষায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, ৫ আগস্টের পর কি আপনি মনে করেন কোনো রিকনসিলিয়েশন দরকার ছিল?

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: আমাদের রাজনৈতিক সিস্টেম এমন – যে ক্ষমতায় আসে, সে তার গুণগান চাইবে। শুরুতেই বলেছিলাম – লাইসেন্স দেওয়া হয় এই বিবেচনায় যে আপনি ‘আমার লোক’ কি না। এটাকে আমরা বলি রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি বা political patronage structure। কিন্তু দিনের শেষে মিডিয়া মালিকরা হয়ে যায় রাজনৈতিক ক্লায়েন্ট। করপোরেট দরকার হলে করপোরেট ক্লায়েন্ট, রাজনৈতিক দরকার হলে রাজনৈতিক ক্লায়েন্ট। বাংলাদেশে স্বীকৃত পার্টি প্রেস না থাকা একটা বড় ঘাটতি। যদি মিডিয়া প্রকাশ্যে বলত – আমি বিএনপির, আমি জামাতের, আমি আওয়ামী লীগের, এবং আমি তাদেরই পক্ষে কথা বলব – তাহলে দর্শক জানত। তখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাইরে একটা রেগুলেটরি বোর্ড থাকা দরকার ছিল – একটা ন্যায়পালের মতো। যারা কনটেন্ট দেখে বলত, এটা প্রো-আওয়ামী লীগ, এটা প্রো-বিএনপি, এটা প্রো-জামাত। যদি তাই হয়, তাহলে বলা হতো – তুমি ডিক্লেয়ার করো, তুমি পার্টি প্রেস।

গণমাধ্যম কারও কাছে শপথ নেয় না। শপথ নেয় তার টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে। তাই গণমাধ্যমকে আগে টার্গেট অডিয়েন্স ঠিক করতে হবে। অডিয়েন্স যদি বলে – তুমি আসলে প্রো-আওয়ামী লীগ বা প্রো-বিএনপি, এবং সেটা ঘোষণা কর – তাহলে মিডিয়াকে ঘোষণা করতে হতো। এই প্রক্রিয়াটা যদি রেগুলেটরি বোর্ডের মাধ্যমে থাকত, তাহলে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির চেহারাটা অনেক পরিষ্কার হতো।

কারণ আপনি যতই রাজনৈতিক ব্যবসায়ী হন না কেন, আপনি দেখবেন – ধরি মাছ না ছুঁই পানিতে ইনভেস্ট করা যাচ্ছে। তখন আপনি সেটাই করবেন। কেননা আপনি জানেন, ক্ষমতা বদলালে ক্লায়েন্ট বদলানো যাবে। বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলালেই রাতারাতি মিডিয়ার অবস্থান বদলে যায়। ৫ আগস্টেও তাই হয়েছে। যারা আওয়ামী ঘনিষ্ঠ ছিল, ক্ষমতা যেতেই হঠাৎ সবাই আওয়ামী-বিরোধী হয়ে গেল। কোনও কেসও হলো না। এর আগেই আপনি লিখে ফেললেন – ‘খুনি হাসিনা’। অথচ জেনুইন সাংবাদিক হলে আপনাকে লিখতে হতো – ‘খুনের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত’। আমি যখন সাংবাদিকতা করতাম, সবাই লিখত ‘যুদ্ধাপরাধী’। আমি লিখতাম – ‘যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত’। কারণ সাংবাদিক হিসেবে আমি এই দায় নিতে পারি না। মতামত লিখলে ভিন্ন কথা – সেখানে আমার নিজস্ব মত থাকতে পারে। এই জায়গা থেকে সরে এসে যখন আপনি সরাসরি লিখবেন ‘যুদ্ধাপরাধী,’ তখন বোর্ডের কাছে অভিযোগ জানানো যেত – আপনি এথিকস মানছেন না। একটা লেয়ার থাকত – প্রথমে সতর্কতা, তারপর পরবর্তী ব্যবস্থা।

কিন্তু মালিক যখন দেখেন বাংলাদেশের মিডিয়া সিস্টেমে যেকোনো সময় ক্লায়েন্ট বদলানো যায়, বিনিয়োগের ঝুঁকি খুব সামান্য, আর কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যায় – এবং করপোরেট ক্লায়েন্টরা ঠিকই থাকে, তখন এই সিস্টেম ভাঙে না।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: সবচেয়ে বড় অনুপস্থিতি ছিল নিউ মিডিয়ার উত্থান। এখন পত্রিকা মানে শুধু ছাপা কাগজ নয় – সবাই হাইব্রিড মডেলে চলে গেছে। প্রতিটি নিউজ আলাদা একটি কনটেন্ট, যার আলাদা বাজার, আলাদা সার্কুলেশন, আলাদা মনোযোগ অর্থনীতি আছে। ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া – এসবের মাধ্যমে মিডিয়া পোস্টিং ও আয়ের কাঠামো পুরোপুরি বদলে গেছে। এই বড় পরিবর্তনটাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: শুধু এড়িয়ে যায়নি, এটা চিন্তাই করেনি। আমি তো বললাম, যেরকম ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট কেউ ছিল না, তেমনি টেকনোলজি-বেসড বিজনেস বোঝে এমন কেউও ছিল না। আপনি ধরেন, বাই ডিফল্ট চার-পাঁচজন সম্পাদকের নাম বলবেন, যাদের একজন হলেও থাকা উচিত ছিল মিডিয়া সংস্কার কমিশনে। বাংলাদেশে মিডিয়া বিষয়ে সংস্কার কমিশন করতে হলে কিছু লোক তো থাকতেই হয়।

আপনি পছন্দ না-ও করতে পারেন, সেটা আপনার ব্যক্তিগত মত। আপনি মতি ভাইকে পছন্দ নাও করতে পারেন, মতিউর রহমান (প্রথম আলো), মতিউর রহমান চৌধুরী (মানবজমিন), মাহফুজ আনামকে পছন্দ নাও করতে পারেন, নূরুল কবীরকে পছন্দ নাও করতে পারেন। আরও অনেক পুরোনো সম্পাদক আছেন, তাদেরকেও আপনি পছন্দ নাও করতে পারেন। কিন্তু তারা তো যার যার জায়গায় সফল। প্রথম আলো যে ফরম্যাটে এখন পর্যন্ত টিকে আছে, এবং প্রতিটি ধাপে করপোরেট করেছে, সেটাও ছোট কথা না। একসময় পত্রিকার প্রিন্ট সার্কুলেশনই সব ছিল। সে আলোকিত চট্টগ্রাম, আলোকিত দক্ষিণ - উত্তর সব করেছে। এখন সে এগুলো কমিয়ে এনেছে, কারণ দেখেছে এখানে ব্যবসা নেই। অন্যভাবে দর্শক টানতে হবে। সে দেখছে এআই আসছে, তাকে এআই-ও করপোরেট করতে হবে।

কিন্তু যারা আগে এগিয়ে ছিল, তাদের কেউ এখানে নেই। আপনি কোনোভাবেই ডাকেননি। আপনি সংস্কারের একটা রিপোর্ট দেবেন, তাদেরকে এক ঘণ্টার জন্য ডাকবেন, আর ধরে নেবেন তারা আমার মতো খুব অ্যাভেইলেবল, আপনাকে সব দিয়ে দেবে, এটা তো হয় না। এটা আপনাকে নিজের করে নিতে হবে। এবং করতেই হবে। আমি সেটাই বোঝাচ্ছি। আপনি একজন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টকে, যে ২০ বছর ধরে বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জের মুখে ইনভেস্টিগেশন করছে, তাকে চেনেন-জানেন, অথচ কমিশনে রাখলেন না কেন? তার চেয়ে কী আমি বেশি বুঝব?

উইথ ডিউ রেস্পেক্ট, কামাল ভাই বাংলাদেশে মাঠে-ঘাটে কয়দিন সাংবাদিকতা করেছেন? আমি নাম ধরে বললাম, স্যরি টু সে। উনি খুব নামকরা সাংবাদিক। খুব স্মার্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাংবাদিকতার বেসিক জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক ভালো দিতে পারবেন। কিন্তু আমার কথা হলো, আমি যেরকম বাংলাদেশের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমকে বুঝি না, তিনিও বুঝেন না। কারণ এই বেদনার জায়গাটায় তিনি আসেননি। আমি বলছি না যে আপনাকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক হওয়ার জন্য আরেকটা রবীন্দ্রনাথ হতে হবে। কিন্তু আপনাকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে হবে, রবীন্দ্রনাথকে জানতে হবে, সাহিত্যটা জানতে হবে। আপনি করেননি। দ্যাটস মাই পয়েন্ট।

আরেকটা ব্যাপার হলো, এই যে বিজনেস মডেলটা না বোঝা। এখন বাংলাদেশের মিডিয়ার সমস্যা কী, যখন আমরা নিউ মিডিয়া, ইনক্লুডিং এআই, এসবের দিকে জাম্প করছি? আসলে আগের বিজনেস মডেল ছিল আমরা পুকুরে মাছ ধরতাম। এখন সেইম জাল দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার চেষ্টা করছি যেহেতু আমাদের কখনোই পলিসি, বা সরকারি গাইডেন্স, বা কোনো স্বায়ত্তশাসিত বডি নেই, যারা রিসার্চ করবে। আমার সার্কুলেশন কমে যাচ্ছে, তাহলে কী করতে হবে? বাইরে দেশে এটা হয়। এই বডি মালিকদের হতে পারে। পুরো সাংবাদিক কমিউনিটির হতে পারে। অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গে মালিকদের যৌথ হতে পারে। রাষ্ট্রের স্পন্সরশিপেও হতে পারে।

এই যে বিদেশি ফান্ডগুলো আসে, ভাই তুমি আমাকে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কম শেখাও। আগে শেখাও যে আমার মিডিয়ার ভালনারেবিলিটি কী হবে। এখন ধরেন, কেউ নতুন পত্রিকা করবে, কেউ নতুন মিডিয়া করবে, কোনো অডিয়েন্স রিসার্চ আছে কী? না আছে সরকারের, না আছে আর কারও। ওদেরকে বলেন, ফান্ডিংটা আপনারা এই খাতে খরচ করেন, ডেটাটা অ্যাভেইলেবল করেন, পাবলিক করেন। এনজিওরা তো টাকা নিয়ে আসবে। আর আমি বলছি, এভরি ইনভেস্টমেন্ট কামস উইথ অ্যান ইনটেনশন। আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে, তোমার ইনটেনশন ২৫-৫০ শতাংশ রাখো, আমার ইনটেনশন ৫০ শতাংশ দাও। কিন্তু আমি মনে করছি কবে টাকা আসবে, টাকা কীভাবে খরচ করব। ও বলছে, তাড়াতাড়ি করে দাও। এটা তো আসলে লং টার্ম চিন্তা না।

২০১৮-এর পর থেকে আমরা এআই যুগে চলে এসেছি। সত্যিকার অর্থে যদি ফ্রি, ফেয়ার, ইনক্লুসিভ নির্বাচন ৫০ শতাংশও হয়, তাতে বাংলাদেশের যে ভালনারেবল সিচুয়েশন তৈরি হবে, সেটা হবে মিডিয়ার মাধ্যমে। কারণ আপনি মেইনস্ট্রিম মিডিয়াকে দোষ দিতে পারবেন না, আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আছে। সেটা আমাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না। এআই বা ডিপফেকের ব্যাড ইমপ্যাক্ট হলো একজন ক্যান্ডিডেটকে ডিফেম করা হবে। আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না।

ঢাকা শহরের ভোটিং বিহেভিয়ার, তেঁতুলিয়ার ভোটিং বিহেভিয়ার থেকে আলাদা। বিশেষ করে যেখানে মন্দির-মসজিদ পাশাপাশি আছে, ধর্ম আর রাজনীতি একসঙ্গে মিলে ভোটিং বিহেভিয়ার বদলে দেয়। সেখানে আপনি থামাতে পারবেন না। আর এর সবচেয়ে বড় শিকার হবে সাংবাদিকরা।

২০১৮ সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি সাংবাদিকদের বলেছিলাম, ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এটা হলে কী হবে। কেউ জিজ্ঞেস করল না। সেটা হলো, ২০১৮ সালে খুলনার একটা আসনে রিটার্নিং অফিসার, ভোট কত পেয়েছে বলে যাচ্ছিলেন, প্রতিটা কেন্দ্রে। সাংবাদিকরা খেয়াল করেনি। তারা ভোটকেন্দ্রের নাম লেখেনি, খালি সংখ্যা লিখে গেছে। মানে, উনি পাঁচ মিনিট আগে ভোটকেন্দ্র তিন বলছেন, দশ মিনিট পরে গিয়ে ভোটকেন্দ্র তিন আবার বলছেন। সাংবাদিক সব লিখে গেছেন। লিখতে লিখতে ৭০টা ভোটকেন্দ্রের জায়গায় রিপিটেড তথ্যসহ সাংবাদিকের কাছে ভোটকেন্দ্র হয়ে গেছে ৭৫টা। দেখা গেছে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্ট হয়েছে। সাংবাদিক ওটাই নিউজ করেছে। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিএসএ মামলা হয়েছিল, অ্যারেস্ট হয়েছেন।

দোষটা কার? দোষ তো রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সাংবাদিকেরও। কিন্তু প্রথম দোষটা কার, আপনি যদি ধরতে চান? আপনি আইনে বলেছেন, ভুল তথ্য কে দিলো সেটা বিষয় না। ভুল তথ্য যে ছড়াল, সে দোষী।

৩৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে হয়রানি ও আওয়ামী ট্যাগের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক

পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা দমন-পীড়ন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে নজিরবিহীন সময় পার করেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) থেকে প্রকাশিত তথ্যমতে, সাংবাদিক নিপীড়নের ধারাবাহিকতা গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও চলমান রয়েছে। এসময়ে হামলা-মামলা-হত্যার শিকার হয়েছেন ১,০৭৩ জন সাংবাদিক। দেশের সংবাদমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মাত্র দেড় বছরে যে সংখ্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পাশাপাশি মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনার শিকার হন।

উল্লেখ্য, পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশেষ সংকটের মুখোমুখি হয়। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে সরকারের অর্থনৈতিক লুটপাট ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার পক্ষে অনেক সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে কাজ করতে দেখা যায়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন শিক্ষার্থী, সাধারণ নাগরিকদের পুলিশ ও ছাত্রলীগ সমন্বিতভাবে হত্যা ও আক্রমণ করে, তখনও অনেক সাংবাদিক আন্দোলনকারীদের 'দুষ্কৃতকারী', 'জঙ্গী' আখ্যা দিয়ে নিপীড়নকে বৈধতা দেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, এই সাংবাদিক সমাজ যারা জুলাই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাদের নৈতিক ও আইনগত দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। টিআইবির প্রতিবেদনে এটাই স্পষ্ট হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনগত বিষয়গুলোকে অমীমাংসিত রেখে – সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও নিপীড়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

এই পরিস্থিতিকে 'বিচারের নামে প্রতিশোধ, সহিংসতা ও মৌলিক অধিকার হরণ' বলে মন্তব্য করেন, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী

> মোসাহেবি করা, সুযোগ-সুবিধা নেওয়া অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু সেটা খুনের অপরাধ নয়। আর যদি তা খুনের সমান অপরাধ হয়, তার জন্য আপনি আইন বানান। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সেটা নাই, তাদেরকে খুনের মামলায় আটকে রাখার অধিকার রাষ্ট্রের নাই।
>
> **নূরুল কবীর**
> *নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি*

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, 'বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা এক ধরনের অপরাধ।' জুলাই হত্যাকাণ্ডের সার্বিক বিচারপ্রক্রিয়ায় আলাদা উচ্চপর্যায়ের একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে – যা ২৪ সালের অগাস্ট থেকেই বলে আসছেন বলেও মন্তব্য করেন, ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রতিবেদন

টিআইবি'র 'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী সারাদেশে প্রায় ৫০০ ঘটনায় অন্তত ১,০৭৩ জন গণমাধ্যমকর্মী হামলা, মামলা, হত্যা, হয়রানি-নিপীড়ন, কারাভোগ ও চাকরিচ্যুতিসহ পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা, বাসাবাড়িতে হামলাসহ নানা ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন। টিআইবি জানায়, পটপরিবর্তনের সময়ে ৬ জন সংবাদকর্মী হত্যার শিকার হন। ২৫৯টি ঘটনায় ৪৫৯ জন গণমাধ্যমকর্মী হামলার শিকার হন। ১৮৯ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হন। ৮৯টি ঘটনায় ৯৯ জনকে নানা হুমকি দেওয়া হয়। ৩০টি ঘটনায় ৭০ জনকে হয়রানি করা হয়। ১৯টি ঘটনায় অন্তত ২৭ জনকে আটক করা হয়। ৯টি ঘটনায় ১৭ জন পরিবারের সদস্য হামলা কিংবা ঘরবাড়ি ধ্বংসের মুখোমুখি হন।

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জাফর সাদিক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ার বিষয়ে বলেন, 'আমরা দেখেছি যে যিনি সাংবাদিকতা করেন তিনি বা তারা বিভিন্ন ঘটনায় ও সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়ে হামলার শিকার হয়েছেন। এই হামলাগুলো যারা করেছেন তাদের একটি অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা পরিচয় ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া আরেকটি অংশ যারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত। একইসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ও হামলার শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা।'

সাইবার নিপীড়ন বা অনলাইনে হয়রানি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে জাফর সাদিক বলেন, 'এই বিষয়টি এখানে আনা হয় নাই, কারণ এটি হিসেব করা অত্যন্ত কঠিন। তবে আমরা লক্ষ করেছি গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত এই সংকটের মধ্যে আছেন।'

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা

৭১ টেলিভিশনের সাবেক কর্মী ও সাংবাদিক দম্পতি ফারজানা রুপা এবং শাকিল আহমেদকে ২১ আগস্ট ২০২৪ ভোরবেলায় দেশ ছাড়ার সময় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। সেদিনই উত্তরা পশ্চিম থানায় তাদের বিরুদ্ধে জুলাই শহীদ হত্যা মামলা দায়ের করা হয়; সেখানে ১৪৬ জন আসামির মধ্যে সাংবাদিক দম্পতিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরবর্তীতে মিরপুর এলাকায় জুলাই শহীদ হত্যা মামলাতেও এই দম্পতিকে আসামি করা হয়। জানা যায়, তাদের দুজনের বিরুদ্ধে অন্তত ৮টি হত্যা মামলা রয়েছে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তাদের বিরুদ্ধে রিমান্ড শুনানিতে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, তারা (ফারজানা রূপা ও শাকিল আহমেদ) আন্দোলনের সময় উসকানি দিয়েছে। স্বৈরাচারী হাসিনাকে, স্বৈরাচারী বানাতে সহযোগিতা করেছে। তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। এসময় কাঠগড়া থেকে ফারজানা রুপা বলেন, 'রাষ্ট্রপক্ষ যেভাবে উসকানি দেওয়ার কথা বলছে, তাহলে সেই উসকানির জন্য মামলা দেওয়া হোক। কেন একের পর এক হত্যা মামলা, কেন রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে? হত্যা মামলায় দিয়ে কেন হয়রানি করা হচ্ছে?' এরপর শাকিল আহমেদ কিছু বলতে চাইলে আদালত সুযোগ না দিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রতি শাকিল আহমেদ বলেন, 'এটা সুবিচার না অবিচার, তা আগে নির্ণয় করুন।'

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ময়মনসিংহের ধোবাউড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও ৭১ টিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু গ্রেপ্তার হন। তাদের বিরুদ্ধে কয়টি হত্যা মামলা আছে, তা পরিবারের সদস্যরাও জানেন না।

> বিচারের নামে এই যে প্রতিশোধের প্রক্রিয়াটা শুরু হলো, এর মাধ্যমে সব পক্ষই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন। পুরো বিচারপ্রক্রিয়ায় একটা আস্থাহীনতার সংকট তৈরি হলো... অন্তর্বর্তী সরকারের যদি সদিচ্ছা, সততা ও সাহস থাকত ও সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও কৌশল থাকত তাহলে অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারপ্রক্রিয়া সম্ভব ছিল।
>
> **ড. ইফতেখারুজ্জামান**
> *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

> আমরা যদি সত্যিই আগের আমল (আওয়ামী লীগের শাসনব্যবস্থা) থেকে একটা পরিবর্তন দেখতে চাই, সে অনুযায়ী কাজ হওয়া উচিৎ। কখন আপনি একজনকে জামিন দেবেন না, সেই বিষয়গুলোতো পরিষ্কার করতে হবে... অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনাবিচারে আটকে রাখা এটাই তো একধরনের অপরাধ।
>
> **ব্যারিস্টার সারা হোসেন**
> *সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী*

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা প্রসঙ্গে বলেন, 'আওয়ামী আমলে কর্তৃত্ববাদের যে স্তম্ভগুলো ছিল, তার মধ্যে একটি সংবাদমাধ্যম ও এখানে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা অনেকেই দোসর ছিলেন, যারা সরাসরি লাভবান হয়েছেন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছেন – প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেটাই হোক না কেন, সে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি ঢালাওভাবে মামলা করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কোনো সুযোগ ছিল না, এরকম ঢালাওভাবে তালিকাভুক্ত করে যেমন যারা সবশেষ সংবাদ সম্মেলনে (পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন) ছিলেন ও এমনকি যারা অনুপস্থিত ছিলেন সেই তালিকাও অনুসন্ধান করে মামলা করা হয়েছে, জেলে ঢুকানো হয়েছে, নির্বিচারে আটক রাখা হয়েছে। এই দায়টা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নিতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের *২০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

'ক্ষতিকর সাংবাদিকতার যে ভিকটিম, সেই লোকগুলোর প্রোটেকশন আপনি কীভাবে দেবেন?'

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আপনি বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে সাংবাদিকতা করছেন। এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ভবিষ্যতে আবার সাংবাদিকতায় ফেরার কথাও আপনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম কমিশনের প্রতিবেদনটি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

শফিকুল আলম: আমার মনে হয় গণমাধ্যম কমিশনের রিপোর্ট অনেকটা আইডিয়ালিস্টিক। আমাদের যে সিচুয়েশন, সেখানে কিছু কিছু প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা তো বহুবিধ, আর একটা সলিউশন দিয়ে সবকিছুর সমাধানের কথা ভাবা হয়েছে। প্রতিবেদনে যে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন করতে বলছেন, আমার পার্সোনাল মতামত হলো, বাংলাদেশের সাংবাদিক সুরক্ষা খুবই ভালোভাবে আছে। বরং অপসাংবাদিকতার কারণে যেসব লোকের পার্সোনাল লাইফ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যাদের নামে সারা জীবনের কুৎসা থাকছে, সারা জীবন যাদের নামে মিথ্যা থাকছে, তাদের প্রোটেকশনে আমাদের দেশে কিছুই নাই। জিরো প্রোটেকশন। কালকে যদি লেখা হয়, শফিকুল আলম একটা গে এবং এটা যদি ১০, ১৫ বা ২০টা নিউজপেপার ও টিভি স্টেশন প্রচার করে, আমি তখন কী করতে পারি? আমি একটা কেস করতে পারি। কিন্তু কেস করলে তো কোনও ফলাফল নাই। ডিফেমেশন (মানহানি) মামলা নাই। আপনার নামে যে কুৎসা ছড়ানো হয় অনলাইনে, এটার কোনও প্রতিকার নাই। মিথ্যা কুৎসার কোনও প্রতিকার নাই। তো এই ধরনের সাংবাদিকতার যে ভিকটিম, সেই লোকগুলোর প্রোটেকশন আপনি কীভাবে দেবেন? এই বিষয়ে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পুরোপুরি সাইলেন্ট। মিডিয়া আইন তো শুধুমাত্র মিডিয়াকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, দ্যাট ইজ গুড। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম অনলাইনের যুগে আপনি একটা নিউজ করলে সেটা ২০ বছর থাকে। অনলাইনের শেলফ লাইফ ইটার্নাল। প্রফেসর ইউনূসকে নিয়ে হাজার হাজার মিথ্যা নিউজ হয়েছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের কারও না কারও নামে হাজারটা মিথ্যা নিউজ হচ্ছে। তাকে আমি কেমনে প্রোটেকশন দেব? আপনি আমাকে বলে ফেললেন আমি ২০০ কোটি, ১২০০ কোটি টাকা বানাচ্ছি। আমার প্রোটেকশনটা কী?

আলোকচিত্র: শফিকুল আলমের সৌজন্যে

শফিকুল আলম
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার তৎকালীন প্রেস সচিব ও দৈনিক পত্রিকা ওয়াদার সম্পাদক

প্রত্যেকটা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে যেখানে ফ্রিডম অফ প্রেস আছে, সেখানে ব্যাড প্রেস থেকে প্রোটেকশনের জন্য যথেষ্ট মেজারস আছে। হ্যাঁ, আপনার নামে বাজে কথা বললে আপনি একটা কেস করতে পারবেন। আপনি ক্রিমিনাল কেসও করতে পারবেন, সিভিল মামলাও করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় একটা পত্রিকাকে এক মিলিয়ন ডলার, পাঁচ মিলিয়ন ডলার, এমনকি ১০ মিলিয়ন ডলার ফাইন করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে এ ধরনের কোনও আইনগত প্রয়োগ নেই। সংস্কার কমিশনের প্রতিবদেনে এই বিষয়টি নেই। তাদের মনোযোগ সাংবাদিক সুরক্ষা। সাংবাদিক সুরক্ষা কী বাংলাদেশে হচ্ছে না? বাংলাদেশে জার্নালিজমের কারণে কেউ প্রসিকিউটেড হয় না। আপনি জার্নালিজম করলেন, সেই কারণে কী আপনাকে প্রসিকিউট করে? জানে যে জার্নালিজমের কারণে আপনার বিরুদ্ধে করা কেস বেশি দূরে এগোবে না। তখন কী করে? তখন তারা অন্যান্য রিলেটেড কেস খোঁজে। আপনি কোনও কনস্পিরেসিতে যুক্ত? আপনি কী এমন কোনও অপরাধে যুক্ত যেটা দিয়ে পেনাল কোডের অন্য কোনও ধারায় আপনাকে *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

‘বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎকে কিছুটা এনজিওধর্মী চোখে দেখা হয়েছে’

১৭-এর পৃষ্ঠার পর আগে পেতে পারে গণমাধ্যমের মাধ্যমে। তখন সরকার পদক্ষেপ নিতে পারে। সেই অর্থে গণমাধ্যম বন্ধুর ভূমিকাই পালন করে।

কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সব সময় স্বাধীন গণমাধ্যমকে শত্রু হিসেবেই দেখেছে। রাজনৈতিক সরকারের কথা না-ই বা বললাম। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও ভিন্নমতাবলম্বীদের বাড়ি থেকে ডিবি অফিস, ডিবি অফিস থেকে আদালত, আদালত থেকে রিমান্ড, এইভাবে একটি জীবনচক্র তৈরি হয়েছে। অতীতে রাজনৈতিক সরকারের আমলে যা আমরা দেখেছি, ভবিষ্যতেও তা ঘটবে বলেই স্বাভাবিক অনুমান। অস্বাভাবিক অনুমান হলো, হয়তো কিছু সময়ের জন্য কিছু সংস্কার হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ আছে, যেমন লাইসেন্সের বিষয়টি। আমি বলব, বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে সুস্থ ও পেশাদার প্রতিযোগিতা না হওয়ার শুরুটা হলো লাইসেন্স ব্যবস্থার জায়গা থেকে। অসংখ্য তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা পড়েছে, গণমাধ্যমে নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে সক্ষম, কিন্তু তারা কাজ করতে পারছে না লাইসেন্স সমস্যার কারণে। কারণ লাইসেন্স দেয় প্রশাসন, ডিসি অফিস, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদি। যাদের রাজনৈতিক প্রভাব নেই, তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এই লাইসেন্স ও নিবন্ধনের জায়গাটা আরও সংস্কার করা দরকার, আরও সহজ করা দরকার, একেবারে সরল করা দরকার। এখানে এখনো একটি কলোনিয়াল ব্যবস্থা চালু আছে। এই জায়গাটাই সংস্কারের প্রয়োজন।

এরপর আছে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের মতো আইন, যেগুলো সাংবাদিকদের কাজের বড় বাধা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যার রিপোর্ট পছন্দ হয়নি, তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করা, যেকোনো সময় তুলে নেওয়া, এগুলো সংস্কার হওয়া উচিত। এই প্রতিবেদনে আরও অনেক সংস্কার প্রস্তাব আছে। কিছু জায়গায় মত-ভিন্নতাও আছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নির্ভর করবে আর্থিক স্বাবলম্বিতার ওপর। আমি মনে করি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নির্ভর করবে আইনি সংস্কারের ওপর। প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করতে হবে। গণমাধ্যমের ভালো মন্দ বিচার করার দায়িত্ব প্রশাসনের নয়। এই দায়িত্ব জনগণের, পাঠকের, দর্শকের। দর্শকই বলবে কে ঠিক লিখছে, কে ভুল বলছে। এই অধিকার কোনো আমলার হতে পারে না, কোনো গোয়েন্দা কর্মকর্তারও হতে পারে না। রাজনৈতিক সরকার এলে এই জায়গাটাই সংস্কার হওয়া দরকার।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: এই প্রতিবেদনে নিউ মিডিয়া প্রসঙ্গে প্রায় তেমন কোনো দিক নির্দেশনা দেয় নাই, এটা কেনো ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন?

আলতাফ পারভেজ: এই রিপোর্টটাকে যদি আমি সামারি করি, তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, এখানে বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎকে কিছুটা এনজিওধর্মী চোখে দেখা হয়েছে। এটাকে আমি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখি। সমাধানগুলোও এক ধরনের এনজিওধর্মী সমাধান হিসেবে এসেছে। এনজিওধর্মী বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি, তা হলো যে একটি স্বাধীন কমিশন করলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দেখুন, আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। একসময় বলা হতো তথ্য কমিশন হলেই বিরাট পরিবর্তন হয়ে যাবে। তথ্য কমিশন হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে তেমন কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। আবার একসময় বলা হতো, সত্তরের দশকে প্রশাসনে নারীদের আসা উচিত। প্রশাসনে নারীরা এলে অনেক নারীবান্ধব পরিবর্তন হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ভিসি হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নারীবান্ধব হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, নারী ভিসির অধীনেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর অন্যায় হয়েছে। তার মানে পুরুষ বা নারী কে বসছে, সেটা দিয়ে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

সংস্কারটা হতে হবে কাঠামোগত। কারণ, সমস্যাটা কাঠামোগত। আমাদের মিডিয়া জগতে বড় একটি সমস্যা হলো ঢাকা-কেন্দ্রিকতা। আরেকটি বড় সমস্যা হলো শ্রেণীগত। মিডিয়া মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয়। গত দুই তিন মাসের কথাই যদি বলি, পার্লামেন্ট এক কক্ষ হবে না দুই কক্ষ হবে, এই নিয়ে প্রায় প্রতিদিন ত্রিশটি টিভি চ্যানেল আলোচনা করেছে। আমরা সবাই দেখেছি। ঠিক একই সময়ে উত্তরবঙ্গে হাজার হাজার আলুচাষি ‘অর্থনৈতিক গণহত্যা’র শিকার হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন করতে চব্বিশ বা পঁচিশ টাকা খরচ হয়েছে, অথচ তারা বাধ্য হয়েছে এগারো বারো টাকায় আলু বিক্রি করতে। লোকসানের পরিমাণ বিশাল। এই লোকসান কাটিয়ে উঠতে তাদের আগামী দশ বছর লেগে যাবে। কারণ লোকসান কাটাতে গিয়ে তারা এনজিও থেকে ঋণ নেবে, সেই ঋণের চক্রে ঢুকে পড়বে। এই দুই তিন মাসে আমি কোথাও কোনো কাগজের প্রথম পাতায় আলুচাষিদের এই সমস্যার কথা দেখিনি। এটাকে কোনো বড় ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয়নি, সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়নি। অথচ সরকার চাইলে পঞ্চাশ লাখ কেজি আলু কিনেই একটা সমাধান দিতে পারত। কিন্তু এই বিষয়টি না এডিটোরিয়ালে এসেছে, না প্রথম পাতায় এসেছে।

অন্যদিকে ঢাকার ছোটখাটো সমস্যাগুলো অনেক বড় কাভারেজ পেয়েছে। ঢাকায় একটি ভবনে আগুন লেগেছে, আমি এটাকে খাটো করছি না। কিন্তু সেই খবর তিন দিন ধরে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে, সব টিভি চ্যানেল প্রাইম টাইমে দেখিয়েছে। এই শহর-গ্রাম বৈষম্য আমাদের মিডিয়াতে স্পষ্ট। এখন ঘটনা হলো, এই বৈষম্য কোনো সরকার রিফর্ম করে দিতে পারবে না। এখানে নিউ মিডিয়ার কাজ করার বড় জায়গা আছে। কিন্তু এখানেও পুঁজিতন্ত্রের প্রভাব কাজ করছে। মিডিয়া হাউজগুলো হিসাব করে দেখে, গ্রামের মানুষ ইউটিউব বা ফেসবুক কম দেখবে, শহরের মানুষ দেখবে। ফলে শহরের স্বার্থটাই বেশি প্রাধান্য পায়। যারা এসব মিডিয়ায় কাজ করে, তারাও মূলত শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত, শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা। তাদের মনোজগৎও শহুরে স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। এই সমস্যাগুলো ফান্ডামেন্টাল (মৌলিক) সমস্যা। আমাদের ৬৪টি জেলা, কিন্তু মিডিয়াগুলো প্রধানত চার-পাঁচটি জেলার স্বার্থ দেখে। ভৌগোলিকভাবে দেখলে এটা পরিষ্কার।

শ্রেণীর দিক থেকে দেখলে আমি বলব, আমাদের মিডিয়া মূলত উপরের বিশ শতাংশ মানুষের স্বার্থ দেখছে। একেবারে শীর্ষ দশ শতাংশ এবং তার নিচে মধ্যবিত্তের ওপরের দশ শতাংশ। নিচের ষাট, সত্তর, আশি শতাংশ মানুষের স্বার্থ মিডিয়া খুব একটা দেখছে না। এই দুটি দিক, একটি শ্রেণীগত, আরেকটি ভৌগোলিক, এই দুটোই আমাদের মিডিয়ার বড় সংকট। এই সংকট থেকে বের হওয়ার কোনো পরিষ্কার পথ আমি এই সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে পাইনি। এটা সহজও না। আমি যেটা দেখি, এর একটি সম্ভাব্য সমাধান হলো লাইসেন্সের জায়গাটা উন্মুক্ত করা। জেলা উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষিত তরুণরা যদি নিউ মিডিয়ায় ঢুকতে পারে, তারা তাদের শ্রেণীর স্বার্থের কথাগুলো তুলে ধরতে পারবে।

আরেকটি বিষয় আরও বড়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া মিডিয়াতেও প্রকৃত কোনো পরিবর্তন আসবে না। মূল সমস্যাটা ঘুরে ফিরে বাংলাদেশের রাজনীতিতেই এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের রাজনীতি আটকে আছে একটি ঔপনিবেশিক দুষ্টচক্রে। এই যে বারবার গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে, কেন হচ্ছে। আমরা তো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছি। এখানে পাঁচশ বছর কোনো গণঅভ্যুত্থান হওয়ার কথা ছিল না। অথচ নব্বই সালে হলো, আবার ২০২৪ সালে হলো। বারবার হচ্ছে কেন? কারণ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার আসে কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের চাওয়াগুলো পূরণ করতে পারে না। এই চাওয়াগুলো কী। আমরা রাজনীতিকে পরিবারতন্ত্রের ভিত্তিতে সাজিয়েছি। একজন রাজনীতিবিদ, একজন মন্ত্রী, তার বয়স হলে তার পুত্র বা কন্যা এমপি হবে। এই পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকে আমরা স্বাভাবিক করে তুলেছি। জনগণও দুই তিন চারটি পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে এক ধরনের নীরব সম্মতি দিয়েছে। এই সম্মতি আদায় করা হয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমে। এই পারিবারিক, করপোরেট প্রভাবিত শহুরে রাজনীতি গ্রামের স্বার্থ, প্রান্তিক স্বার্থ দেখছে না। এমনকি শহরের সাধারণ মানুষের স্বার্থও দেখছে না।

আজ বাংলাদেশের প্রধান ইস্যু হওয়া উচিত ছিল পরিবহন ব্যবস্থার সংকট, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষি উপকরণের ন্যায্য মূল্যের সংকট। কিন্তু রাজনীতিবিদরা প্রধান ইস্যু বানিয়েছে মেয়েরা ওড়না পরবে কি না। গত কয়েক মাস ধরে এটিই ছিল রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। আলুচাষির সমস্যা রাজনীতির এজেন্ডা হয়নি, আগামীতেও খুব একটা হবে না। আলোচনায় থাকে একাত্তর, সাতচল্লিশ, চুয়ান্ন, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। কিন্তু প্রতিদিন মানুষ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, রান্নাঘরের সমস্যা, রুটি রুজির সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো বাস্তব আলোচনা নেই। এটা নির্ভর করছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের ওপর, আর সেই সংস্কার হচ্ছে না। নির্বাচন আসছে, সবাই নির্বাচনের অপেক্ষায়। কিন্তু এই নির্বাচনে মধ্যবিত্তও অংশ নিতে পারবে না। মনোনয়নপত্রের খরচ, জমা, ভোটার তালিকা কেনা, প্রথম দিনেই এক লাখ টাকার মতো খরচ। বাংলাদেশে তাহলে কোন শ্রেণী নির্বাচন করতে পারবে? পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি স্পষ্ট শ্রেণীগত চরিত্র তৈরি হয়েছে। এটা ধীরে ধীরে ধনাঢ্য পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। নির্বাচনী প্রচারণার খরচ যোগ করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার।

সারসংক্ষেপ করলে বলা যায়, বাংলাদেশের পাঁচশটি পরিবার যারা একই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, তারাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পরিবারগুলোর ঔপনিবেশিক আইন-কানুন সংস্কারে কোনো আগ্রহ নেই। কারণ এই আইনগুলো তাদের জন্য আরামদায়ক, সুবিধাজনক, তাদের ব্যবসার জন্য উপযোগী। এই যে আইন এবং পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির চক্র, এই চক্রের সমাধান না হলে গণমাধ্যমের কোনো সমাধান নেই, কোনো সুযোগ নেই।

আলতাফ পারভেজ একজন লেখক ও গবেষক। মীর হুযাইফা আল মামদূহ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

‘মিডিয়া সেক্টরেও সত্য, কাউকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হতে দেয়া যাবে না’

১৫-এর পৃষ্ঠার পর ব্যবসায়িক স্বার্থ কোথাও কোথাও ছিল সেই বিবেচনায় ইত্যাদি, নানা ধরনের বিবেচনায় টেলিভিশনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তো সেই কারণে টেলিভিশনের লাইসেন্স কীভাবে দেওয়া হলো, কারা পেলেন, তাদের আবেদনে কী লেখা ছিল, এগুলো সমস্ত নথিপত্র আমরা, সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে বের করে দেখলাম। সেই নথি পত্র দেখে আমরা অনেকটাই বিস্মিত হয়েছি। তারা অঙ্গীকারনামা দিয়ে লাইসেন্স নিয়েছেন এবং সেই অঙ্গীকারনামায় এমন কথাও আছে যে, তারা তখনকার সরকার যথা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন বা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রচারের জন্যে যা করা দরকার সেটা তারা করবেন। এই অঙ্গীকার করে টেলিভিশনের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন এবং টেলিভিশনের লাইসেন্স পেয়েছেন।

আবার অনেকে যারা আওয়ামী লীগ আমলের আগে লাইসেন্স পেয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হুবহু পুনঃপ্রচার করার অঙ্গীকার করেছেন। তাদের অঙ্গীকার ছিল যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন শুধুমাত্র দেশের মধ্যে প্রচার করছে, আমরা এটা আন্তর্জাতিক পরিসরেও প্রচার করব। সুতরাং আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক।

এই ধরনের অঙ্গীকার দিয়ে এসে যারা লাইসেন্স নিয়েছেন, তারা তো নিশ্চয়ই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন না যে সরকার তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বরং সরকার তাদের কাছে যা চাইবে যে ধরনের প্রচার বা যে ধরনের তথ্য প্রকাশের জন্য বলবে, সেটাই তো তারা করবেন। সে কারণেই তাদের কাছ থেকে একটা বক্তব্য-ব্যাখ্যা আমরা জানতে আগ্রহী ছিলাম যে, আপনারা কেন এইভাবে অনুমোদন নিয়েছেন এবং এইখানে ব্যবসায়িক সম্ভাবনাটা কী ছিল? আপনারা যদি সরকারের বক্তব্যই প্রচার করবেন যেটা বিটিভি প্রচার করছে তাহলে আপনাদের টেলিভিশন মানুষ কেন দেখবে? এবং সেখানে আপনারা কেন বিজ্ঞাপন পাবেন বা সেখানে কীভাবে আপনাদের আয় হবে? কী আশায় আপনারা সেখানে বিনিয়োগ করলেন? এই সমস্ত বিষয় আমরা জানার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তখন আমাদের বলা হলো, বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনের যারা সমন্বয়ক ছিলেন তাদের কেউ কেউ, এবং সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে একটা অংশ আপত্তি তুললেন যে – স্বৈরাচারের দোসরদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। কমিশন কেন তাদের সাথে বৈঠকে বসবে? বরং তাদেরকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, সেইটা কমিশনের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি।

কিন্তু তারা ভুলে গেছেন যে ন্যাচারাল জাস্টিস বলে যদি কোনও বিষয় থাকে, তাহলে সেই ন্যায়বিচারের জন্য যে অভিযুক্ত তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। তা না হলে সেটা ন্যায়বিচার হয় না। আপনি একটা পক্ষকে না শুনে তার বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কিন্তু তারা সেটা বিবেচনায় নেননি। যেদিন বৈঠক ডেকেছি আমরা, তার আগের দিন এই প্রতিক্রিয়াটা তীব্র রূপ গ্রহণ করে। তখন আমরা বাধ্য হয়ে স্থগিত করি।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: সরকারের দিক থেকে বৈঠক স্থগিত করার জন্য কোনও চাপ ছিল?

কামাল আহমেদ: সরকারের দিক থেকে কোনও চাপ ছিল না। সরকারের দিক থেকে শুধু বলা হয়েছিল যে এই প্রতিক্রিয়াটা আপনারা বিবেচনা করে দেখেন। আপনারা সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেন। তারা বলে নাই যে বৈঠক বসতে পারবেন না। তারা বলেছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাচাই করে দেখেন। তখন আমরা দেখলাম যে, আমাদের যে অফিস দেওয়া হয়েছিল তথ্য ভবন, সার্কিট হাউস রোডে। সেখানে যদি একটা ঘেরাও কিংবা একটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হয় কিংবা যারা আসবেন, তাদের নিরাপত্তা দেওয়া না যায়, তাহলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। এবং তাতে আমাদের মূল যে কাজ সেটা বাধাগ্রস্ত হবে। আমরা তো তাদের সম্পর্কে সব তথ্য পেয়েছি। সেটার ভিত্তিতেই আমরা কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: রিপোর্টে মিডিয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তনের অংশে সরকারি দল বা প্রভাবশালীদের মালিকানায় মিডিয়া হাউজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণ বা সুপারিশমালার ক্ষেত্রে মিডিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতির এই গভীর প্রভাবটি সেভাবে আলোচিত হয়নি। একজন সাংবাদিক বা একটি হাউজ শেষ পর্যন্ত তার মালিকের অর্থনৈতিক স্বার্থের বাইরে কাজ করতে পারে না – এই বাস্তবতা কী রিপোর্টে কিছুটা কম গুরুত্ব পেয়েছে?

কামাল আহমেদ: আমরা কিন্তু বলেছি যে সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশন, রেডিও বা অনলাইনগুলোর যেভাবে আমরা বিকাশ দেখছি এখানে এগুলো আর গণমাধ্যম নেই। দেখা যাচ্ছে, হয় ব্যক্তিগত স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে, গোষ্ঠীগত স্বার্থে অথবা ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হচ্ছে। তারা সাধারণ মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব না দিয়ে, যার টাকা তার স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছে এবং সেই স্বার্থের প্রচার-প্রসারের কাজে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে। তারা গণমাধ্যমকে একটি ‘সফট পাওয়ার’ হিসেবে, সেই পাওয়ারটাকে (ক্ষমতা) আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক নেতারা, ব্যবসায়ীরা, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। কালো টাকা ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমের ভিতরে ঢুকেছে। তা না হলে একটি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৫ কোটি টাকা লোকসান করছে, কিন্তু তারপরও তার প্রতিষ্ঠান চলছে। তিনি বন্ধ করছেন না। পরের বছরও ২৫ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। খরচ করতে তিনি রাজি আছেন। কেন? নিশ্চয়ই এর কোনও বিনিময় আছে। সেই বিনিময়টা কি? আরও সামাজিক প্রতিপত্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অথবা ব্যবসায়িক প্রসার। আমরা এই ব্যবস্থাটাকে ভেঙে ফেলতে সুপারিশ করেছি। আমরা বলেছি যে, স্বচ্ছতা দরকার। কোত্থেকে বিনিয়োগ আসছে, সেটা ঘোষণা করতে হবে। আমরা বলেছি, আপনার প্রতিষ্ঠান চালাতে, আপনি কোত্থেকে কী আয় করছেন, সেটা প্রকাশ করতে হবে। আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা, কোথায় কত খরচ করছেন, সেটাও প্রকাশ পাবে। আপনি শুধু বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ দেখবেন, পাঠকের স্বার্থ দেখবেন না। এটা তো হতে পারে না। সুতরাং আমরা সেই কারণে বলেছি যে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

গণমাধ্যম যারা পরিচালনা করেন মালিকরা এবং প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের জবাবদিহিতার কথা বলেছি, যে তাদেরও একটা জবাবদিহিতা থাকা দরকার। সেই কারণে স্বচ্ছতার প্রশ্ন এনেছি। আমরা বলেছি যে, এক্ষেত্রে সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে, প্রত্যেকটা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করা হোক। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করা হলে তারা প্রতিবছর শেয়ার হোল্ডারদের কাছে হিসাব দিতে বাধ্য হবে যে কোত্থেকে কত আয় হয়েছে এবং কোত্থেকে কত তারা খরচ করেছেন। তাদের সম্পাদকীয় পলিসি কী ছিল সেটাও তারা সেখানে বিবৃত করতে বাধ্য হবেন। এই স্বচ্ছতাটা আমরা চেয়েছি। সেটা রাতারাতি সম্ভব না, কীভাবে সম্ভব সেটাও আমরা বলেছি। যে প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক পদ্ধতিতে চলছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য অফার করলে নিশ্চিতভাবে মানুষ তাতে সাড়া দেবেন, এবং জবাবদিহিতা আসবে। আর যেগুলো এখনই লাভজনক নয় অথবা শেয়ার বাজারে যেতে পারছে না, তারাও কিছুটা স্বচ্ছতা আনতে পারবে, যদি প্রতিবছর তারা নিজেদের আয়-ব্যয়ের হিসাবটা প্রকাশ করে। তাদের কর্মীদেরকে শেয়ার হোল্ডার বানায়। আমরা বলেছি কিন্তু যে এমপ্লয়িদেরকে (সংবাদকর্মীদের) শেয়ার হোল্ডার করা হোক।

নানাভাবেই আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং এই শিল্প থেকে কালো টাকাকে ঝেটিয়ে বের করে দেওয়ার, সুপারিশ করেছি। এখন সেইটা বাস্তবায়ন যদি হতো, তাহলে আপনারা তার ফলাফল দেখতে পেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা এখনও হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কিনা আমি জানি না, যদি হয় তাহলে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের মিডিয়া কাঠামো গত এক দশকে মৌলিকভাবে বদলে গেছে। সেখানে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার আলাদা কোনও সত্তা নেই বরং তা সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে একীভূত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের ফলে কনটেন্টের প্রকৃতি বদলে গিয়ে প্রতিটি নিউজ, ভিডিও বা পোস্ট আলাদা আলাদা পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও দ্রুত মিডিয়া প্রোডাকশন ও ডিস্ট্রিবিউশনে প্রভাব ফেলছে। কিন্তু মিডিয়া রিফর্ম কমিশনের রিপোর্টে এই কাঠামোগত রূপান্তর, কনটেন্ট ইকোনমির পরিবর্তন এবং এআই-এর উদীয়মান *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন

প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার হিসাব

মীর হুযাইফা আল মামদূহ

১৪ জুলাই ২০২৪ গণভবনের একটি সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জুলাই আন্দোলনের তীব্রতা তৈরি হয়। চীন সফর শেষে ফিরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে একটা দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেন। আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্র পরিচালনা ও সংবিধান সংশ্লিষ্ট মৌলিক বোঝাপড়া নিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন এবং বক্তব্যের এক পর্যায়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মৌলিক দাবিকে মুক্তিযুদ্ধ বনাম রাজাকার প্রসঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করেন। আন্দোলনকারীদের রাজাকার আখ্যা দিয়ে বলেন, 'কোটা মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা পাবে না, তো রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?' সঙ্গত কারণেই হাসিনার এই মন্তব্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর 'রাজাকার' লেবেল ছুঁড়ে দেওয়ার মতোই শোনায়। সেই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল বের করেন, প্রতিরোধের স্লোগান হয়ে ওঠে, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!'

শেখ হাসিনা একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের একটি উসকানিমূলক প্রশ্নের উত্তরে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে হাজির করেন। উসকানিমূলক বলছি কারণ প্রশ্নকারি সাংবাদিক আসলে প্রশ্ন করেননি বরং কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা যে মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করছে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আজ্ঞাবাহী মিডিয়ার যে বিকাশ আওয়ামী আমলে ঘটেছে তার একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত ছিল এই সংবাদ সম্মেলন।

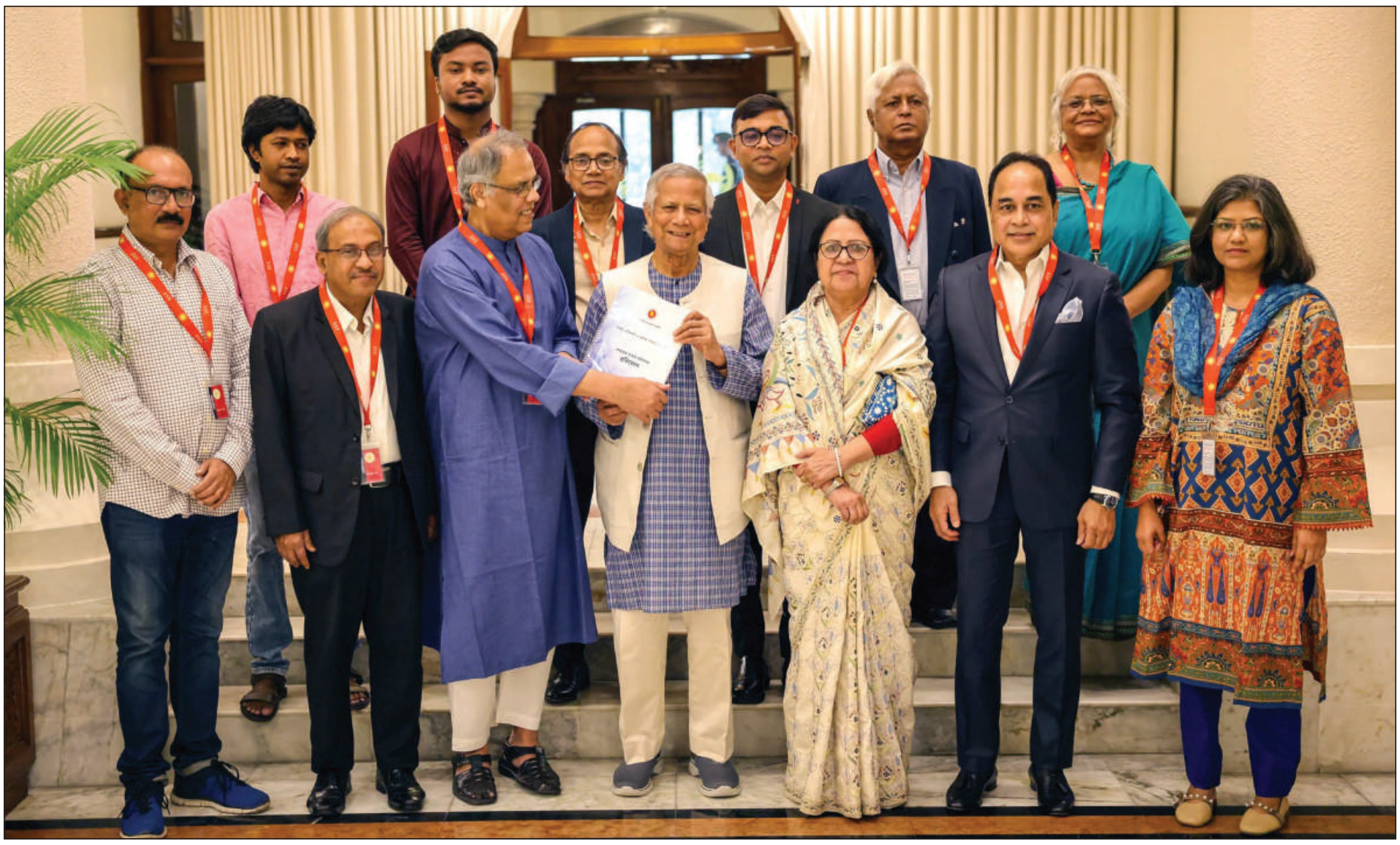

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপষ্টো ড. মুহাম্ম ইউনূসকে প্রতিবেদন জমা দেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'যমুনা,' ঢাকা। ২২ মার্চ ২০২৫। আলোকচিত্র: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ পনেরো বছরে দেশে মূলত গণমাধ্যমের প্রসার ঘটেছে, আর এই পুরো সময়ে মিডিয়ার মালিকানার জন্য একইসাথে যেমন আওয়ামী লীগের আজ্ঞাবহ হতে হতো, মিডিয়া প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের এজেন্ডার বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও করে নিতে হতো। *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি*-র আবেদনে সালমান এফ রহমান ও নাজমুল হাসান পাপন আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও *গ্লোবাল টিভি*-র জন্য আবেদন করেন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ। আবেদনপত্রে বলা হয়, 'চ্যানেলটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রচারে যেতে চায়।' আর এসব অঙ্গীকারে নিবন্ধন পাওয়া মিডিয়াগুলো সেই অঙ্গীকারই বাস্তবায়ন করে গিয়েছে পুরো সময়, বিশেষ করে আন্দোলনকালীন সময়ে দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলো আন্দোলনে আহত নিহতের উল্লেখ করেনি, বরং অনেকেই আন্দোলনকারীদের দুষ্কৃতিকারী বলেও অভিহিত করেছে।

আর দ্বিতীয় কারণ, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাংবাদিকেরা সরকারের নানা সুবিধা পেয়েছে, প্লট, ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে বিদেশ ভ্রমণ সহ নানাকিছু। ফলে সাংবাদিকতার বদলে তারা সরকার পন্থাকেই বেছে নিয়েছে। ২৪ জুলাই ২০২৪ এ সাংবাদিক নেতাদের সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি মতবিনিময় সভা করেন। *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস* এর সংবাদ মতে, সেখানে *বাংলাদেশ প্রতিদিন* পত্রিকার সাবেক সম্পাদক নঈম নিজাম আন্দোলনকারীদের 'নাশকতাকারী' উল্লেখ করে তাদের খুঁজে বের করে আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তির আওতায় আনার কথা বলেন, অন্যান্য সাংবাদিক নেতারাও শেখ হাসিনার সাথে থাকার অঙ্গীকার করেন। বলেন, 'শেখ হাসিনার জন্য যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত তারা।'

তাছাড়া বিবিধ নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন এবং সেই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার জনস্বার্থে সাংবাদিকতার পথ প্রায় বন্ধ করে দেয়। সেন্টার ফর গর্ভনেন্স স্টাডিজের (সিজিএস) গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিজটাল নিরাপত্তা আইনে ৪৫১ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ২৫৫ জন প্রতিবেদন লেখার জন্য অভিযুক্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের আগস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর সকল পক্ষই দেশীয় গণমাধ্যমের সংস্কারের জরুরত অনুভব করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাই গণমাধ্যম সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ১১ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ কামাল আহমেদ। সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই কমিশন প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করে, যেখানে ৪৫ হাজার পাঠকের মতামত, সরকারি নথি ও দেশের নানা স্থানে আয়োজিত মতবিনিময় সভার তথ্য যুক্ত করা হয়। কমিশন গণমাধ্যমের মালিকানা, টেকসই বিজনেস মডেল, সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ, আইনি বাধা-বিপত্তিকে বিবেচনায় নিয়ে গণমাধ্যমের সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে।

রিপোর্টে বিস্তৃত সুপারিশমালা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম মালিকানায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, বিজ্ঞাপন বাজারে স্বচ্ছতা আনা, রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন, শ্রম অধিকার রক্ষা, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা, গণমাধ্যম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন এবং জনগণের মধ্যে গণমাধ্যম স্বাক্ষরতা বাড়ানো। সামগ্রিকভাবে কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ দিয়েছে যার লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ গণমাধ্যম গড়ে তোলা।

তবে অন্তর্বতীকালীন সরকার কমিশন গঠনে যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, প্রতিবেদন গ্রহণের পর সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। রাজনৈতিক দলের সাথে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় গণমাধ্যম কমিশনসহ চারটি কমিশনের প্রতিবেদন এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়। জাতীয় নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে তাড়াহুড়া করে জাতীয় মিডিয়া কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তাব করে, এই প্রসঙ্গে সম্পাদক পরিষদ বিবৃতিতে বলেন, 'খসড়া অধ্যাদেশগুলোর কাঠামো ও বিধানগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা স্পষ্ট। পাশাপাশি সীমিত সময়ের মধ্যে মতামত আহ্বান করে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী।'

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গণমাধ্যম সংস্কারের প্রশ্নটি প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ইশতেহারে গণমাধ্যম নিয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও, সেগুলো মূলত নীতিগত অবস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল; কাঠামোগত সংস্কারের কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা সেখানে অনুপস্থিত। অর্থাৎ, যে সময়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং মালিকানা কাঠামো নিয়ে একটি বিস্তৃত জাতীয় বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল, সেই সময়েই বিষয়টি কার্যত প্রান্তিক অবস্থানে থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে গণভোটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও গণমাধ্যম সংস্কারের প্রশ্নটি সামনে আসেনি। গণমাধ্যম সংস্কার প্রশ্নটি নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে নয়, বরং রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের বাইরে থেকে যায়। একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, একদিকে একটি বিস্তৃত পরামর্শভিত্তিক রিপোর্ট, যা গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার রূপরেখা দেয়; অন্যদিকে সেই রিপোর্ট বাস্তবায়নের আগেই নতুন কাঠামো তৈরির উদ্যোগ, এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোতে এই প্রশ্নের ধারাবাহিক অনুপস্থিতি। এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ জারি রাখা আরও জরুরি।

কমিশনের রিপোর্ট প্রশংসার দাবি রাখে

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে গঠিত মিডিয়া রিফর্ম কমিশন একটি প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ, মূলত গণমাধ্যম খাতে বহুদিন ধরে জমে থাকা কাঠামোগত সংকটকে নীতিগত আলোচনার কেন্দ্রে আনার একটি সুযোগ। কমিশনের গঠন ও কাজের পরিধি এই মুহূর্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি প্রথমবারের মতো মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, আইনি বাধা, শ্রম কাঠামো এবং রাষ্ট্র-গণমাধ্যম সম্পর্ককে সমন্বিতভাবে পর্যালোচনা করেছে। তাই এর বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের গণমাধ্যম নীতিনির্ধারণের জন্য একটি কার্যকর রেফারেন্স ফ্রেম তৈরি করে, যা পরবর্তী অংশে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দিক হলো কমিশনের গঠন। এতে সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, মালিকপক্ষ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি, সব পক্ষকেই অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে রিপোর্ট তৈরির সময়ে একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে নানা অংশীজনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকদের কণ্ঠ শোনার জন্য ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোতে এবং পার্বত্য জেলাতেও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছিল। এতে রাজধানীকেন্দ্রিক ধারা ভেঙে গণমাধ্যমের সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে।

রিপোর্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর বিষয়গত ব্যাপ্তি। প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠার এই দলিলে কেবল তথ্যের পরিমাণ নয় বরং গণমাধ্যম কাঠামোর বিভিন্ন স্তর, স্বাধীন সাংবাদিকতার বাধা, রাষ্ট্র ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও ব্যবসায়িক মডেল, সাংবাদিকদের আর্থিক ও পেশাগত নিরাপত্তা, এবং জেন্ডার, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন, সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ধরনের বহুমাত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার উদাহরণ আমাদের দেশে খুব কম পাওয়া যায়।

কমিশনের বিশেষ কৃতিত্ব হলো, ইতিহাসকে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। স্বাধীনতার পর থেকে কোন সরকারের সময়ে সাংবাদিকরা কেমন নিপীড়িত হয়েছেন, গণমাধ্যমের মালিকানা কীভাবে দলীয় ঘনিষ্ঠদের হাতে গেছে, এমনকি এক সরকার থেকে অন্য সরকারে নেতৃত্ব বদলের সময়ে সাংবাদিকদের অবস্থান কীভাবে পাল্টেছে, এসব খোলাখুলি বলা হয়েছে। এই আত্মসমালোচনার জায়গাটা নতুন, এবং রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করে এসব বলার সাহস প্রশংসনীয়।

আবার, মালিকানা নিয়ে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন পোর্টালের মালিকানার ইতিহাস, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ও হাতবদলের প্রক্রিয়া, এসব তথ্যভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভুঁইফোড় সংবাদপত্র, এবং বিজ্ঞাপন বন্টনে অস্বচ্ছতা নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিয়ে রিপোর্টে যে নিরপেক্ষ সমালোচনা এসেছে, সেটিও প্রশংসার দাবিদার। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়, তাতে স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবর্তে সরকারনির্ভর প্রচারযন্ত্রে রূপ নেয় বিটিভি। দলীয় প্রচারের নমুনা তুলে ধরতে গিয়ে একজন প্রযোজকের মন্তব্য উল্লিখিত হয়েছে রিপোর্টে। প্রযোজক বলেছেন, অনুষ্ঠানে 'সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম' এর বদলে 'আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন' বলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাও মূলত সরকারি প্রচারযন্ত্র, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রোপাগান্ডা যন্ত্রের রূপ নেয় বিগত সময়ে। ফলে, সরকার আজ্ঞাবহরা এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেতে তদবির করে, এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংবাদিকের বদলে অসাংবাদিকের আধিক্য বেশি হয়ে গিয়েছে।

১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন: প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার হিসাব

১৩-এর পৃষ্ঠার পর

একইসাথে প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকের বদলে আমলানির্ভর হয়ে গিয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশগুলো তাদের পূর্ববর্তী বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নীতিগত কাঠামো তৈরি করেছে। মালিকানা কাঠামো, অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা এবং গণমাধ্যম পরিচালনার প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতাগুলো যেভাবে রিপোর্টে চিহ্নিত হয়েছে, সুপারিশগুলো সেই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকর রোডম্যাপ তৈরির চেষ্টা করেছে। ফলে রিপোর্টটি কেবল বর্তমান সংকটের বর্ণনা নয়; এটি ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারণের জন্য একটি প্রস্তাবিত দিকনির্দেশনাও উপস্থাপন করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এই রিপোর্ট বাংলাদেশের গণমাধ্যম সংস্কারের আলোচনায় একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে। হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর এতে নেই, তবুও সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের বর্তমান সংকটকে বোঝার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নীতিগত কাঠামো তৈরি করার জন্য এটি এক অমূল্য উদ্যোগ।

রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গতা পেতো, যদি

গণমাধ্যম কমিশনের রিপোর্টে ঘাটতির বেশ কয়েকটি জায়গা আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কমিশন নরমেটিভ বোঝাপড়া থেকে মিডিয়াকে দেখেছেন, এর ফলে গণমাধ্যমকে কেবল গণমাধ্যম হিসেবেই দেখা হয়েছে, যেন গণমাধ্যমে বাইরের আর কোন চাপ নেই, যোগসাজশ নেই। গণমাধ্যম সত্য ও নিরপেক্ষ তথ্যের প্রচারযন্ত্র নিছক। অথচ আদতে গণমাধ্যম কখনও তা নয়, বরং গণমাধ্যম পরিচালিতই হয় তার মালিকের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। যেমন, বসুন্ধরা গ্রুপের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম আছে, পত্রিকা, টেলিভিশন থেকে শুরু করে রেডিও- সবই। বসুন্ধরা গ্রুপের মিডিয়ার পেছনে বিশাল বিনিয়োগের কারণ হিসেবে বলা হয় তাদের জমি ব্যবসায়ের সুরক্ষার কথা। কিংবা আমরা যদি মোসারাত জাহান মুনিয়া ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে বিবেচনা করি, বসুন্ধরার প্রতিটি মিডিয়া মালিকের স্বার্থ রক্ষার্থে ভিকটিম মুনিয়ার চরিত্র হনন করেছে।

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মূলত তার ব্যবসা এবং স্বার্থ রক্ষার্থে মিডিয়া আউটলেট প্রতিষ্ঠা করে, সেই প্রতিষ্ঠার পেছনে তার নিজস্ব এজেন্ডা থাকে। ফলে গণমাধ্যমের মালিকানা তার যে এজেন্ডা নির্ধারণ করে দেয়, সাংবাদিক সেই এজেন্ডার বাইরে কিছুই করতে পারেন না। কমিশন গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি কী, কেমন করে তা ক্ষমতাসীনের লক্ষ্য পূরণ করে? তাছাড়া আওয়ামী লীগ সময়ের দীর্ঘ পনেরো বছর যেই গণমাধ্যমগুলো সাংবাদিকতার বদলে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রোপাগান্ডা সাংবাদিকতা করেছে, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তাদের রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও মীমাংসা কেমন করে হবে, সেই বিষয়ে কোনও আলাপই নেই রিপোর্টে। তাছাড়া পরবর্তী সময়ের সাংবাদিকতার জন্য গণমাধ্যমগুলোকে কীভাবে জবাবদিহি করা হবে, সেই বিষয়েও কোনও সমাধান দিতে পারেনি কমিশন।

কমিশন গণমাধ্যম ইন্ডাস্ট্রিকেও ঠিক ইন্ডাস্ট্রি আকারে দেখতে পারেনি। গণমাধ্যম কেবলই এটি সেবামূলক নয়, বরং একটি মুনাফাভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি। মুনাফার সঙ্গে আসে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, আর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ মানেই ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই সংকট বোঝা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি বোঝা অসম্ভব। বরং, রিপোর্টের কিছু ক্ষেত্রে নর্ম্যাটিভ থিউরি অনুযায়ী রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ আকারে দেখার চেষ্টা করেছে, একই সাথে আবার কোথাও দেখা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রির মতো করে। এর ফলে গণমাধ্যমের উপর কখনও চতুর্থ স্তম্ভের দায় চাপিয়েছেন, আর কোথাও ইন্ডাস্ট্রির দায়। তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এই ফাঁক কমিশনকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সমস্যার গোড়াতেই হাত দিতে দেয়নি বলে মনে হয়েছে।

একই সাথে পশ্চিমা নিউ লিবারেল বোঝাপড়া থেকেও গণমাধ্যম পাঠের কারণে পুরো রিপোর্টেই সাংবাদিককে দেখা হয়েছে একক ব্যক্তি হিসেবে, অথচ সাংবাদিক গণমাধ্যমে একক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে না। তার সাংবাদিকতার দায় তার একার নয়, বরং প্রথমত সে যে গণমাধ্যমে কাজ করে সেটির, সাংবাদিকতা পেশার এবং একই সাথে রাষ্ট্র যেই সাংবাদিকতা চাপিয়ে দিয়েছে তার উপর, সব মিলেই।

এই প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ও মালিকানাগত নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বটিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সেন্সরশিপ ছাড়াই বার্তাকক্ষে এক ধরনের নীরব নিয়ন্ত্রণ কাজ করে, যেখানে মালিকপক্ষের স্বার্থ, বিজ্ঞাপনদাতার চাপ এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক, সব মিলিয়ে সাংবাদিকরা আগেই নিজেদের সীমা নির্ধারণ করে নেন। ফলে সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াও একটি শক্তিশালী আত্মনিয়ন্ত্রণের/self-censorship-এর কাঠামো তৈরি হয়, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরও সীমিত করে।

গণমাধ্যমের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ কেবল আনুষ্ঠানিক নয় বরং অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতার নেটওয়ার্কের মধ্যেও বিস্তৃত। রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, বিজ্ঞাপন বাজার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, এই জটিল সম্পর্কের ভেতরেই গণমাধ্যম পরিচালিত হয়। ফলে গণমাধ্যমের সংকটকে শুধুমাত্র নীতিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা হিসেবে দেখা হলে তার গভীর কাঠামোগত বাস্তবতা অধরা থেকে যায়।

সংস্কার কমিশনের একপাক্ষিকতা আছে ঐতিহাসিক বয়ানে

রিপোর্ট ঐতিহাসিকভাবে খানিকটা একপাক্ষিক বয়ান দিয়েছে বলেও মনে হয়েছে। বিগত সরকারের নিপীড়নের কথা এসেছে কিন্তু সামরিক শাসন ও বিএনপি আমলের দমন-পীড়ন তুলনামূলকভাবে প্রায় এড়িয়ে গেছে। অথচ এরশাদ আমল থেকেই গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ ও বন্ধের ইতিহাস তৈরি হয়; আশির দশকে সামরিক শাসনামলে সমালোচনামূলক কন্টেন্ট প্রকাশের কারণে বহু পত্রিকা ও সাময়িকী বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে একের পর এক প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় বিএনপি সরকারের অধীনে (১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৫) গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে দেখা যায়। নব্বইয়ের দশকে সরাসরি সেন্সরশিপের পাশাপাশি পরোক্ষ আর্থিক চাপ, বিশেষ করে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া, সমালোচনাকারী পত্রিকাগুলোকে শাস্তি দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়; দৈনিক জনকণ্ঠ তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০০৬ সালে শ্রম আইন প্রণয়নের মাধ্যমে Newspaper Employees (Conditions of Service) Act, 1974 বাতিল করে সাংবাদিকদের জন্য পৃথক শ্রম-আইনি সুরক্ষা কাঠামোও তুলে দেওয়া হয়, ফলে পেশাগত স্বাধীনতা ও সংগঠিত দরকষাকষির অনেকগুলো অর্জন আবার সাধারণ শ্রম আইনের অধীনে চলে যায়। এই সামগ্রিক ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কেবল সাম্প্রতিক একটি সরকারের ওপর নিপীড়নের বর্ণনা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রিপোর্টের ঐতিহাসিক বয়ান আংশিক থেকে গেছে।

২০০১-২০০৫ সময়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়। সহিংসতা, অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়। টিপু সুলতান, মানিক সাহা ও হুমায়ুন কবির বালুর মতো সাংবাদিকরা হামলার শিকার হন বা নিহত হন। এসব ঘটনায় সরকার সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও ধর্মীয় চরমপন্থীরা জড়িত থাকলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। একই সময়ে সরকার সরাসরি সম্প্রচার মাধ্যমকেও টার্গেট করে। ২০০২ সালে একুশে টেলিভিশনকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা ছিল গণমাধ্যম দমনের চূড়ান্ত উদাহরণ। উভয় সময়ে সাংবাদিকরা প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন, বিক্ষোভ, মানববন্ধন এবং 'ফোরাম টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর মতো সংগঠন গঠন করে পেশাগত স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যান।

নিউ মিডিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে আরেকটি বড় ঘাটতি হলো নিউ মিডিয়ার অনুপস্থিতি। কমিশনের রিপোর্টে কেবল সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও কিছু অনলাইন পোর্টালের কথা এসেছে। অথচ আজকের গণমাধ্যম বাস্তবতা পুরোপুরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর। সংবাদপত্র ভিডিও কন্টেন্ট বানাচ্ছে ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটকের জন্য; টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও আলাদা ইউটিউব কন্টেন্ট তৈরি করছে এবং প্রচারিত অনুষ্ঠান সামাজিক মাধ্যমের উপযোগী করে সম্পাদনা করছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের আয়ের বড় অংশ এখন ইউটিউব থেকে আসে।

গণমাধ্যমের চরিত্রও আমূল বদলে গেছে। আগে একটি সংবাদপত্র মানেই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ কন্টেন্ট, টেলিভিশনের বুলেটিনও ছিল একসাথে উপস্থাপিত সংবাদ। এখন আর তা নেই। ইউটিউব ও সামাজিক মাধ্যমে প্রতিটি ভিডিও বা সংবাদই আলাদা বাজার তৈরি করছে। প্রতিটি খবর আলাদা পণ্য হয়ে উঠছে, আর তার টিকে থাকা বা হারিয়ে যাওয়া নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের ওপর। সামাজিক মাধ্যমে এই উৎকর্ষ কিংবা বহুল প্রসারের ফলে ভুল বা অপতথ্যের ছড়াছড়িও বেড়ে গেছে কারণ সামাজিক মাধ্যম প্রায় প্রত্যেককেই সংবাদ সরবরাহের একটি সুযোগ দেয়, ফলে যে কেউ-ই যে কোনও কিছুকে সংবাদ আকারে চালিয়ে দিতে পারে এবং নানা ক্ষেত্রে এসব ভুল বা অপতথ্য ছড়িয়ে যায়। কমিশনের রিপোর্টে তথ্যের সঠিকতার আলাপ আছে, কিন্তু আবার একইসাথে সামাজিক মাধ্যমের সংবাদ মাধ্যম হয়ে ওঠার নির্দেশ করা হয়নি রিপোর্টে। ফলে গণমাধ্যমের পরিবর্তনশীল মৌলিক চরিত্র আলোচিত হয়নি।

এই বাস্তবতায় ফেইক নিউজ, মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন এখন গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় সংকট হয়ে উঠেছে, যা কেবল কনটেন্টের প্রশ্নে নয়, বরং গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রভাবিত করছে। সামাজিক মাধ্যমে তথ্যের দ্রুত বিস্তার এবং যাচাইহীন প্রচার এই সংকটকে জটিল করেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি, ডিপফেক, এবং অনলাইন হয়রানির নতুন রূপ, যা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুনামের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। একবার কোনও কনটেন্ট অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে তা পুরোপুরি মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব, ফলে ভুক্তভোগীদের পক্ষাবলম্বন করে এই বাস্তবতার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন।

একইসাথে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর সাংবাদিকতা গণমাধ্যমের পেশাগত কাঠামোকেও বদলে দিচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় কনটেন্ট তৈরি, ডেটা-চালিত রিপোর্টিং এবং অ্যালগরিদমভিত্তিক বাছাইয়ের ফলে সংবাদ উৎপাদনের গতি বাড়লেও, এর ফলে সাংবাদিকতার শ্রম, দক্ষতা এবং দায়িত্বের প্রশ্ন নতুনভাবে সামনে আসছে। এই পরিবর্তন সাংবাদিকতার কিছু ক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে পারে, বিশেষ করে প্রাথমিক রিপোর্টিং ও কনটেন্ট প্রডাকশনের ক্ষেত্রে। ফলে গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে আলোচনায় এআই ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি ছিল, যা কমিশনের রিপোর্টে অনুপস্থিত।

লাভ-ক্ষতির পূর্ণ বিশ্লেষণ নেই

রিপোর্টের আরেকটি বড় ঘাটতি হলো লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ না থাকা। একটি মিডিয়ার আয় আসে নানা উৎস থেকে, প্রিন্ট কপি বিক্রি, ই-পেপার সাবস্ক্রিপশন, অনলাইন ও করপোরেট বিজ্ঞাপন, সামাজিক মাধ্যমের ভিডিও কন্টেন্ট। প্রথম আলোর মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই বহুমুখী আয়ের বাস্তবতা বিদ্যমান। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে এই হিসাব নেই। থাকলে বোঝা যেত কোন খাত মিডিয়াকে টিকিয়ে রাখছে, বা কোথায় তাদের টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তার কোন স্বার্থ রক্ষার্থে দীর্ঘদিন লোকসান দিয়েও গণমাধ্যমকে টিকিয়ে রাখছে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলাপ করা হয়নি। বিস্তারিত আলাপ হলে গণমাধ্যমগুলোর পলিটিকাল ইকোনমি বোঝা যেত। অনেক গণমাধ্যমের বিদেশি এনজিওর সাথে যুক্ততা আছে, পার্টনারশিপ আছে, সেই এনজিওদের পলিটিক্স কী, তারা গণমাধ্যমের সাথে এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়, সেটাও আলাপে আসা দরকার। ফলে আমাদের গণমাধ্যম বাস্তবতায় এই আলাপ খুবই জরুরি, এবং এই আলাপের ভেতরেই লুকিয়ে আছে গণমাধ্যমগুলোর মূল রহস্য।

উত্তরণের প্রস্তাবও বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। মালিকানায় সবার অংশীদারত্বের ধারণা আকর্ষণীয় হলেও এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। যৌথ উদ্যোগ টিকে থাকে কন্টেন্টের শক্তির ওপর; কন্টেন্ট দুর্বল হলে কোনও উদ্যোগই টেকে না। নন-প্রফিট গণমাধ্যমের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় অর্থায়নের প্রস্তাবও এসেছে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন আছে। কেউ দীর্ঘদিন কেবল দায়বদ্ধতার খাতিরে অর্থ ঢালবে কেন? এর পেছনে কী রাজনীতি কাজ করবে? বাস্তবে ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো ইতিমধ্যেই নিজেদের স্বার্থে গণমাধ্যমে অর্থ ঢালছে। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে এই রাজনৈতিক অর্থনীতির কোনো আলোচনা নেই।

এই প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিজ্ঞাপন বাজার এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা। সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন, করপোরেট বিজ্ঞাপন এবং বড় ব্যবসায়িক গ্রুপের আর্থিক নির্ভরতা, এই তিনটি উপাদান মিলেই গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে নির্ধারণ করে। ফলে কোনও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়ের কাঠামো বিশ্লেষণ ছাড়া তার সম্পাদকীয় অবস্থান বোঝা প্রায় অসম্ভব। একইসাথে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, বিশেষ করে ইউটিউব ও সামাজিক মাধ্যমভিত্তিক আয়, গণমাধ্যমকে বৈশ্বিক অ্যালগরিদমিক অর্থনীতির ভেতরে নিয়ে গেছে যেখানে কনটেন্টের মূল্য নির্ধারণ করছে দর্শকসংখ্যা, এনগেজমেন্ট এবং প্ল্যাটফর্ম নীতি।

ফলে গণমাধ্যম আর কেবল জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির অংশ নয়; এটি এখন রাষ্ট্র, পুঁজি এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একটি জটিল সমন্বিত কাঠামোর ভেতরে পরিচালিত হচ্ছে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় না আনলে গণমাধ্যমের সংকটকে বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এবং যে কোনও সংস্কার প্রস্তাবই বাস্তবতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদ শ্রমের জন্য জরুরি অনুষঙ্গ

সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত রয়ে গিয়েছে। গণমাধ্যমে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দেন, শ্রম আইনে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে দর কষাকষি করবেন, সাংবাদিকদের সেই কাঠামোর আলাপ রিপোর্টে অনুপস্থিত। সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সঠিকভাবে না থাকার কারণে ইন্ডাস্ট্রি সংবাদকর্মীদের যথেচ্ছ খাটাতে পারছে। স্বল্প ব্যয়ে সাংবাদিক পাওয়া যাওয়াতে দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের মধ্যম পর্যায়ের সাংবাদিকরা চাকরি খোয়াচ্ছেন কারণ, তার বেতন দিয়ে গণমাধ্যমগুলো একাধিক সাংবাদিক রাখতে পারবে। ফলে সাংবাদিকতার মান যেমন পড়ে যাচ্ছে, একইসাথে অনেক সাংবাদিক চাকরি হারাচ্ছেন, অনিশ্চিত জীবনের সম্মুখীন হচ্ছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ২২ আগস্ট ২০২৫, *আজকের পত্রিকা*-র সিনিয়র সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের আত্মাহুতি সাংবাদিকতা পেশার অনিশ্চয়তাকে নতুন করে আলাপে এনেছে। ফলে, সাংবাদিকদের শ্রমের জন্য একটি শক্ত ট্রেড ইউনিয়ন থাকা জরুরি, যারা কেবল সাংবাদিকদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করবেন।

সাংবাদিকতার শ্রম কাঠামো নিয়ে যে সংকটটি আলোচিত হয়, সেটি শুধু ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে অসম্পূর্ণ থাকে। আইনের দিক থেকে গণমাধ্যম ইতিমধ্যেই শ্রম আইনের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কথা; সাংবাদিকদের ইউনিয়ন করার সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার রয়েছে, এবং ওয়েজ বোর্ডসহ ন্যূনতম সুরক্ষা কাঠামোও বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবে এই আইন কার্যকর করার প্রতি কোনও রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ নেই। বহু প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে সাংবাদিকদের 'কর্মী' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে না, কন্ট্রাক্ট বা কনট্রিবিউটর পরিচয়ে রাখে, যাতে শ্রমিক হিসেবে তাদের দাবি-দাওয়া অকার্যকর করা যায়। ফলে আইনের কাঠামো কাগজে থাকলেও নিউজরুমে তা প্রযোজ্য হয় না।

এর সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ জড়িয়ে আছে, অনেক সাংবাদিক নিজেরাও নিজেদের শ্রমিক হিসেবে ভাবতে চান না। পেশাটিকে মর্যাদার সাথে দেখার একটি প্রবণতা শ্রমিক পরিচয়কে 'হীন' কিছু মনে করায়। এই মনোভাব ইউনিয়নভিত্তিক সংগঠন দুর্বল করে, সদস্যপদ সীমিত রাখে, আর মালিকপক্ষের জন্য সংবাদকর্মীদের সহজে ব্যবহারযোগ্য বা শোষণযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ, শুধুই মালিকদের দমন নয়; পেশাগত সংস্কৃতিও এখানে সংগঠিত শ্রমশক্তি তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এই দ্বৈত সংকট, আইনের অকার্যকারিতা এবং শ্রমিক পরিচয়ের সংকোচ, মিলেই বার্তাকক্ষে স্থায়ী কাঠামো গড়ে ওঠে না। খরচ কমানোর নামে অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং মধ্যম পর্যায়ের কর্মীদের বাদ দেওয়া আজ নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে সাংবাদিকতার মান পড়ে যাচ্ছে এবং টেকসই টিম তৈরি করা সম্ভব হয় না এবং অনুসন্ধানী বা ঝুঁকিপূর্ণ সাংবাদিকতার পরিবেশ নষ্ট হয়। এই অনিশ্চয়তার পরিবেশই সম্প্রতি আজকের পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের আত্মাহুতিকে আরেক দফা সামনে এনেছে, এটি শুধু ব্যক্তিগত হতাশা নয়; সাংবাদিকতার শ্রম-নিরাপত্তাহীনতার গভীর কাঠামোগত সংকটের এক নির্মম প্রতীক।

ফলে সাংবাদিক সুরক্ষা এবং গণমাধ্যম সুরক্ষা – এই দুই প্রশ্নকে আলাদা করে দেখা যায় না। শ্রম আইন বাস্তবায়ন, সংগঠিত ইউনিয়নের সক্ষম উপস্থিতি, এবং সাংবাদিকদের নিজেদের শ্রম পরিচয় গ্রহণ, এই তিনটি বিষয় একসাথে না হলে গণমাধ্যম টেকসই হবে না, আর সাংবাদিকদের জীবনও নিরাপদ হবে না।

সরকারি সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সরকারি গণমাধ্যম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান হয়তো জরুরি কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান কিছু সরকারি আজ্ঞাবহ মানুষ তৈরি করে, যা সাংবাদিকতা পেশাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। বিগত সরকারের সময়ে আমরা দেখেছি, সরকারি আজ্ঞাবহ সংবাদকর্মীরা আন্দোলনকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ন্যায্য সাংবাদিকতার বিপরীত বলেই মনে হয়েছে আমাদের কাছে।

পরিশেষে...

গণমাধ্যম সংস্কারের যাত্রায় এই প্রতিবেদনটিকে একটি প্রাথমিক রূপরেখা বলা যায়। এতে মালিকানা, শ্রম অধিকার, বিজ্ঞাপন বাজার, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি গণমাধ্যমের কাঠামো, সমঅধিকার ও গণমাধ্যম স্বাক্ষরতা নিয়ে বিস্তৃত সুপারিশ আছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট, নিউ মিডিয়ার অনুপস্থিতি, লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ না থাকা এবং প্রস্তাবিত সমাধানের অকার্যকারিতা।

তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রিপোর্টটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বিন্দু তৈরি করে। নতুন সরকারের জন্য এখানেই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তাদের সামনে এখন অন্তত তিনটি জরুরি কাজ রয়েছে: প্রথমত, মিডিয়া রিফর্ম কমিশনের সুপারিশগুলোর একটি স্পষ্ট বাস্তবায়নযোগ্য রোডম্যাপ তৈরি করা; দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি বা পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে একটি কার্যকর স্বাধীন তদারকি কাঠামো গড়ে তোলা; এবং তৃতীয়ত, সাংবাদিকদের শ্রম অধিকার, নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবমুখী নীতিমালা গ্রহণ করা। এর বাইরে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা বা প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করা নিজে থেকে কোনও সংস্কার নিশ্চিত করে না।

একইসাথে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রশ্নটিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নির্বাচনী ইশতেহারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা থাকলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হবে, সেটি নির্ভর করবে সরকার ক্ষমতার রাজনীতির বাইরে গিয়ে এই খাতকে দেখার সক্ষমতার ওপর। কারণ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখায়, প্রায় সব সরকারই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম সংস্কারকে কেবল নীতিনির্ধারণ বা প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। এটি মূলত ক্ষমতার বন্টনের প্রশ্ন, কে কথা বলবে, কে নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং কার স্বার্থে তথ্য প্রবাহিত হবে। সেই জায়গায় পরিবর্তন না এলে কোনো কমিশন, কোনো রিপোর্ট, বা কোনো নতুন কাঠামোই গণমাধ্যমকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করতে পারবে না। ●

মীর হুযাইফা আল মামদূহ একজন গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৮ নভেম্বর ২০২৪, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করে। গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব করাই ছিল এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সংবাদমাধ্যমের সংস্কার নিয়ে এর আগেও ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ প্রেস কমিশন (১৯৮২-৮৪) এবং বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন কমিশন (১৯৯৬-৯৭) গঠিত হয়েছিল তবে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী কমিশনের ক্ষেত্রেও প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে আর কোনও উদ্যোগ নেয়া হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক ও গবেষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

‘মিডিয়া সেক্টরেও কাউকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হতে দেয়া যাবে না’

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: গণমাধ্যম কমিশনের সাথে কীভাবে যুক্ত হলেন? এই কমিশনে আপনাদের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটু বলুন।

কামাল আহমেদ: সরকারের (অন্তর্বর্তীকালীন) তরফ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো যে, সরকার গণমাধ্যমের সংস্কার করতে চায় এবং এই লক্ষ্যে একটা সংস্কার কমিশন গঠন করতে চায় – সেই কমিশনে কাজ করতে আমি আগ্রহী কিনা? আমি ভাবলাম, এটা দেশের জন্য একটা প্রয়োজনীয় কাজ। কারণ গণমাধ্যম নিয়ে এক ধরনের হতাশা ছিল, যে দেশের মধ্যে যথাযথভাবে সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটছে না। আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেভাবে বারবার বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত আসছে, বাধা আসছে, সেটা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা ব্যর্থ হচ্ছেন।

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ – প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যেই দুর্বলতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে অসততা, অসাধুতা এগুলোও রয়েছে। সেসব কারণেই মনে হলো যে, যদি সরকার আন্তরিকভাবেই একটা সংস্কার করতে চায়, পরিবর্তন আনতে চায় তাহলে সেই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকলে সেই সুযোগ কাজে লাগানো দরকার। এই বিবেচনায় আমি সম্মতি দেই এবং কাজটা করতে রাজি হই।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ, বর্তমানে কারাগারে আছেন, তিনি আমাকে বললেন যে এর আগে একটা কমিশন হয়েছিল বাংলাদেশে, সংবাদপত্রের জন্য একটা কমিশন হয়েছিল, ফার্স্ট প্রেস কমিশন রিপোর্ট। এই রিপোর্ট কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না, একমাত্র প্রেস ক্লাবের লাইব্রেরিতে আছে। এটা এরশাদের আমলে করা হয়। সেই সময়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত সংস্কার কমিটি, প্রেস কমিশন। আর আসাফুদ্দৌলার নেতৃত্বাধীন যে কমিটি, সেটা হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে একটা কমিশন, যেটা ১৯৯৬ বা ৯৭ সালে গঠিত হয়। এই দুটো কমিশনের প্রতিবেদনে অনেক কিছু জানার এবং বোঝার ছিল। কার্যত, যে প্রতিবেদন আমরা দিয়েছি, আমাদের সুপারিশমালায় প্রথম কমিশনের প্রিন্ট মিডিয়া সংক্রান্ত যে অবজারভেশন ছিল, বিশেষ করে – সংবাদপত্রের যে সার্কুলেশনের ম্যানেজমেন্ট কিংবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি, তাদের পর্যবেক্ষণগুলো এখনো বাস্তব, খুব বেশি পরিবর্তন যে ঘটেনি সেটা আমরা উল্লেখ করেছি।

আলোকচিত্রী: সাজিদ হোসেন, প্রথম আলো

কামাল আহমেদ
সাবেক গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও দ্য ডেইলি স্টারের কনসাল্টিং এডিটর

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আপনাদের কোনও ইন্টারনাল বায়াস ছিল, যেমন কমিশনের রিপোর্ট পড়লে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে মিডিয়ার সমস্ত বঞ্চনা বিগত সরকারের আমলে হয়েছে, বিগত সরকারের আমলে বঞ্চনা চূড়ান্ত হলেও অন্য সরকারের সময় নানাভাবে মিডিয়া হুমকির মধ্যে পড়েছে। সেই আলাপগুলো কী খানিকটা এড়ানো হয়েছে?

কামাল আহমেদ: আমি এটা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করব। এবং বলব যে আপনারা এই কমিশনের প্রতিবেদনের ভুল পাঠ গ্রহণ করেছেন। আপনি দেখবেন যে প্রথম অধ্যায়েই এদেশের গণমাধ্যমের ৫৪ বছরের পরিক্রমা তুলে ধরা হয়েছে। এবং খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়নটা করা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে। ৭২ এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা ভেবেছি, স্বাধীন দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র গড়ে উঠবে। এবং স্বাধীন সংবাদপত্র চালু করার একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু শুরুতেই সেই যে বাধা ৭৩ সালে আসে, এবং সেটা চূড়ান্ত রূপ নেয় ৭৫ এ বাকশাল গঠনের সময়, বিভিন্ন সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, তখন থেকে যে প্রভাব শুরু হলো। আবার আমাদের যে প্রচলিত ধারণা, সামরিক শাসনের সময়ে সংবাদমাধ্যমের উপরে নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দেখেছিলাম আমরা যে, ৭৫ এ সামরিক শাসনের মধ্যেই সংবাদমাধ্যমগুলোকে আবার পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

আমরা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসটা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, কোন কোন পর্যায়ে কখন সংবাদপত্রের উপরে সবচাইতে বেশি খড়গ নেমে এসেছে এবং কখন সংবাদপত্র যথেষ্ট পরিমাণে সাহসী ভূমিকা রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে। এই পর্যালোচনা কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে আছে। শুধু শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসন আমলে যে সংবাদপত্র বাধার মুখে পড়েছে, বিপত্তির মুখে পড়েছে, তা কিন্তু নয়। আমরা দেখিয়েছি যে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপির শাসনামলের দ্বিতীয় পর্বে সংবাদপত্রের বা সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠের উপরে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছিল। এবং সে সময় সাংবাদিকদের ভোগান্তি হয়েছে। কিন্তু তার (বেগম খালেদা জিয়া) প্রথম মেয়াদ যেটা, ৯১ সাল থেকে ৯৫ সাল, ওই সময়টা বিশেষ করে প্রথম চার বছর আমি বলব বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সেরা সময়টা ভোগ করেছে বা সেটা অর্জন করেছে। সেটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। এই মূল্যায়ন কিন্তু একেবারে প্রমাণ সাপেক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা তুলে ধরেছি আমাদের প্রতিবেদনে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: এই রিপোর্টের মধ্যে আছে যে, আপনারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলকে রিকনসিলিয়েশন প্রক্রিয়া বা এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য শোনার জন্যে ডেকেছিলেন। কিন্তু একটা গোষ্ঠীর বাধার মুখে পড়েছেন। আসলে ঠিক কী ঘটেছিল?

কামাল আহমেদ: আমরা সংবাদপত্রের মতোই টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও দেখার চেষ্টা করেছি যে, টেলিভিশনের অনুমোদনটা কেমন করে হয়। সংবাদপত্রে যেমন আবেদন করে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ডিক্লারেশন নিয়ে পত্রিকা বের হয়। টেলিভিশন এবং রেডিওর অনুমতির প্রক্রিয়াটা কী? সেখানে আমরা দেখলাম যে সরকারের একটা কোন আইন নাই। তবে নীতিমালা ছিল, সম্প্রচার নীতিমালা। সেই সম্প্রচার নীতিমালার অধীনে সরকার বিভিন্ন জনকে টেলিভিশন কেন্দ্র করার অনুমতি দিয়েছেন। এখন এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক স্বচ্ছ প্রক্রিয়া সরকার অনুসরণ করেনি। বরং একান্তেই গোপন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। নিজেদের লোক এই বিবেচনায়, রাজনৈতিক বিবেচনায়, আমাদের পক্ষে কে কথা বলবে সেই বিবেচনায়, অথবা *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

‘গণমাধ্যমকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখার প্রয়োজন আছে’

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আমরা গণমাধ্যমের সংস্কারের প্রসঙ্গ এবং কমিশনের প্রতিবেদন ও পরামর্শ নিয়ে আলাপ-আলোচনাকে জারি রাখতে চাই। তারই অংশ হিসেবে এই আলাপ। আমাদের প্রথম প্রশ্ন, আপনি গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: গণমাধ্যম কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ, একটি যথেষ্ট ভালো রিপোর্ট। তবে দুঃখের বিষয়, অতীতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের রিপোর্ট, একটি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, অন্যটি ১৯৮৩ সালে, এর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়নি। সেই তুলনা করলে রিপোর্টটি আরও গভীর হতো, কারণ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ছাড়া গণমাধ্যম সংস্কারের প্রকৃত চিত্র বোঝা অসম্ভব। কমিশনের এই রিপোর্ট বাস্তবায়ন কতখানি হবে বা আদৌ নীতিতে রূপ পাবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। তবুও আমি মনে করি, এই উদ্যোগটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আমরা দেখেছি গত কয়েক দশকে মিডিয়া যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যেভাবে এর ব্যবসায়িক নেক্সাস, রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার বৃত্তগুলো জটিল হয়েছে, তার চূড়ান্ত রূপ। যদি গণমাধ্যম এই নেক্সাসের বাইরে বের হতে না পারে, তাহলে জনকল্যাণমূলক বা দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার যে আকাঙ্ক্ষা, তা বাস্তবে পরিণত হবে না।

আলোকচিত্রী: বর্ষা জহীন

আ-আল মামুন
অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তবে এটাও ভাবতে হয়, একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে থেকে আসলে কতখানি গণমাধ্যম সংস্কার সম্ভব? রিপোর্টে বারবার বলা হয়েছে, গণমাধ্যমকে ‘ব্যবসায়ে সফল’ হতে হবে। কিন্তু সেই সফলতার সংজ্ঞা কী বা তার নৈতিক ও পেশাগত সীমা কোথায়, তা বলা হয়নি। গণমাধ্যমকে যেভাবে কেবল ‘ইন্ডাস্ট্রি’ হিসেবে দেখা হচ্ছে, সেটি পুরনো শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ধারার চিন্তা। অথচ আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের কারণে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেল ভেঙে পড়েছে।

গণমাধ্যমকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউশন) হিসেবে না দেখে, একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বোঝার প্রয়োজন আছে। রিপোর্টটিতে সেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি অনুপস্থিত। কেন আজকের গণমাধ্যম এমন হয়ে উঠেছে, তার পেছনে কী কী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন কাজ করছে, এই ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। রিপোর্টে মনে হয়েছে, মিডিয়ার বর্তমান সংকটকে শুধু কোনো নির্দিষ্ট সরকারের নীতিগত ভুলের ফল হিসেবে দেখা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি এর চেয়ে অনেক জটিল ও বিস্তৃত, এবং কাঠামোগত।

তবুও এই রিপোর্টের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এখানে যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, তার অর্ধেকও যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বাংলাদেশে ‘সুস্থ ধারার সাংবাদিকতা’র জন্য একটি নতুন ভিত্তি তৈরি হতে পারে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: পতিত সরকারের আমলে মূলধারার গণমাধ্যম প্রধানত আওয়ামী প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়া সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে জোট বেঁধে সরকারি বয়ান প্রতিষ্ঠা ও বিরুদ্ধ মত দমনে কাজ করেছে। মিডিয়া-সরকারের নেক্সাস/সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়ার জন্য কী কোনো দিক নির্দেশনা পেলেন কমিশনের প্রতিবেদনে?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: কমিশনের প্রতিবেদনে আমি যেটুকু দেখেছি, সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা আছে। গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য কিন্তু সেই স্বাধীনতা কী সত্যিই মুক্ত সাংবাদিকতার পথ তৈরি করে? আমাদের দেশে সাংবাদিকতাকে দীর্ঘদিন ধরে আইনি কাঠামো ও নানা সিস্টেম্যাটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, প্রায়ই এমনভাবে যা বর্বর, ন্যাক্কারজনক এবং প্রকাশ্য। এ ধরনের প্রকাশ্য দমন ইউরোপ বা আমেরিকার পরিপক্ব গণতন্ত্রে দেখা যায় না। বাংলাদেশের মিডিয়ার পক্ষে স্বাধীন কণ্ঠ তোলা বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রায়ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুধু রাজনৈতিক বা করপোরেট নেক্সাস ভেঙে ফেললেই যে আমরা একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম পেয়ে যাব, সে বিষয়ে আমি খুব আশাবাদী নই। তবু কিছু প্রস্তাব আছে যেগুলো সত্যিই *১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

‘গণমাধ্যমকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখার প্রয়োজন আছে’

১৫-এর পৃষ্ঠার পর মৌলিক ও জরুরি। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি মালিকানার ধরন নিয়ে। ক্রস-মালিকানা থাকবে কি না, সেটাই এখন বড় বিতর্ক। একই মালিকের অধীনে অনেকগুলো মিডিয়া থাকা কী গণমাধ্যমের বহুমুখিতা ও স্বাধীনতাকে সংকুচিত করছে না?

উদাহরণ হিসেবে বসুন্ধরা গ্রুপকে ধরা যেতে পারে। তাদের অধীনে রয়েছে সাতটির মতো মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়াও অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, বসুন্ধরার ছায়া বিনিয়োগ (শ্যাডো ইনভেস্টমেন্ট) আছে আরও অনেক মাধ্যমে। যখন বসুন্ধরার সাতটি মিডিয়া একই সুরে কথা বলে, তখন দেখা যায় আরও সাতটি সেই সুরে যোগ দিচ্ছে। এই একরৈখিকতার মধ্যেই হারিয়ে যায় গণমাধ্যমের প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আসলে জনগণের অধিকারের রক্ষাকবচ ছিল।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: যেমন আমরা মোসারাত জাহান মুনিয়ার ঘটনা এবং ‘ধর্ষণ ও হত্যা’ মামলাটির রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি।

অধ্যাপক আ-আল মামুন: মুনিয়ার কেসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা দেখা গেছে। ঢাকার মিডিয়াগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, চাপে রাখা হয়েছে, বিজ্ঞাপন বাড়িয়ে বা নানা সুবিধা দিয়ে প্রভাবিত করা হয়েছে, সেটা মুনিয়া ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার সংবাদে স্পষ্ট হয়েছে। যখন দেখা গেল ঢাকার মিডিয়ায় এই বিষয়ে আর তেমন আলোচনা হচ্ছে না বরং বিভাগীয় শহরগুলোতে মুনিয়ার কেস নিয়ে আলাপ বাড়ছে, তখন বসুন্ধরা বিভাগীয় ও জেলা শহরের পত্রিকাগুলোতেও বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া শুরু করল। ফলে সেখানকার সংবাদমাধ্যমগুলোকেও নীরব করে ফেলা সম্ভব হলো।

এই প্রক্রিয়াগুলো যে ঘটে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই অবস্থার পরিবর্তনের একটি উপায় হতে পারে মালিকানার ধরন বদলানো, বিশেষ করে সাধারণ বা ক্রস-মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে এই বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাব আছে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: কিন্তু ক্রস-মালিকানার ধারণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় কতটা সম্ভব? বসুন্ধরার উদাহরণই ধরা যাক, বসুন্ধরা যেখানে সাতটি মিডিয়া পরিচালনা করছে এবং রাজনৈতিক প্রভাবও বজায় রেখেছে, সেখানে যদি তাদের কাছ থেকে এই সাতটি মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয়া হয়, বা বলেন একটি মিডিয়া রাখা যাবে, তাহলে রাজি হবে?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: ক্রস মালিকানা বলতে কমিশন যেটা বোঝাচ্ছে, আমি সেটা বোঝাচ্ছি না। ক্রস মালিকানা বলতে যেটা আদর্শিকভাবে বোঝানো হয়, সেটা হলো, ধরুন, আমার হাতে পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিও আছে; এই ক্রস মালিকানাটা বাতিল হতে হবে। কিন্তু আরেকটা প্রস্তাব সেখানে আছে, যেটা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। সেটায় বলা হয়েছে যে, ইনভেস্টর একজন না হলেও ভালো, অর্থাৎ, একটা মিডিয়াতে যদি কয়েকজন ইনভেস্টর থাকে, তাহলে সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা যাবে। আমার ধারণা, এটা তাদের একটি অনুমান। কিন্তু সেটা হলেই যে সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার কাছে মনে হয় না। আমার কাছে মনে হয়, কোনো করপোরেট হাউজ বা ব্যক্তির মালিকানায় একটি মিডিয়া থাকতেই পারে। সেখানে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার প্রশ্ন আছে।

সেই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রস্তাব আছে। যেমন, প্রতি বছরে কত সার্কুলেশন হচ্ছে, কী পরিমাণ অডিয়েন্স রিচ হচ্ছে, সেটার একটি স্পষ্ট রেকর্ড মিডিয়াকে তুলে ধরতে হবে। তাদের আয় কোথা থেকে হচ্ছে, কী কী সোর্স থেকে আসছে, সেটাও প্রকাশ করতে হবে। এবং যদি ব্যবসায় সফল না থাকে, যদি এক-দুই বছরেও ব্যবসায় সফলতা না পায়, তাহলে সেই মিডিয়ার তো থাকার দরকার নেই। তাকে আমি ধরব: কেন তোমরা ব্যবসা সফল না?

যেমন ঢাকায় এখন প্রায় এক হাজারের বেশি দৈনিক পত্রিকা আছে, এবং সারাদেশে তিন হাজারের বেশি দৈনিক পত্রিকা। এর মধ্যে এক-দুটি বাদে কোনোটি ব্যবসায় সফল না। তাহলে তারা চলে কীভাবে? এই প্রশ্ন তো উত্থাপন করা উচিত। আর সেই প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আমাদের যে প্রেস কাউন্সিল ছিল, সেটি একদমই অকেজো।

রিপোর্টে যেমন মিডিয়া ইনস্টিটিউটের একটি প্রস্তাব করা হয়েছে, মিডিয়া ইনস্টিটিউটে কী কী থাকবে, এবং তার আইনি ও পরামর্শ দেওয়ার জায়গাগুলো কী হবে – আমার ধারণা, সেগুলোও যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে মালিকানার সংকট, মালিকের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অন্যান্য ব্যবসা রক্ষার বাসনা, এই বিষয়গুলো কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি। একটি উদাহরণ দিই, ১৯৯৮ সালে সাবের হোসেন চৌধুরীর ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক হন মতিউর রহমান। সাবের হোসেন চৌধুরী তখন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য। পরে মতিউর রহমানের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। মতিউর রহমান অনেকটা এইভাবে বলেন যে, *‘আপনার মিডিয়াতে আমি সম্পাদকীয় স্বাধীনতা পাচ্ছি না। ফলে আপনার পত্রিকায় আমি কাজ করব না, আমি অন্য পত্রিকা করব।’* এরপর তারা ট্রান্সকম গ্রুপের হয়ে প্রথম আলো-র জন্য আবেদন করে। রেজিস্ট্রেশনও পায়। এবং তারা সরকারের সমালোচনা করেই যাত্রা শুরু করে। কিন্তু আপনি দেখবেন, পরে কিন্তু এরকম মালিকানা আর দেওয়া হয়নি। ২০০৯ সালের পর থেকে স্পষ্টভাবে আর কোনো মালিকানা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেওয়া হয়নি। মালিকানা দেওয়া হয়েছে সেই সব ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকেই, যারা সরকারকে সেবা দেবে।

রিপোর্টে (গণমাধ্যম কমিশন) এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি আছে। আওয়ামী আমলে টিভির লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অঙ্গিকারনামায় বলা হয়েছে, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য একটি টেলিভিশন দরকার।’ ‘আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চাই, আমার একটি টেলিভিশন দরকার।’ এসব তথ্য গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে (২০২৫) উঠে এসেছে। এবং এসব টেলিভিশন মালিকানা পাওয়ার জন্য এরকম অদ্ভুত যুক্তি দেয়া হলেও তা নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক হয়নি, কোনো আলোচনা হয়নি, তর্কবিতর্কও হয়নি। খুবই স্বেচ্ছাচারীভাবে নিজের লোকদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এই লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াটা খুব কঠোরভাবে কমিয়ে আনা দরকার। যেমন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যদি ফিজিবিলিটি বিশ্লেষণ করি, ঢাকা শহরে ৩৫-৪০টি টেলিভিশন কী আদৌ চলতে পারে? আমি পৃথিবীর কোথাও এতগুলো মিডিয়া দেখি না। এমনকি ভারতেও না। কলকাতাতেও এতগুলো মিডিয়া পাবেন না। অন্য কোনো শহরেও না, দিল্লিতেও না। তাহলে বাংলাদেশে এই মিডিয়ার প্রাদুর্ভাব কেন হলো, এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এবং রিপোর্টে কিছু পরামর্শ আছে, যেগুলো অন্তত মিডিয়াকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। এইটুকুই আশার কথা।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: মিডিয়ার মালিকানায় নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে যে নিয়ন্ত্রণ চলে যায়, সেটা প্রতিহত করার কোনো দিক-নির্দেশনা কমিশনের রিপোর্টে আছে বলে আপনি মনে করেন কি? এবং থাকলে সেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য কি না?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: আমরা দেখি যে ইউরোপ বা আমেরিকাতেও এটা খুব একটা বাস্তবায়নযোগ্য ছিল না। যেটা বলা যায়, সেটা হলো ‘চেইন ওনারশিপ’। আমরা বলি যে, মিডিয়া ব্যবসা অন্য ব্যবসার চেয়ে আলাদা। আমরা তো মালিকানার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছি আমেরিকান মডেল। আমেরিকাতেও দেখবেন একই ঘটনা ঘটেছে, এটা ঘটেছে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে। তার আগে তেমন দৃষ্টান্ত নেই। তারপর থেকে দেখা যায়, একই মালিকানার অধীনে, একই করপোরেট হাউসের অধীনে টেলিভিশন, পত্রিকা, রেডিও, সিনেমা, এইচবিও; এমনকি অস্ত্র ব্যবসা থেকে শুরু করে নানা রকম ব্যবসা একসাথে চলছে। মানে, এটা তাদের জন্য একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং পাশাপাশি এর রাজনৈতিক ব্যবহারও ছিল।

বাংলাদেশে যে প্রস্তাবটা করা হচ্ছে, সেটা বাস্তবায়ন করা কঠিন। কিন্তু যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের শিক্ষা, সবকিছু বিচার করে আমাদের মিডিয়া রিয়েলিটি তৈরি করতে হবে। আমার কাছে মনে হয়, এটা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যদি করা যায়, তাহলে মালিকানার এই প্রশ্নটা সেটেল করা সম্ভব। সেটা এমন হতে পারে যে, একজন একটির বেশি মিডিয়ার মালিক হতে পারবে না। এবং তাকে এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে, ব্যবসায় সফল হতে হবে, নিয়মিত সাংবাদিকদের বেতন দিতে হবে, বেতনের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে চলতে হবে। যদি এই শর্তগুলো পূরণ করে, তাহলে একজন মিডিয়ার মালিক হতে পারবে। তখন দেখা যাবে, যার কাছে শুধু ব্যবসার চিন্তা আছে, সে আর মিডিয়া করতে আসবে না।

যদি এই সরকার বা কোনো রাজনৈতিক সরকার শক্তভাবে অবস্থান নিতে পারে, তাহলে একটা রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু আমাদের যে আশঙ্কার জায়গা, সেটা হলো, বাংলাদেশের কোনো সরকারেরই তো কখনো সততা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও যে সেই সততা থাকবে, তা আমরা আশা করতে পারি না।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আমাদের যে মিডিয়াগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোর প্রতিষ্ঠা কী সত্যিই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে হয়? এর পেছনে তো নানা রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক কারণ কাজ করে। মিডিয়ার এই রাজনৈতিক অর্থনীতি কী কমিশন বিবেচনা করেছে বলে আপনার মনে হয়?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: সেটা হয়তো এখানে ধরার সুযোগও ছিল না। মিডিয়ার যে রাজনৈতিক অর্থনীতি, তার যে পরিবর্তন ঘটেছে, ৫০ বছর আগের মিডিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আজকের মিডিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু সেই পার্থক্যের সব দিক এখানে আলোচিত হয়েছে, তা আমি দেখি না। মিডিয়া কীভাবে চলে এবং কেন চলে, এই প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অন্তত টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বলা যায়, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেউ টেলিভিশন খুলে না। সবাই খোলে ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য, অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। আমার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর যে দ্বন্দ্ব, সেটাও মেটানোর একটি উপায় হয়ে দাঁড়ায় মিডিয়া।

যখন যমুনা গ্রুপের বিরুদ্ধে বসুন্ধরা রিপোর্ট করে, বা প্রথম আলো, বসুন্ধরার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে – তার ভেতরেও একটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য কাজ করে। এই বিষয়গুলো সব বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, তা নয়। তবুও রিপোর্টে কিছু প্রতিফলন আছে, আমাদের মিডিয়ার অর্থনীতি কীভাবে বদলেছে, তার কিছু ইঙ্গিত সেখানে এসেছে। তবে সেগুলো একটু ছড়ানো ছিটানোভাবে এসেছে। আর নতুন মিডিয়ার (নিউ মিডিয়া) অর্থনীতি এখানে খুব বেশি উল্লেখ করা হয়নি, এবং সেটার ওপর বিশেষ কোনো ফোকাসও নেই।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: নিউ মিডিয়ার অর্থনীতির কথা আপনি বললেন। আমাদের মিডিয়ায় তো দেশের ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার পর একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানই সামাজিক গণমাধ্যমে প্রবেশ করেছে। ফেসবুকে তাদের বড় ধরনের কার্যক্রম আছে, ইউটিউবে নিজস্ব চ্যানেল আছে, কেউ কেউ টিকটকের মাধ্যমেও ব্যবসা করছে। এগুলো এখন তাদের আয়ের বড় একটি অংশ। যেমন, আমি যদি সময় টিভির কথা বলি, টিভি থেকে যে আয় হয়, ইউটিউব থেকে তার তিন-চার গুণ বেশি আয় হয় বলে শুনেছি। কিন্তু কমিশনের প্রতিবেদনে গণমাধ্যমের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখলাম, নিউ মিডিয়ার প্রসঙ্গ আনাই হয়নি।

অধ্যাপক আ-আল মামুন: এখানে কয়েকটা প্রসঙ্গ এসেছে। নিউ মিডিয়া আসার ফলে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে সেই বিষয়টিকে ঘিরেই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনের একটা জায়গায় কেবল একটি উল্লেখ দেখা যায়, যেখানে বলা হয়েছে এখন নিউ মিডিয়া থেকে কী ধরনের আয় হচ্ছে। সেটা আমেরিকার কোনো একটি প্রতিবেদন, সম্ভবত ফ্রিডম হাউজ বা অন্য কারও। ২০২১ সালের একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে কীভাবে বিজ্ঞাপনগুলো মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় না গিয়ে নিউ মিডিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে।

শুধু এইটুকু বিশ্লেষণ করলেই যথেষ্ট হয় না। কারণ ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া এখন আর সেই জায়গায় নেই; সেই অডিয়েন্সও তার আর নেই। ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার যে পাঠক ছিল, সেই পাঠক এখন আর নেই। ট্র্যাডিশনাল টেলিভিশনের যে দর্শক ছিল, সেই দর্শকও আর নেই। ফলে, এখন নিউ মিডিয়ার জায়গা, এবং তার সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া কীভাবে সহাবস্থান করছে, প্রিন্ট মিডিয়া কীভাবে কো-অপ্ট করছে, তা কীভাবে তাদের নিউজের কাঠামো বদলে দিচ্ছে, যা আবার পপুলিজমকে উসকে দিচ্ছে – এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে। যেমন ধরুন, ক্লিকবেইট। আপনি অনুমান করুন, আজ থেকে ৩০ বছর আগে আমরা যখন শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন গাবতলীতে বাসে উঠতে যাচ্ছি, হকার চিৎকার করছে, *‘খালেদা আবার মা হচ্ছেন’* কিংবা *‘হাসিনা পালিয়ে গেছেন।’* তখনই মাথায় আসে, খালেদা জিয়া তো প্রধানমন্ত্রী, কী হলো! বা হাসিনার কী হলো! অর্থাৎ, এটাই ক্লিকবেইট।

আমি কোভিডের সময় ক্লিকবেইট নিয়ে একটি গবেষণা করাচ্ছিলাম। সেখানে দেখা গেছে, জাগো নিউজ সবচেয়ে বেশি ক্লিকবেইট ব্যবহার করে। তবে প্রথম আলো ব্যবহার করে না, তা নয়, তারাও পর্যাপ্ত ব্যবহার করে। ডেইলি স্টারও করে। সবাই করে, কারণ এটা তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজন। এমনকি একটি উদাহরণ দিতে পারি, যমুনা টিভির একটি কনটেন্ট সর্বোচ্চ ভিউ পেয়েছিল। সেটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বেশি দেখা কনটেন্ট। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এক সপ্তাহের মধ্যে তারা জেনে যায় এটা ভুয়া। তবুও তারা সেই ভুয়া কনটেন্ট সরায়নি। কেন সরায়নি, সেটা সহজেই বোঝা যায়, এই যে ক্লিকবেইট, এবং তার যে মুনাফা, সেটার সঙ্গেই তো তাদের টিআরপির হিসাব মেলে। ফলে তারা কনটেন্টটি রেখে দিয়েছে।

এই যে নতুন মিডিয়ার বাস্তবতা, তার মধ্যে ক্লিকবেইট ও অন্যান্য সংবেদনশীল উপাদান (সেন্সেশনাল এলিমেন্ট) ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। ধরুন, একাত্তর টিভি একটি টক শো করবে, তারপর দেখা যাবে তাদের ইউটিউব পেজে সেই টক শোর পাঁচটি আকর্ষণীয় শিরোনাম ও থাম্বনেইলসহ পাঁচটি সেগমেন্ট আলাদা করে প্রকাশ করছে। সেটাই এখন তাদের ব্যবসা, সেটাই তাদের টেলিভিশন প্র্যাকটিস। সেই কারণেই তারা টক শোতে এই ধরনের আলোচনা হাজির করে। ফলে, এই নতুন মিডিয়া ইকোলজি নিয়ে আলোচনা রিপোর্টে আসা দরকার ছিল। একটা মিডিয়া ইকোলজি ছিল নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত, চাইলে একে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত ধরা যায়। কিন্তু যখন আমাদের ইন্টারনেটের গতি বেড়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আসতে শুরু করেছে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির হচ্ছি এবং নানা ধরনের লিংক ও সংযোগ তৈরি হচ্ছে, তখন এই মিডিয়া ইকোলজিটাই বদলে গেছে। আমার ধারণা, এই নিউ মিডিয়ার উপস্থিতির কারণে গড়ে ওঠা নতুন মিডিয়া ইকোলজি, এই পুরো ধারণাটাই রিপোর্টের মধ্যে অনুপস্থিত।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: তবে প্রতিবেদনে মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন প্রতিরোধ এবং ফ্যাক্ট চেকিংয়ের বিষয়টির উল্লেখ আছে।

অধ্যাপক আ-আল মামুন: হ্যাঁ, ভুয়া বা ভুল তথ্য প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি বিষয় এসেছে। সেখানে একটি রেফারেন্সও আছে। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ২০১৬ সালে কীভাবে ‘ফেক নিউজ’ শব্দটি যুক্ত হলো, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, ফেক নিউজ ধারণাটাই দাঁড়িয়ে আছে যেন এক ফেক নিউজের উপরে! ফেক নিউজ কেবল ২০১৬ সালের ঘটনা না; ১৬ শতক থেকেই এর উপস্থিতি দেখা যায়। ষোল শতক থেকে কীভাবে আমরা ২০১৬ সালের ফেক নিউজ বাস্তবতায় এসে দাঁড়ালাম তার একটা নুয়ান্সড ক্রিটিক করা যায়। এসব প্রসঙ্গ আরও ক্রিটিক্যালি দেখা দরকার ছিল বলে আমার মনে হয়! কিন্তু এই যে ফ্যাক্ট চেকের প্রসঙ্গ, রিপোর্টে একটি প্রস্তাব আছে যে, সকল মিডিয়া হাউজকে ফ্যাক্ট চেক করতে হবে।

এখানে আমার একটা সমালোচনামূলক প্রশ্ন থাকে, মিডিয়াগুলো আসলে কেন ফ্যাক্ট চেক করে? মানে, লিবারেল মিডিয়া টিকিয়ে রাখা কেন প্রয়োজন? লিবারেল বা ট্র্যাডিশনাল মিডিয়াকে কেন টিকিয়ে রাখতে হবে? কারণ, আমাদের যে ঐতিহ্যগত ক্ষমতার কাঠামো (ট্র্যাডিশনাল পাওয়ার স্ট্রাকচার), সেটার সঙ্গে লিবারেল আদর্শ (আইডিওলজি) মিলে যায়। ফলে, ফ্যাক্ট চেক তাদের দরকার হয় এই উদ্দেশ্যে। এর মানে এই নয় যে, জনগণের বড় উপকারের জন্য ফ্যাক্ট চেক করা হচ্ছে।

রিপোর্টের অনুমানগুলো এমনভাবে এসেছে যেন, ফ্যাক্ট চেক করা দরকার কারণ মানুষ ভুল তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু বিষয়টা তা না। আসল ব্যাপার হলো, পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাই প্রো-পিপল নয়। মানে, মিডিয়া যতই আমাদের তথ্য দিক না কেন, আমরা যত বড় বড় কথা বলি না কেন, দেখা যায় যে একদম শুরু থেকেই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনের পর থেকে, যখন মিডিয়া আসতে শুরু করল, পেনি প্রেস থেকে যদি বলি, তার আগের সময়েও, মিডিয়া কখনোই ব্যবসার বাইরে যায়নি, কোনো রাজনৈতিক কৌশল বা প্রভাবের বাইরে যায়নি। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো অস্ট্রেলিয়ান রুপার্ট মারডকের সিএনএনসহ অন্যান্য টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, যার বিশাল সাম্রাজ্যের পেছনে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। এই আলোচনাগুলো রিপোর্টে খুব বিস্তারিতভাবে নেই। এবং নতুন মিডিয়ার ইকোলজিও বিস্তারিতভাবে নেই, আমি বলব, একদমই নেই।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: মিডিয়া ফ্রিডম নিয়ে যে সকল ডোনার-ফান্ডেড প্রকল্প আছে সেখানে ফ্যাক্টচেকিংকে বেশ প্রাধান্য দেয়া হয়। ভুয়া তথ্য বা সংবাদ উৎপাদন ও প্রবাহের যে রাজনীতি আছে সেটা এসব প্রকল্পে আমলে নেয় না। ফ্যাক্টচেকিং প্রসঙ্গে কমিশনের সুপারিশ এই এনজিওয়াইজড ডিসকোর্স প্রভাবিত মনে করেন কী?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এনজিওবাদী চিন্তাভাবনার প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়। এও বলা দরকার, ভুয়া তথ্য বা সংবাদ উৎপাদন কেবল এসময়ের দক্ষিণপন্থী ও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক তৎপরতার অংশ না, কেবল পপুলিস্ট আবেগীয় রাজনীতির হাতিয়ার না, বরং ক্রিস্টিন ফুক্সস বর্ণিত *‘ডিজিটাল ক্যাপিটালিজম’ (২০২২)* পরিগঠনেরও এক বড় উপাদান বলে আমার মনে হয়। বুইং চুল-হান তার সাইকোপলিটিক্স (২০১৪) গ্রন্থে দাবি করেছেন, আমরা ফুকো বর্ণিত ‘বায়োপলিটিক্যাল’ মডেল থেকে ‘সাইকোপলিটিক্যাল’ মডেলের সমাজে উন্নীত হয়েছি, সমাজ পরিগঠন এখন এই মডেলেই হচ্ছে। এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা দরকার ছিল বলে আমার মনে হয়। আরেকটা বিষয় বলা দরকার – সাইবার বুলিং, ফেক নিউজ ছড়ানো, এগুলো যে গতিতে ছড়ায় ও মানুষকে আবেগমথিত, রাগান্বিত বা পারসেপশন গঠনে ভূমিকা রাখে কয়েক মুহূর্তের সুযোগেই, ফ্যাক্টচেকিং কিন্তু তার শত ভাগের একভাগ গতিতেও মানুষের কাছে পৌঁছায় না! ফলে যে পদ্ধতিতে ফ্যাক্টচেক করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আগে টেলিভিশনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের নিউজ বুলেটিন, *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

‘বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎকে কিছুটা এনজিওধর্মী চোখে দেখা হয়েছে’

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আপনি বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। এই দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আলতাফ পারভেজ: এই প্রতিবেদনের ভাগ্য মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে গেছে। কারণ জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের আলোচনায় এই বিষয়টি ছিল না। এই কমিশনের প্রধান (কামাল আহমেদ) নিজেই সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তারা যত সুপারিশ দিয়েছেন, তার একটিও বিবেচনা করা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমরা মূলত একটি মৃত বিষয়ের ওপর কথা বলছি। তবে প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো অবশ্যই জীবন্ত। কিন্তু যে লক্ষ্যে এই প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল, সেই লক্ষ্য আপাতত আর জীবন্ত নেই। তা সত্ত্বেও এই প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়গুলো এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে যে সংকট, বাস্তবতা ও সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। এই সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে অনেক বিষয় আছে। প্রথম যে বিষয়টি আমার চোখে পড়েছে, তা হলো কমিশন মনে করেছে যে গণমাধ্যম খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং করপোরেট উপস্থিতি একটি গড়পড়তা সমস্যা। আমার মনে হয় এখানে একটি দেখার ভুল হয়েছে।

দেখুন, বাংলাদেশের অন্যান্য খাতের মতো গণমাধ্যম খাতের বিকাশ ঘটাতেও পুঁজি দরকার। আমরা তো একটি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই আছি। কৃষি বা শিল্প খাতের মতো গণমাধ্যমেও বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমি একটা উদাহরণ দিই। আমাদের শৈশবে এখানে একটি মাত্র টিভি ছিল, বিটিভি। এখন প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি টিভি চ্যানেল আছে। আমি মনে করি, প্রবণতা হিসেবে এটি ভালো। এই ভালো প্রবণতা তৈরি হয়েছে বড় বিনিয়োগের কারণে। ৩০ থেকে ৪০ জন বিনিয়োগকারী এসেছেন বলেই এই বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা বিনিয়োগে নয়, পুঁজির উপস্থিতিতেও নয়। প্রশ্ন হলো এই পুঁজিকে রেগুলেট করা হচ্ছে কি না। পুঁজির

আলোকচিত্রী: তাশাদ্দুদ আহমেদ রাহিম

আলতাফ পারভেজ
লেখক ও গবেষক

বিকাশ ও জনগণের স্বার্থ কী বিপরীতমুখী হয়ে যাচ্ছে, নাকি একে অপরের সঙ্গে মিলছে? সমস্যাটা আসলে এখানেই।

এই জায়গায় এসে আমি মনে করি, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ধীরে ধীরে গণমাধ্যম না থেকে প্রচারমাধ্যমে পরিণত হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্র মূলত একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবেই রয়ে গেছে। এর আইনি ভিত্তি ১৭৯৩ সালের লর্ড কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্নওয়ালিসরা যে আইনগুলো তৈরি করেছিলেন, সেগুলো জনগণের মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম গড়ে তোলার জন্য ছিল না। বরং সেগুলো শাসকের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ছিল। সেই আইনগুলো এখনো রয়ে গেছে। তার মানে আজও বাঙালি কর্নওয়ালিসরা, ব্রিটিশ কর্নওয়ালিসদের তৈরি আইনের মাধ্যমে এই দেশ শাসন করছে। ফলে বাঙালি কর্নওয়ালিসদের স্বার্থটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই স্বার্থকে কীভাবে জনগণের স্বার্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এই প্রশ্নটাই ছিল গণমাধ্যম কমিশনের সামনে।

কমিশন কিছু জায়গায় করপোরেট ইন্টারেস্টের কথা ধরেছে ঠিকই, কিন্তু গণমাধ্যম সংস্কার আসলে রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে একেবারে ইন্টিগ্রেটেড একটি বিষয়। যেহেতু ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে, বেহাত হয়েছে, তাই গণমাধ্যম খাতেও কোনো সংস্কার হয়নি, সহসা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

আমাদের সমাজে জনগণ যে হেনস্তার শিকার হয়, তার বড় অংশই আসে ঔপনিবেশিক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো থেকে। সেই একই প্রশাসন আছে, সেই একই আইনগুলো রয়ে গেছে। ফলে গণমাধ্যম নতুন করে জনবান্ধব হবে, এটা টুকটাক এনজিওধর্মী সংস্কারের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল না, আর হয়ওনি। এই কারণে আমি বলব, এই সংস্কার কমিশনটিও ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা বা সফলতা নির্ভর করছিল জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, পুলিশ সংস্কার হচ্ছে কি না, তার ওপর। সেখানে আমলাতন্ত্র বরং শক্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে সব সংস্কার মোকাবিলা করতে পেরেছে, এবং তাদের বিজয় রথ অব্যাহত আছে। আইনি সংস্কার বাস্তবে কিছুই হয়নি।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আপনি বললেন যে এই প্রতিবেদনটা একটি মৃত প্রতিবেদন। যদি আমরা আশার দিকে যেতে চাই, বা কোনোভাবে যদি এই প্রতিবেদনের মধ্যে দম আনতে চাই পরবর্তী সরকারের কাছে এই প্রতিবেদনকে কোনোভাবে গুরুত্ব পাইয়ে দেওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কী?

আলতাফ পারভেজ: এটা তো একটা শুভকামনা বা শুভ ইচ্ছা হতে পারে যে পরবর্তী সরকার এই কমিশনসহ গণঅভ্যুত্থানকালীন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে ১১টি কমিশন করেছে, সেগুলোর সবকটিই বিবেচনা করবে। গণমাধ্যম কমিশনের সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশগুলোও বিবেচনা করবে। এগুলো আমরা আশা করতে পারি এবং এগুলো প্রয়োজনও। কিন্তু বাস্তবতা যদি অনুমান করি, তাহলে প্রশ্ন আসে। ধরুন, যিনি তথ্যমন্ত্রী হবেন, তিনি কি চাইবেন যে রেডিও, টিভির সংস্কার হোক। এই জায়গায় আমার সন্দেহ আছে, কারণ অতীতে তথ্যমন্ত্রীরা সেটা চাননি। অতীতের প্রধানমন্ত্রীরা এবং দলীয় সরকারগুলোও চাননি। ভবিষ্যতের সরকার কী চাইবে প্রশাসনের সংস্কার হোক? এখানেও আমার সন্দেহ আছে, কারণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই তা চায়নি, যাদের মেয়াদ ছিল এক দুই বছর, যারা দলীয় সরকার ছিল না। জনগণের কাছ থেকে যাদের প্রত্যাশা ছিল কিছু সংস্কার করা, এবং যারা নিজেরাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংস্কার করবে – সেই সরকারের অধীনেও তা হয়নি। আপনার কথা এই অর্থে ঠিক যে রাজনৈতিক সরকার যদি কোনো সংস্কার করে, সেটাই টেকসই হবে এবং সেটাই টিকে থাকবে। সেটাই তাদের দায়িত্বও। জনগণের ম্যান্ডেট আছে তাদের সংস্কার করার জন্য। জনগণও এবার চাইছে যে ভোটের পরে যারা সরকার গড়বে, তারা কিছু সংস্কার করবে।

কিন্তু আমার সন্দেহ থেকেই যায় যে এই কলোনিয়াল রাষ্ট্রের যে সুবিধা, কলোনিয়াল প্রশাসনের যে আরাম, সেখান থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করবে কি না। তারা ঝুঁকি নেবে কি না। তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেবে কি না, এই প্রশ্নগুলো থেকেই যায়। তবে আমি বলব, রাজনৈতিক সরকার যদি গণমাধ্যম সংস্কার করে এবং গণমাধ্যম জগতে আরও পেশাদারিত্ব তৈরি হয়, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, তাহলে সরকারেরই লাভ হয়। লাভটা কীভাবে হয়, একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। তখন যদি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কাজ করত, তাহলে যে দুর্ভিক্ষ আসছে, সেই খবরটা সরকার আগেভাগেই পেত। তখন দ্রুত চাল ডাল পাঠানো সম্ভব হতো। কিন্তু দলীয় প্রভাবাধীন বা বশংবদ গণমাধ্যম থাকার কারণে সেই তথ্যটি তখন আসেনি। স্বাধীন গণমাধ্যম আসলে একটি সক্রিয় বন্ধুর মতো কাজ করে। এটি সরকারের ডিফেন্স লাইনের মতো কাজ করে। কোথাও শত্রুতা তৈরি হচ্ছে, বিরুদ্ধ জনমত তৈরি হচ্ছে, বা রংপুরে কোনো সংকট তৈরি হয়েছে, এই খবরটি সরকার সবচেয়ে *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

‘সুপারিশগুলো দৃশ্যমান বৈষম্য কমাতে পারে, কিন্তু বাঙালি শ্রেষ্ঠত্ববাদ মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত’

সায়দিয়া গুলরুখ: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের প্রশ্নকে একত্রে একই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতার জনগোষ্ঠীকে একই ছাদের নিচে বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্তটিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ডালিয়া চাকমা: দেখুন, এখানে যেটি করা হয়েছে, অর্থাৎ ভিন্ন বাস্তবতার জনগোষ্ঠীকে একই ছাঁচে ফেলে বিশ্লেষণ করা, এই প্রশাসনিক সহজীকরণ কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সকল জননীতির ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। নীতি-নির্ধারকরা ভুলে যান One size fits all – চিন্তাপ্রসূত সমাধান বৈষম্য কমানোর বদলে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর লড়াই যখন সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং রাজনৈতিক এক্সেসিবিলিটি নিয়ে, তখন আদিবাসীদের লড়াই রাজনৈতিক স্বীকৃতি, ভূমি অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে। দুটো জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই যখন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাথে আদিবাসীদের একই ছাঁচে ফেলে দেখা হয়, তখন আদিবাসীদেরকে ‘জাতিগত সত্তা’র চেয়ে তাদের অনগ্রসরতা বা বিশেষ চাহিদার দিকটি মুখ্য হয়ে উঠে – যা তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামকে লঘু করে দেখাতে পারে এবং আদিবাসী প্রশ্নকে মানবাধিকার বা কল্যাণমূলক ফ্রেমওয়ার্কে আটকে ফেলে।

এতে আসলে রাষ্ট্রের একপ্রকার দায়মুক্তিও ঘটে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উপর থেকে আদিবাসীদের ‘রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন’ বা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের চাপ কমে যায়। এই কারণে, এই ধরনের একই ছাঁচে ফেলে বিশ্লেষণের চেষ্টাকে আমি আদিবাসীদের অধিকারের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিরাজনীতিকরণ হিসেবে দেখি। তবে আমি বিশ্বাস করি, যে এগারোজন সদস্য

আলোকচিত্রী: দিয়াব মাহমুদ

ডালিয়া চাকমা
অধিকার কর্মী ও গবেষক

এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন ও সুপারিশমালা প্রস্তাব করেছেন তারা মহৎ উদ্দেশ্য থেকেই করেছেন। যেমন, মিডিয়াতে ‘আদিবাসী’ শব্দ ব্যবহারে বরাবরই যে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে তারা এই প্রতিবেদনে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে, সবচেয়ে ভালো হতো, যদি কমিটিতে আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব থাকত। আমরা আজকাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির কথা বলে থাকি, যার প্রধান শর্তই কিন্তু ‘প্রতিনিধিত্ব’ থাকা, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা সংকটের প্রেক্ষাপটে নিজেদের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই কমিটিতে আদিবাসী কিংবা প্রতিবন্ধিদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকলে হয়তো তারা এই দুই জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার ভিন্নতাকে অ্যাড্রেস করতে পারতেন।

সায়দিয়া গুলরুখ: কমিশনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আদিবাসী প্রশ্নকে অর্ন্তভুক্তি এবং পরিবেশনের প্রসঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছে। বৈষম্যমুলক এবং ছাঁচবদ্ধ (স্টিরিওটিপিক্যাল) পরিবেশনকে মোকাবিলার জন্য আদিবাসীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া বা গণমাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য ন্যূনতম সম্প্রচার সময়সীমা নির্ধারণ করার কথাসহ নানা পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অসম জাতিগত সম্পর্ক অর্থাৎ, বাঙালি আধিপত্যের দৃষ্টিভঙ্গী মোকাবিলায় এই সুপারিশগুলোকে কতটা কার্যকরী বলে আপনি বিবেচনা করেন?

ডালিয়া চাকমা: একজন আদিবাসী সাংবাদিক নিয়োগ পেলেই সংবাদমাধ্যমের চরিত্র পাল্টায় না। নিয়োগে অগ্রাধিকার দিলে মিডিয়াতে আদিবাসী মুখ হয়তো দেখা যাবে কিন্তু মিডিয়া হাউজের যে ক্ষমতা কাঠামো তা যদি বাঙালিদের হাতে থাকে – তাহলে সেই আদিবাসী সাংবাদিককে ‘বাঙালি আধিপত্যবাদী ন্যারেটিভ’ এর মধ্যেই কাজ করতে হবে। আবার, অনেক সময় দেখা যায় – আদিবাসী সাংবাদিককে কেবল আদিবাসী অনুষ্ঠান কভার করার জন্যই রাখা হয় (ghettoization)। যতদিন পর্যন্ত না একজন আদিবাসী সাংবাদিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক সংবাদ প্রচারের নীতি-নির্ধারক হচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত এই আধিপত্য বজায় থাকবে।

একই কথা ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুপারিশে ভাষার কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু ক্ষমতার কথা বলা হয়নি। বাঙালি আধিপত্যের মূলে রয়েছে, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব। যদি আদিবাসী ভাষায় সংবাদ প্রচারের সময় সেটিকে কেবল আদিবাসী সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য নামমাত্র প্রচার করা হয়, আদিবাসীদের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন ছাড়াই, তাতে আধিপত্য কাঠামোর কোনও পরিবর্তন হবে না। এই সীমাবদ্ধতার উত্তরণ ঘটাতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, কীভাবে তাদের আদিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে মিডিয়া অ্যাক্ট তৈরি করেছে, সেগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

ন্যূনতম সময়সীমা নির্ধারণ করে অনুষ্ঠান প্রচারের প্রস্তাবনা বিষয়ে আমার বিটিভির কথা মনে পড়ে গেল। ছোটোবেলায় দেখতাম সপ্তাহের কোনও একদিন বিকেলে পাহাড়িদের সংস্কৃতি হিসেবে দেখানো হতো নাচ-গান, খাবার। যেন, আমরা আদিবাসীরা সারাক্ষণ নাচ-গান করতে থাকি। আমাদের এখানকার মানুষগুলোর মৌলিক চাহিদার সংকট, বেকারত্ব, শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত স্কুল না থাকা এগুলো কোনোকালেই ওইসব অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়নি। অনেকেই মনে করেন, উপস্থিতি থাকলেই অন্তর্ভুক্তি হয়ে যায়। কিন্তু আপনার জীবনের কোন বিষয়টি জনসম্মুখে দেখানো হবে, তা যদি আমি ঠিক করে দেই, তাহলে তা একপ্রকার এজেন্সি কেড়ে নেয়া হয়। এজেন্সি ছাড়া উপস্থিতি আলংকরিক শোভা ছাড়া কিছু নয়। এ কারণে উপস্থিতির কথা যখন আসছে, এজেন্সির আলাপও আনতে হবে। যেমন, বিষয়বস্তু কী ঠিক করা হবে, কে ঠিক *৩৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

‘গণমাধ্যমকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখার প্রয়োজন আছে’

১৬-এর পৃষ্ঠার পর ধরা যাক ১০ বা ১৫ মিনিটের পুরো অংশটিকেই আমরা একটি কনটেন্ট হিসেবে ভাবতাম। পুরো পত্রিকাকেও একসময় একটি কনটেন্ট হিসেবে দেখা হতো। অর্থাৎ, আগে সংবাদমাধ্যমের মূল পণ্য ছিল ‘পুরো নিউজ প্রোগ্রাম’ বা ‘পুরো পত্রিকা। আলাদা কোনো সংবাদ বা ভিডিও তখন মূল্য রাখত না। এখন একটি আলাদা নিউজও নিজেই একটি কনটেন্ট হয়ে উঠছে, এবং সেটি দিয়েই আয় করা হচ্ছে। ডিজিটাল মিডিয়ায় এখন একটি ভিডিও ক্লিপ, একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বা এমনকি একটি ফেসবুক পোস্টও ‘কনটেন্ট’ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি কনটেন্ট আলাদাভাবে দর্শক টানে, ভিউ আনে, আয় করে। দেখা যাচ্ছে, বিনোদন বিভাগের একজন সাংবাদিক একটি নিউজ দিয়ে মিলিয়ন ভিউ এনে দিচ্ছেন, এবং তাকে সেইভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মানে, সাংবাদিকের মর্যাদা এখন আর শুধু তার লেখার গুণে নয়, বরং তার কনটেন্ট কতবার দেখা হয়েছে বা শেয়ার হয়েছে, সেটার ওপরেও নির্ভর করছে। এই কনটেন্টের বদল বা রূপান্তরটিও গণমাধ্যম কমিশনের মনোযোগের বাইরে থেকে গিয়েছে।

অধ্যাপক আ-আল মামুন: এখানেই বড় রকমের একটি ফাঁক থেকে গেছে। কনটেন্টের যে রূপান্তর (ট্রান্সফরমেশন) ঘটছে, এবং এর ফলে আমরা যে একটি ভালো ইন্ডাস্ট্রি পাব, এই আকাঙ্ক্ষাগুলো হয়তো বাস্তবায়িত হবে না। এই বাস্তবতা অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য। আমি সম্প্রতি একটি বই পড়ছিলাম, নিক ডেভিসের *ফ্ল্যাট আর্থ নিউজ*, এটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত। (নিক ডেভিস একজন ব্রিটিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিক, যিনি এই বইয়ে দেখিয়েছেন – কীভাবে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের খবরগুলো ক্রমে করপোরেট পিআর এজেন্সি ও কয়েকটি বড় সংবাদসংস্থার নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।) সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে কয়েকটি পিআর এজেন্সি এবং কিছু নিউজ এজেন্সি মিলেই সব নিউজ নিয়ন্ত্রণ করছে। শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও, এমনকি আমেরিকাতেও। একটি পিআর কনটেন্ট তৈরি করা হলো, সেটা দেওয়া হলো রয়টার্সকে, এখন রয়টার্স তো সেটি সবার কাছে পাঠাবে, ফলে সেই খবর সর্বত্র প্রচারিত হবে। (অর্থাৎ, অনেক সময় সংবাদ আর স্বাধীন অনুসন্ধান নয় – বরং করপোরেট বা সরকারি স্বার্থে তৈরি পিআর তথ্যই বিশ্বব্যাপী ‘খবর’ হিসেবে ছড়িয়ে যায়।)

এই যে রূপান্তরটা ঘটেছে ২০০৭-০৮ সালের পর থেকে, এর আগেও নোয়াম চমস্কি কাজ করেছেন, ১৯৯৮ সালে। (চমস্কি ও এডওয়ার্ড হারম্যান এর বিখ্যাত বই Manufacturing Consent-এ দেখিয়েছিলেন, সংবাদ কীভাবে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।) কিন্তু সেই সময়ে এই বাস্তবতা এতটা প্রকট ছিল না। যখন নিক ডেভিস বইটি লিখেছেন, তারপরেও ইংল্যান্ডের বাস্তবতা বদলে গেছে, আর বাংলাদেশের তো বটেই। এই বাস্তবতাটা আসলে আমাদের কমিশনের রিপোর্টে খুব বিস্তারিতভাবে আসেনি। ফলে, এখনকার মিডিয়া কোন বাস্তবতায় আছে, সেটি আমরা বুঝতে পারব না। মনে হবে, আমাদের মিডিয়া খুব খারাপ জায়গায় চলে গিয়েছিল, আর এই কাজগুলো করলে ভালো জায়গায় চলে আসবে, এমন একটি আকাঙ্ক্ষা রিপোর্টে দেখা যায়। অর্থাৎ, কমিশনের রিপোর্টে মিডিয়ার নৈতিক বা কাঠামোগত সংস্কারের কথা থাকলেও, বৈশ্বিক ডিজিটাল ইকোনমির প্রভাব, কনটেন্ট মনিটাইজেশন, অ্যালগরিদম-নির্ভর সাংবাদিকতার মতো জটিল বাস্তবতাগুলো অনুপস্থিত।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আওয়ামী আমলে সাংবাদিকরা নানা ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন। আইনি হয়রানি থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতন, জেল-জুলুম কিছুই বাদ যায়নি। সঙ্গতকারণেই কমিশন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন এবং সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের একটা খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু সাংবাদিকদের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গকে তেমন জোরারোপ করা হয় নাই। প্রেস কাউন্সিলকে পুনর্গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: আপনার পর্যবেক্ষণের সাথে আমি একমত। সাংবাদিকের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। শুধু একটি বিষয় আছে, যদি সেটাকে দায়বদ্ধতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে চান, সেটা হলো, মিডিয়া হাউজগুলো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার মানুষকে চাকরি দেবে। আমি মনে করি, এটা আসলে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে না। কারণ শিক্ষিত মানুষরাই আমাদের মিডিয়ায় বেশি চাকরি করে, এবং তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি অন্যায় কাজগুলো করেছে, আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তাই বলে।

ফলে, ‘শিক্ষিত, ডিগ্রিধারী মানুষই চাকরি পাবেন’, এই কথা না বলে বলা উচিত ছিল, সাংবাদিক হওয়ার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাংবাদিকের অবশ্যই রাজনৈতিক মতামতের স্বাধীনতা থাকবে। আমি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করতে পারি, কিংবা একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবসায় বিশ্বাস করতে পারি, যা মানুষের ভালো করে বলে মনে করি, বা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ধারণায় বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু যখন এসব প্রতিফলিত হয় নিউজ কনটেন্টের ভেতরে, এবং মিডিয়া হাউজ সেগুলোকে অনুমোদন দেয়, সেগুলো বিপজ্জনক। দায়বদ্ধতার জায়গাটা এখানে খুব স্পষ্ট নয়। একটা ভারসাম্যমূলক প্রতিবেদন কীভাবে করতে হয়, এমনকি সারফেইস রিপোর্টিংয়েও কোন কোন অ্যাঙ্গেল থাকা দরকার, তথ্য যাচাই করা – এগুলোর ঘাটতি প্রায় প্রতিটা সংবাদমাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে। সামাজিকমাধ্যমের একটা পোস্টকেই অনেক সময় নিউজ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, এমনকি পোস্টদাতার অনুমতি না নিয়েই। অনেক সময়, গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে ব্যক্তিগত ফোনকল ইন্টারসেপ্ট করে মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে – যা কোনভাবেই সাংবাদিকতা হিসেবে গণ্য হতে পারে না! কিন্তু মিডিয়াকর্মীদের অধিকাংশের নিউজের এই ‘সেন্স অব হাইজিন’ সম্পর্কে কোনও ধারণা নাই। সম্প্রতি একজন সম্পাদক আমাকে বলছিলেন – বাংলাদেশে এখন যদি কেউ একজন খুব উঁচু মানের একটা দৈনিক পত্রিকা করতেও চায়, পর্যাপ্ত দক্ষ সাংবাদিক খুঁজে পাবেন না! এই দিকগুলো গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে গুরুত্ব পেতে পারত।

মিডিয়া কমিশনের প্রস্তাবগুলো দেখে অনুমান করা যায়, ভবিষ্যতে কিছু নতুন বিধি-বিধান তৈরি হতে পারে, যেগুলোর মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে। প্রশিক্ষণের কথাও কিছু বলা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের পরিধি অত্যন্ত সীমিত, সেটি বাড়ানো দরকার। আমার মনে হয়, ইনটেনসিভ ট্রেনিংয়ের দিকেই যাওয়া উচিত। যে কেউ মিডিয়া হাউজে যোগ দিতে চাইলে, তাকে একটি ইনটেনসিভ ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এমন একটি ইনস্টিটিউশনাল ব্যবস্থাও থাকা উচিত, যেখানে যারা সাংবাদিক হতে চায়, তারা পাশ করার পর প্রশিক্ষণ নেবেন। সেই প্রশিক্ষণে যদি তারা যোগ্যতার সনদ (এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট) পান, তবে কোনো মিডিয়া হাউজ তাদের নিয়োগ দিতে পারবে। এভাবে করা গেলে হয়তো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

পাকিস্তানের উদাহরণ দিলে দেখা যাবে, তাদের মিডিয়া অনেক বেশি কার্যকর। সেখানে যারা মিডিয়া হাউজে কাজ করে, তারা খুব সচেতনভাবে কাজ করে। ভালো বেতন পায়, এবং তাদের অন্য কোনো দায় থাকে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, কোনো চিন্তা ছাড়াই অসংখ্য নিউজ পোর্টাল, সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাকে লাইসেন্স দেওয়া হলো, তার সাংবাদিককে খাওয়াবে কে?

লোকাল করেসপন্ডেন্টদের শুধু একটি কার্ড দেওয়া হয়। দৈনিক পত্রিকায় আগে যেমন লাইনেজ দেওয়া হতো, এখনও হয়তো দেওয়া হয়, কিন্তু সেগুলোতে সাংবাদিকের চাহিদা মেটে না। এক অর্থে মিডিয়ার মালিকরা না বলেও বলে দেয়, ‘তুমি একটি কার্ড পেয়েছ, যেমনভাবে পারো করেকম্মে খাও।’ এটা হতে দেওয়া ঠিক নয়। এখানেই আমার ধারণা, কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা (সেফগার্ড) খুব দরকার। এটা একধাপের বিষয় নয়। প্রথমত, মালিকানার প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন, যেভাবে অনিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন বণ্টন করা হয় বা সরকার ও বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এইগুলো যদি পরিবর্তন করা যায়, এবং নিয়মিতভাবে গুণগত মান যাচাই (কোয়ালিটি চেক) করা যায়, তাহলে একটি দায়বদ্ধতার কাঠামো তৈরি হতে পারে।

নইলে আমরা সাংবাদিকের কাছ থেকে দায়বদ্ধতা আশা করতে পারি না। কারণ প্রকৃত অর্থে সে সাংবাদিক হওয়ার উপযুক্তই নয়। আর সেই অনুপযুক্ত মানুষকেই মিডিয়াতে নিয়োগ দেওয়া হয়। আপনি দেখবেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে মিডিয়ার মালিকানা কীভাবে রূপান্তরিত হলো, এবং কারা কারা মিডিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ পদে গেল। বিষয়টি মনোযোগের দাবিদার। আগে প্রবণতা ছিল, আমি পেশাদার সাংবাদিক, আমি সাংবাদিক নেতাও, তাহলে আমি একটি পত্রিকার সম্পাদক হতে পারি। কিন্তু এখন যা ঘটছে, পেশাদার সাংবাদিকরা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাচ্ছেন না। বরং যাচ্ছেন সাংবাদিক নেতারা, জামায়াত ও বিএনপির নেতারা, যাদের সাংবাদিকতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই, এবং যারা সাংবাদিকতা থেকে অনেক বছর ধরেই বিচ্ছিন্ন। এই লোকগুলোর এখন সম্পাদক, সিএনই ইত্যাদি হওয়া আমার কাছে খুব বিপজ্জনক প্রবণতা বলে মনে হয়।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: পতিত সরকারের অনুগত সাংবাদিকগণ যারা নানাভাবে আওয়ামী বয়ান তৈরি করার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসন এবং নিপীড়নকে বৈধতা দিয়েছে, তাদের রিকনসিলিয়েশনের বিষয়টিও কমিশনের আলোচ্য ছিল না। এই বিষয়ে আপনার মতামত?

অধ্যাপক আ-আল মামুন: এটা তো শুধু মিডিয়ার ক্ষেত্রে নয়। এটা সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পুরো সমাজকেই একটি রিকনসিলিয়েশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আগে যে কেউ সরকারের বিরোধিতা করলে জামায়াত বা রাজাকার বলা হতো। এখন শাহবাগী, নাস্তিক বা ফ্যাসিবাদের দোসর, এসব ট্যাগ দেয়া হচ্ছে। এবং এসব বলে, আমি জানি যে, অনেক পেশাদার সাংবাদিক, যারা আগের আমলেও কোনো সুবিধা নেয়নি, তাদের বিপদে ফেলা হয়েছে। আগস্টের পরের সময়েও এরকম অনেক উদাহরণ আছে। ফলে, মিডিয়ার মধ্যে যে রিকনসিলিয়েশন দরকার ছিল, সেটা হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয়নি।

আমার মনে হয় কমিশনের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গটি থাকলে ভালো হতো। যেহেতু আমরা একটি ফ্যাসিস্ট বাস্তবতার মধ্যে দীর্ঘ সময় ছিলাম, তাই রিকনসিলিয়েশন একটি জরুরি প্রশ্ন। সাংবাদিকতার এই দিকগুলো দেখা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কমিশন এক বছর ধরে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজে লিপ্ত ছিল, তবু রিকনসিলিয়েশন না হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং সেক্ষেত্রে পেশাদার সাংবাদিকরা কীভাবে বিপদে পড়ছে, কিংবা পার্টিজান সাংবাদিকদের কীভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, এসব পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পার্টিজান তো থাকতে পারে; অনেকেই আছেন। কিন্তু অনেকেই তো অপরাধী নন। তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব বা জব্দ করা, এসব ঘটনা ঘটেছে। ফলে এগুলো প্রতিকারের সুপারিশ থাকতে পারত।

উদাহরণ স্বরূপ, প্রেসক্লাবের সদস্যপদ প্রক্রিয়া দেখুন, সদস্যপদ বন্ধ ছিল, পরে বাতিল করা হলো। তখন দেখা গেল ছাত্র-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কিছু লোকেরও অ্যাক্রিডিয়েশন কার্ড ছিল; যারা মন্ত্রিপরিষদে দালালি করত, তাদের কার্ড অবশ্যই বাতিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাতিলের প্রক্রিয়ায় অনেক পেশাদার সাংবাদিকও ভোগান্তিতে পড়েছেন, তাদের বাতিল হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এসব ঘটনা তো হরেদরে ঘটেছে। রিকনসিলিয়েশনের বদলে আমরা প্রতিশোধকে বেছে নিয়েছি। পূর্বেও প্রতিশোধের প্রক্রিয়া ছিল; এখন সেটি আরও জঘন্য রূপে ঘনীভূত হয়েছে। এটা একটি চক্র, আর এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: আপনাকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আ-আল মামুন: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, আর শুভকামনা হুযাইফা!

মীর হুযাইফা আল মামদূহ, এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১ অক্টোবর ২০২৫। পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি দৃকনিউজে প্রকাশিত হয়েছে।

‘মিডিয়ার পাঠকের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হলে নৈতিক সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই’

২৪-এর পৃষ্ঠার পর যদি একজন পাঠক বোঝে যে অমুক জায়গায় গেলে সে ভালো খবর পাবে, ভালো স্টোরি পাবে, ভালো এডিটোরিয়াল (সম্পাদকীয়) পাবে, পোস্ট-এডিটোরিয়ালে চিন্তার বৈচিত্র্য পাবে, তাহলে সে সেই পত্রিকাটাই পড়বে বা সেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মেই যাবে। আর যেখানে পাঠক বেশি যাবে, বিজ্ঞাপনদাতারাও সেখানে বিজ্ঞাপন দিতে চাইবে কারণ তারা চায় এমন জায়গা, যার মাধ্যমে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তখন সেই মিডিয়াটা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ভালো ব্যবসার মূল উপাদানই হচ্ছে ভালো সাংবাদিকতা। একইসঙ্গে ভালো সাংবাদিকতাই ভালো ব্যবসার গ্যারান্টি। আর যেহেতু ভালো সাংবাদিকতা করেই সে ব্যবসা করছে, সেহেতু ভালো সাংবাদিকতা করতে পারলেই সে চতুর্থ স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারবে। এখানে একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। তবে সম্পাদকীয় অবস্থানের বড় একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ এমন হতে পারে যে কোনো একটি সমাজে একটা বড় অংশের মানুষ রিগ্রেসিভ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমরা এই লক্ষণ দেখেছি। হিটলার তো নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছিল। সেই সময়ে কোনো পত্রিকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে অবস্থান নিলে সেটা মানবতারই বিরুদ্ধে যেত। ফলে পজিশন নেওয়ার প্রশ্নটা জটিল। কোন পত্রিকা কী অবস্থান নেবে, সেটা যার যার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তবে শেষ পর্যন্ত ভালো সাংবাদিকতার কোনও বিকল্প নেই। ভালো সাংবাদিকতাই তাকে ব্যবসায়িকভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে, আবার সেই ভালো সাংবাদিকতাই তাকে চতুর্থ স্তম্ভ হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: সামনের দিনে যে সাংবাদিকতা আসছে, সেখানে কী নিউজ এবং কনটেন্টের মধ্যে পার্থক্য আছে? যদি আমরা কনটেন্টকে পণ্য হিসেবে ধরি, পণ্য বিক্রি করে কী সাংবাদিকতা করা সম্ভব?

সাজ্জাদ শরিফ: এখানে অনেকগুলো স্তর আছে। আমি যদি প্রশ্নটা ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে এখন এমন একটা সময় আসছে, যেখানে শুধু কী লিখলাম, সেটা আর একমাত্র বিষয় নয়। কীভাবে পাঠককে যুক্ত করলাম, ক্লিকবেইট করলাম, কীভাবে কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করলাম – এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই জায়গাগুলোতেই আসলে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। আমি মনে করি প্রযুক্তি বদলাবে, মিডিয়ার অভ্যস্ততা বদলাবে। কিন্তু সাংবাদিকতার যে মৌলিক নীতি, সেটা থাকলেই সাংবাদিকতা টিকে থাকবে। এটা নষ্ট হলে সাংবাদিকতাও টিকবে না। বাংলাদেশে ভালো সাংবাদিকতার একটা ক্ষয় আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। পপুলিজমের কাছে যেমন রাজনীতি আত্মসমর্পণ করছে, তেমনি সাংবাদিকতাও অনেক ক্ষেত্রে পপুলিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এটা খুব বিপজ্জনক। তুমি যে একক কনটেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়ার কথা বললে, এবং সেটার মধ্য দিয়ে ব্যবসা করার কথা বললে – এর মধ্যে বড় বিপদ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করব না। একটা বিষয় পরিষ্কার – পৃথিবীর কোনো দেশেই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে অনলাইন মিডিয়া টিকছে না। তাদের কনটেন্ট বিক্রি করতেই হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, কনটেন্ট কীভাবে বিক্রি করবে। ক্লিকবেইট দিয়ে না কি অন্য কোনও পথে? আমি যদি বলি, সাবস্ক্রিপশন মডেলে যাব, সেটা সাধারণ সাংবাদিকতারই বিতরণের একটা সাব্যস্ত পথ। একক কনটেন্ট যিনি বিক্রি করছেন, তার কোনো সম্পাদক আছে কি না আমরা জানি না। এটার পথবিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। দীর্ঘস্থায়ী সময় ধরে কনটেন্ট বিক্রি করতে চাইলে পাঠকের আস্থা প্রয়োজন হবে। দুই-চারটা কনটেন্ট দিয়ে সেটা হবে না।

আর এখানেই সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সময়টা এখন ফ্লুইড। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সাংবাদিকতার চেহারাও ফ্লুইড হয়ে উঠছে। তুমি যদি ক্লিকবেইট দিয়ে কনটেন্ট বিক্রি করো, একটা সময়ে পাঠক বুঝে ফেলবে। তুমি যদি পপুলিজমে যাও, এক সময় পাঠক মুখ ফিরিয়ে নেবে। তুমি যদি ক্লিকবেইট না করে দায়িত্ববান সাংবাদিকতা করো, তাহলে হয়তো পাঠক কম হবে কিন্তু যারা থাকবে, তারা সিরিয়াস পাঠক। তারা টাকা দিয়ে হলেও তোমার স্টোরি পড়বে। সাবস্ক্রিপশন মডেলে যেতে হলে তোমাকে এমন কনটেন্ট দিতে হবে যেখানে নতুনত্ব আছে, অভিনবত্ব আছে, প্রাসঙ্গিকতা আছে, যেখানে নীতি-নৈতিকতা মানা হয়েছে, পাঠক যে লেখায় পটভূমি পায়, নতুন তথ্য পায় এবং পড়ার শেষে তৃপ্তি পায়। সেই স্টোরি হয়তো দশজনকে না টেনে পাঁচজনকে টানবে। কিন্তু যারা পড়বে তারা যথার্থ সাংবাদিকতার জন্য তৃষ্ণার্ত। শেষ পর্যন্ত সেটাই মিডিয়ার ভিত্তি।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: বিজ্ঞাপন তো নানাভাবে সাংবাদিকতাকে আকৃতি দেয়। একটা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখা থেকে বিরত রাখে – এরকম উদাহরণ তো আছে। আপনি বিজ্ঞাপন নির্ভরতার কথা বললেন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন নির্ভর হলে সাংবাদিকতা কম্প্রোমাইজ হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায় না?

সাজ্জাদ শরিফ: বিজ্ঞাপনের কারণে কারও বিরুদ্ধে না লেখার সিদ্ধান্ত যে কেউ কখনো নেয়নি, তেমন কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কোনো মিডিয়া হাউজ যদি এমন কাজ বারবার করতে থাকে, সেটা আর অপ্রকাশ্য থাকতে পারে না। তখন তাদের ওপর পাঠকের আস্থা চলে যায়। তাই কোনো মিডিয়া টেকসইভাবে পাঠকের ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে নৈতিক সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই। সাংবাদিকতা করতে গিয়েই হোক কিংবা বিজ্ঞাপন নিয়ে কিছু করতে গিয়েই হোক – একবার পাঠকের আস্থা হারালে, সেটা ফিরে পাওয়া কঠিন।

বাংলাদেশের মিডিয়াতে যদি ওমবাডসম্যান বা পাবলিক এডিটরের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে বেশ হতো। এসব নিয়ে ভাবার সময়টাই এসেছে। বহু পত্রিকার পক্ষেই ওমবাডসম্যান (ন্যায়পাল) রাখা খুব কঠিন। কিন্তু যদি সংবাদপত্র পরিষদের মাধ্যমে সবার জন্য একজন ওমবাডসম্যান রাখা যেত – একজন স্বাধীন ব্যক্তি, যিনি সব মিডিয়ার অর্থায়নে চলবেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করবেন, তাহলে তিনি কারও কাছে আলাদাভাবে দায়বদ্ধ থাকতেন না। এরকম কিছু হলে বাংলাদেশের মিডিয়ায় জন্য ভালো হতো।

সাজ্জাদ শরিফ দৈনিক প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক। মীর হুযাইফা আল-মামদূহ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ২ নভেম্বর ২০২৫।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

সামরিক-বেসামরিক নজরদারিতে বন্দী সাংবাদিকতা

রেং ইয়ং ম্রো

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কোন সংবাদে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সচরাচর মূলধারার গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয় না। বাংলাদেশে বস্তুনিষ্ঠ, জনস্বার্থে সাংবাদিকতার চর্চা শুধু পাহাড়ে চ্যালেঞ্জিং তা নয়, সমতলেও রয়েছে বাধা-বিপত্তি। তবে পাহাড়ে জনস্বার্থে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জগুলোর একটি স্বতন্ত্র মাত্রা রয়েছে। এখানে সংবাদ প্রবাহের উপর সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই রকম একটা নিয়ন্ত্রিত-নজরবন্দী বাস্তবতায় আদিবাসীদের জন্য সাংবাদিকতা পেশা সেখানে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, আবার আঞ্চলিক পর্যায়ে গণমাধ্যম বিকাশের পথও সংকুচিত। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে মূলধারার আলোচনায় এই বিষয়টি একেবারেই আলোচিত হয় না, কিন্তু পাহাড়ের আদিবাসী সমাজে এই প্রশাসনিক নজরদারির বিষয়টি বহুলালোচিত। ২০২৫ সালে আদিবাসীদের বাৎসরিক পার্বণ ফুল বিঝুর দিনে চেঙ্গি নদীর তীরে একটা ব্যানারের স্লোগান থেকে এই বিষয়টি ক্ষণিকের জন্য জাতীয় মনোযোগে আসে। চেঙ্গী নদীর তীরে উত্থিত ব্যানারটিতে লেখা ছিলো, '*We do not want biased journalism.*' '*দুঃসময়ে সাংঘাতিক, সুসময়ে সাংবাদিক; ধিক, ধিক, ধিক।*' একটি ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের মাধ্যমে পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যমের জাতিগত পক্ষপাতকে প্রশ্ন করেন এবং আদিবাসীদের আনন্দ আয়োজনে সাংবাদিকদের অবাঞ্চিত ঘোষণা করেন।

এই পক্ষপাতমূলক রিপোর্টিংয়ের একটা উদাহরণ দেই। পার্বত্য তিন জেলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় অভিবাসিত বা সেটলার কলোনিয়াল নীতিতে পুর্নবাসিত বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর দ্বারা আদিবাসী গ্রাম, ঘর-বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার খবরের শিরোনামে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা অস্পষ্টতা রক্ষা করা হয়, 'পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষে শতাধিক বাড়ি পুড়ে ছাই,' 'সংঘাতে অশান্ত পাহাড়' অথবা 'এখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে পাহাড়ে।' এই শিরোনামগুলোতে 'সংঘর্ষ', 'সংঘাত' এবং 'থমথম' ধারণাগুলোর ব্যবহার ঢাকনার মতন কাজ করে, কিছু প্রশ্নকে হাওয়া করে দেয়। আক্রমণকারী কে? কার বাড়ি পুড়ে গেল? ঘটনার সূত্রপাতে কার দায়? এখানে পক্ষ কয়টি, শুধুই কী পাহাড়ি-বাঙালি? স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন কী একটি পক্ষ ছিল? – এই প্রশ্নের উত্তরগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্পষ্ট রাখা হয় এবং আদিবাসীদের ঐতিহাসিক প্রান্তিকতা এবং বাঙালি-আদিবাসীর মধ্যে অসমতার, নিপীড়নের সম্পর্ককে অদৃশ্য করা হয়।

কিন্তু আমার এই লেখার মূল মনোযোগ অন্য জায়গায়। আমি মূলত তথ্য প্রবাহ, সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের উপর সামরিক- বেসামরিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই। খাগাড়াছড়িতে যে পক্ষপাতমূলক সাংবাদিকতাকে ধিক্কার জানানো হলো, এই ধরনের সাংবাদিকতার ব্যবস্থাটাকে আমি উন্মোচন করতে চাই। এই প্রসঙ্গে *বিশ্ব আদিবাসী দিবস* ২০২৫ উপলক্ষ্যে দেয়া একটি ফেসবুক পোস্টে চাকমা সার্কেলের উপদেষ্টা রাণী ইয়েন ইয়েন 'পাহাড়ে সত্যকে গুম' করার কথা লিখেছিলেন। এই আলোচনায় তাঁর স্পষ্টোক্তির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এখানে উদ্ধৃত করছি:

পাহাড়ের আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় দমন নিপীড়ন চালু রাখার একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য প্রবাহকে কব্জা করে রাখা। পাহাড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোতে হয় মিডিয়াকে নীরব রাখা হয়, নতুবা সত্যকে পুরোপুরি আড়াল করে মিথ্যে তথ্য প্রকাশ করা হয়, অথবা কিছু আনুষঙ্গিক সত্য তথ্য রেখে বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়।... সত্য গুম করে রাখতে পারলে মিথ্যেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে, মানুষের চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত একটি প্রক্রিয়া। একারণে যখন ১৩ বছরের বম শিশু জুমে [বাগানে] সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যায় আর মিডিয়া প্রকাশ করে যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় গোলাগুলিতে সন্ত্রাসী মারা গিয়েছে, সাধারণ [বাঙালি] জনগণ তখন উল্লসিত হয়, সন্ত্রাসী নিধনের জন্য সেনাবাহিনীকে বাহবা দেয়। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত শিশু হত্যার দাবি তোলাটাকেও তখন প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়।'

চিত্র: তুফান চাকমা

সত্য কীভাবে গুম করা হয়? কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তথ্য প্রবাহ কীভাবে নজরদারিতে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়? পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সেনা-নিয়ন্ত্রিত এলাকা (military occupied territory)। এখানে দুইটি প্রধান আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিকে সমর্থন ও প্রত্যাখানকে কেন্দ্র করে একটি স্থায়ী সহিংসতার বাস্তবতা আছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থায়ী সহিংসতার বিস্তারিত ইতিহাস লেখার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদিবাসী সাংবাদিক যখন পাহাড়ের সামরিক বাহিনীর নিপীড়নের, মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন তৈরি করেন, তখন কি ঘটে? ২০২১ সালে প্রকাশিত দৃকের গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা *সাংবাদিক প্রতিদিন*-এ 'দুই প্রজন্মের পাহাড়ী সাংবাদিকের কথোপকথন' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই কথোপকথনে একটা উত্তর পাওয়া যায়:

তরুণ সাংবাদিক: পাহাড়ে সাংবাদিকতা করছেন ডাক আসেনি এমনতো হয় না? আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনে কবার ডাক এসেছে?

প্রবীণ সাংবাদিক: আমাকে তো গুলি করে হত্যা করা হবে এমন হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। একটা জায়গা থেকে আমাকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। বলেছিল, এইগুলো নিয়ে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, বেশি যদি রিপোর্ট করেন, তাহলে যদি গুলি করে হত্যা করে পরে যদি চালিয়ে দেয়া হয় যে সন্ত্রাসীদের গুলিতে অমুক সাংবাদিক নিহত। এই ধরনের কথা পর্যন্ত ডেকে নিয়ে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে।

বলাই বাহুল্য নিরাপত্তার স্বার্থে তরুণ ও প্রবীণ সাংবাদিকের নাম *সাংবাদিক প্রতিদিনে* প্রকাশিত হয়নি। আদিবাসী স্থানীয় সাংবাদিকরা যারা সরাসরি সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠান সেই সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন এই কথোপকথনে দেখলাম সাংবাদিকরা '[সামরিক ক্যাম্পে] ডেকে নিয়ে যাওয়ার কথা' বলছেন। ডাক পড়া, হুমকি এড়িয়ে নিরাপদে সাংবাদিক হওয়ার পথ হলো, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের দৃষ্টিতে উন্নয়ন ও সম্প্রীতির খবর প্রকাশ করা। এই স্ক্রীপ্টের বাইরে গেলেই ডাক পড়ার ঝুঁকি থাকবে। একজন স্থানীয় সাংবাদিক যখন পাহাড়ে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ব্যপ্তি বা 'আধুনিক' কৃষির ধারা নিয়ে ইতিবাচক প্রতিবেদন তৈরি করেন, সেই প্রতিবেদন প্রচারে কোনও বাধা নেই। যেমন ধরুন, *পাহাড়ে ড্রাগনের [ড্রাগন ফল] হাতছানি*, *বান্দরবানে ড্রাগন [ফল] চাষে কোটি টাকা আয়ের স্বপ্ন* অথবা *পাহাড়ে নতুন নতুন উদ্যোক্তার হাতছানিতে সৃজিত ড্রাগন ফুলে-ফলে সুশোভিত মানিকছড়ির বাগান*। এই কৃষি শিল্পের বিকাশের জন্য আদিবাসীদের স্বকীয় জীবনধারা ক্ষতিগ্রস্ত, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিবেদন কিন্তু চোখে পড়ে না। তার মানে আবৃত আধাসত্য প্রকাশে তেমন বাধা নেই।

সংবাদপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয়পন্থা হলো সংবাদে কী কী ছাপা হবে সেটা ঘটনাসমেত সরবরাহ করে দেওয়া হয়। মূলধারার গণমাধ্যমে প্রায় নিয়মিত পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে 'পাহাড়ী সন্ত্রাসী' দের আস্তানা খুঁজে পাওয়া ও অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদের গ্রেফতার করার খবর প্রচার করে। এসব ক্ষেত্রে আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নির্মিত বয়ানকে প্রচার করে এবং এই প্রচারণার থেকে স্থানীয় আদিবাসীদের অভিজ্ঞতার বয়ান ভিন্ন। যেমন, ২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর চন্দনাইশ থানার আমতলী পাহাড়ি এলাকা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ছয় জন পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের আটক হওয়ার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় (*যুগান্তর, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, দেশ রূপান্তর, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, banglanews24.com, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫*)। স্থানীয় একটি অনলাইন সংবাদ পোর্টালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চন্দনাইশ ক্যাম্পের একজন ক্যাপ্টেন দাবি করেন, 'আটককৃতরা স্বীকার করেছেন পাহাড়ি সন্ত্রাসী দলের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে।' (*Cplustv, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, দৈনিক নতুন চন্দনাইশ নিউজ ২৪, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫*) স্থানীয় আদিবাসী ও বাঙালি অধিবাসীদের ভাষ্য মতে, বন্য শূকরের কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় স্থানীয় খামারিরা তাদেরকে শিকারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আটককৃতরা মূলত সেখানে শিকারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। জব্দকৃত 'অস্ত্র ও গোলাবারুদে'র ছবিতেও একটি গাঁদা বন্দুক, দুইটি গুলতি ও নিত্য ব্যবহার্য তিনটি দা দেখা যায়। স্থানীয়দের দাবি, জব্দকৃত অস্ত্রগুলো শিকারের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ হাতিয়ার। এই সকল অভিযানের ক্ষেত্রে আইএসপিআর সরবরাহকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তি হুবহু ছেপে দেওয়াটাই রেওয়াজ।

সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সরবরাহকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তথ্যের যাচাই করার প্রচেষ্টা সাধারণত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে চোখে পড়ে না। এমনকি যে বয়ানগুলো পড়া মাত্রই মনে প্রশ্ন তৈরি হবে সেগুলোও নির্দ্বিধায় প্রচারিত হয়। যেমন, চট্টগ্রামের কোনও একটা পোশাক কারখানায় কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) পোশাক উদ্ধারের খবর। ২০২৫ সালের মে মাসে চট্টগ্রামের একটি পোশাক কারখানা থেকে কয়েক ধাপে ৫০ হাজারেরও বেশি কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সামরিক পোশাক উদ্ধারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এই খবরটি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দুটো প্রশ্ন জাগে: প্রথমত, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, কেএনএফ-এর সামরিক শাখার সদস্য সংখ্যা সাড়ে তিনশ থেকে চারশ'র মতো হতে পারে (*বিবিসি ৫ এপ্রিল, ২০২৪, সমকাল ৭ এপ্রিল, ২০২৪*)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেএনএফ বিভিন্ন সময় নিজেদের সদস্য সংখ্যা ৪ হাজারের অধিক বলে দাবি করেছে (*জাগোনিউজ২৪ডটকম, ০৮ এপ্রিল ২০২৪*)। এই সাড়ে তিনশ থেকে চারশ কিংবা ৪ হাজারের বেশি সংখ্যক কেএনএফ কি আদৌ ৫০ হাজার পোশাক বানানোর ফরমায়েশ দিয়েছিল? দ্বিতীয়ত, আইএসপিআর এর বয়ান অনুযায়ী কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টে বম, পাংখোয়া, লুসাই, খুমি, ম্রো এবং খেয়াং কমিউনিটি থেকে সদস্য আছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তর পরিচালিত ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে এই সাতটি জনগোষ্ঠীর সর্বমোট সংখ্যা হলো ৭৬,৪৯১ জন। 'কেএনএফ ইস্যু'তে সবচেয়ে নিগৃহীত জনগোষ্ঠী হলো বম, রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডায় বম ব্যক্তি মাত্রই কেএনএফ এর সাথে যুক্ত ধরে নেয়া হয়। এই প্রোপাগান্ডার শিকার বম নাগরিকরা বর্তমানে নির্বিচারে গ্রেফতার থেকে শুরু করে নানা ধরনের হয়রানি, নিপীড়নের শিকার। বাংলাদেশে বম আদিবাসীদের জনসংখ্যা হল ১৩,১৯৩। তাহলে প্রশ্ন জাগে, কেএনএফ-এর ৫০,০০০ সামরিক পোশাক বানানোর খবরটি প্রকাশ করার আগে একজন সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের তথ্যসূত্র এবং ঘটনার প্রেক্ষাপট যাচাই করার প্রয়োজন ছিল কি না? প্রকাশিত এই সংবাদগুলোর ফলোআপ কোনও সংবাদও পরবর্তীতে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি পাহাড়ের সংবাদমাধ্যমের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা থেকে আর যাই হোক আদিবাসীদের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার খবর পাওয়া যায় না। ●

রেং ইয়ং ম্রো একজন গবেষক ও রাজনৈতিক কর্মী।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে হয়রানি ও আওয়ামী ট্যাগের হুমকি

১১-এর পৃষ্ঠার পর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, 'যদি সরাসরি কেউ হত্যার প্ররোচনা দেয়, বা হত্যা সংঘঠিত করার জন্য কোনো উসকানি দেয়, তাদের কোনো বক্তব্য বা তাদের কোনো কার্যক্রম যদি সেটার শামিল ধরে নেওয়া হয় তখন একটি বিষয়। কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে সেরকম প্রমাণ এখন পর্যন্ত নেই। যে মামলাগুলো আছে সবই তো তদন্তাধীন অবস্থায়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) কিছু মামলা হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য মামলা যে আইসিটির বাইরে হয়েছে সেখানে তো কোনো অগ্রগতিই নেই। এই তদন্তগুলো কী প্রক্রিয়ায় চলছে সেটা খুব পরিষ্কার না। এমন কথাও আমরা শুনছি আদালতের ভেতরে ও বাহিরে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত তদন্ত শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে রাখা হবে, এবং তদন্ত কখন শেষ হবে, কীভাবে শেষ হবে, কী হচ্ছে এই সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনাবিচারে আটকে রাখা – এটাই তো একধরনের অপরাধ।'

বর্তমান আইনমন্ত্রী ও অন্তর্বর্তী সরকারের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, 'উনি একজন দক্ষ আইনজীবী ও অনেক অভিজ্ঞ। আমাদের বিচারব্যবস্থা কীভাবে চলে, হয়রানিগুলো কী কী উনি সবচেয়ে ভালো জানেন। উনি জানেন, বিচার পাওয়া কত কঠিন, কতটা প্রতিকূল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়।'

'আমরা যদি সত্যিই আগের আমল (আওয়ামী লীগের শাসনব্যবস্থা) থেকে একটা পরিবর্তন দেখতে চাই, সে অনুযায়ী কাজ হওয়া উচিৎ। কখন আপনি একজনকে জামিন দেবেন না, সেই বিষয়গুলোতো পরিষ্কার করতে হবে। যদি কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকে বা হুমকি থাকে বা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই বিষয়ে তো নানা নির্দেশ দেওয়া যায়, বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে, আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশনা থাকতে পারে। জেলে আটকে কেন রাখতে হবে? কারা হেফাজতে তো অনেক মৃত্যুর উদাহরণ ও আছে। এই দায়-দায়িত্ব কে নেবে?' এসব প্রশ্ন করেন, সারা হোসেন।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াটিকে বিতর্কিত করে ফেলা হয়েছে মন্তব্য করে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বিচারের নামে এই যে প্রতিশোধের প্রক্রিয়াটা শুরু হলো, এর মাধ্যমে সব পক্ষই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন। মিথ্যা মামলায় পরিবারগুলো হয়রানির শিকার হচ্ছেন, জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যারা প্রকৃত অর্থেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ও ভিকটিম পরিবারগুলো যে বিচারের আশায় বুক বেঁধে আছেন সেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও দুরূহ হয়ে গেল। পুরো বিচারপ্রক্রিয়ায় একটা আস্থাহীনতার সংকট তৈরি হলো।'

৭ অক্টোবর ২০২৪, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জানায়, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে আট সদস্যের কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) এবং সদস্যসচিব হিসেবে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রেস)। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি (জেলা জজ পদমর্যাদার), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কমিটির কাজ ছিল গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ করা এবং সময়ে সময়ে মামলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। তবে এই কমিটি তাদের কার্যক্রমে অনীহা প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে কমিটির সদস্য বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, 'আমাদের দিক থেকে সুপারিশ ছিল যে আমরা আইন-আদালত বা তদন্তকারী সংস্থা না। ফলে এটা আইন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত; তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। আর নীতিগতভাবে আমাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছি যে আমরা এই ধরনের মামলার পক্ষে না। অর্থাৎ, পিআইবি'র মহাপরিচালক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়, এই বক্তব্য পেশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠান।'

রুয়ান্ডা গণহত্যায় (১৯৯৪) কয়েকটি পত্রিকা এবং রেডিওর সাংবাদিক, সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের একটা বিশেষ আদালতে বিচার হয়েছিল। বাংলাদেশে এই সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখা হলো না কেন প্রশ্নের জবাবে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের যদি সদিচ্ছা, সততা ও সাহস থাকত ও সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও কৌশল থাকত তাহলে অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারপ্রক্রিয়া সম্ভব ছিল।'

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন বলেন, 'জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল থেকে যখন জুলাই মানবতাবিরোধী অপরাধের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, সেই রিপোর্ট ও আমরা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পেয়েছি। আমরা তো জাতিসংঘের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি কার্যকর প্রচেষ্টায় যেতে পারতাম। আমাদের আরও সুযোগ ছিল যে যারা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, মূল পরিকল্পনাকারী, নির্দেশদাতা তারা তো বিদেশে পালিয়ে গেছেন ও যেখানে অবস্থান করছেন সেসব দেশেও বিচার করা যায়। ইন্টেরিম সে ধরনের কোনো চেষ্টা করেছে কি না, এগুলো স্পষ্ট নয়।'

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হয়, অনেক নতুন প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে ভিকটিম পরিবারগুলোর সম্পূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের একটি সুযোগ থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে সেই সুযোগ একেবারেই তৈরি হয়নি বলেও জানান, ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ* পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর সাংবাদিকদের বিচারিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'মোসাহেবি করা, সুযোগ-সুবিধা নেওয়া অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু সেটা খুনের অপরাধ নয়। আর যদি তা খুনের সমান অপরাধ হয়, তার জন্য আপনি আইন বানান। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সেটা নাই, তাদেরকে খুনের মামলায় আটকে রাখার অধিকার রাষ্ট্রের নাই।'

সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অপব্যবহার

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ছাড়াও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অনেক সাংবাদিক মামলার শিকার হয়েছেন। গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনিস আলমগীরকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা আটক রাখার পর তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। প্রায় তিন মাস পর গত ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে তিনি জামিনে মুক্তি পান। উত্তরা পশ্চিম থানায় দায়েরকৃত এই মামলার বাদী জুলাই রেভ্যুলেশনারি অ্যালায়েন্সের কেন্দ্রীয় সংগঠক আরিয়ান আহমেদ।

এছাড়া জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনতা পার্টির মহাসচিব শওকত মাহমুদ সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় কারাগারে আছেন। এই আইনে কারাভোগ করে জামিন পেয়েছেন সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্না। আইনবহির্ভূতভাবে দীর্ঘসময় আটক রেখে পরে মিথ্যে মামলা দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় বলে অভিযোগ তার পরিবারের। সাংবাদিক পান্না ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ২৮ আগস্ট ২০২৫, 'মঞ্চ ৭১' নামে একটি সংগঠনের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই আলোচনা চলাকালে সেখানে হামলার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে আক্রান্তদের সুরক্ষা না দিয়ে উল্টো এই আলোচনায় অংশ নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সাবেক আমলা ও সাংবাদিকসহ বাকিদের তুলে নিয়ে যান। তাদেরকে দীর্ঘসময় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে আটক রাখা হয়। সাংবাদিকরা যোগাযোগ করতে থাকলে রাতে পুলিশ জানায় ১৪ জনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্না প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, 'একদম উদ্ভট একটা অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। কী করে একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্যে, বিশেষ করে যে আয়োজন প্রকাশ্যে করা হচ্ছে – লুকিয়ে লুকিয়ে তো কিছু করা হয়নি। ঢাকার একদম কেন্দ্রে, আগে ঘোষণা দিয়ে যে প্রোগ্রাম করা হয় তা কীভাবে ষড়যন্ত্র হয়। অভ্যুত্থানের সময় সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল, আমরা দেখেছি। অভ্যুত্থানের পর তো সে অধিকার ফিরে আসার কথা ছিল। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এখন পর্যন্ত এই মামলাগুলো চলমান আছে। তদন্ত চলছে। কিন্তু এই মামলাগুলো যে ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক সে বিবেচনায় প্রত্যাহারের কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখিনি।'

সাংবাদিক আনিস আলমগীর গ্রেপ্তারের পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশোধন করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। সংশোধনের পর থেকে এই আইনটি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে বলে অভিযোগ আনা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতা দমিয়ে রাখা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

সাংবাদিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ও কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এসব ঘটনায় একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করে। সিপিজে গ্রেপ্তারকৃত ও মামলার শিকার সাংবাদিকদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য – প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে চিঠি পাঠায়। পাশাপাশি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও হয়রানির ঘটনার অবসান চায় সিপিজে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস (আইএফজে) সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানায়।

সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে যেভাবে বিব্রতকর ও হয়রানিমূলক পরিবেশে সন্ধ্যার সময় একটি ব্যায়ামাগার থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে এনে ২৪ ঘণ্টা আটক রাখার পর গ্রেপ্তার দেখানো হয়, তা অনেক মানবাধিকারকর্মী আওয়ামী আমলের নিপীড়নের তরিকা হিসেবে উল্লেখ করেন।

সংবাদ সংগ্রহে সহিংস বাধা

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার শুনানির সময় বিচারকের সামনেই *সময় টিভি*-র প্রতিবেদক আসিফ হোসেন এবং অনলাইন *বাংলা আউটলুক* এর বিশেষ প্রতিনিধি মুক্তাদির রশিদ রোমিও আইনজীবীদের দ্বারা মারধর ও হয়রানির শিকার হন। আইনজীবী এ কে এম মহিউদ্দিন মাহি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন সাংবাদিকরা। ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা জানান, মহিউদ্দিন মাহির সহযোগীরা মারধর করতে থাকলে উপস্থিত অন্যান্য আইনজীবী ও সাংবাদিকরা তাদের রক্ষা করেন। আইনজীবী মহিউদ্দিন বিভিন্ন গণমাধ্যমে মারধরের কথা স্বীকার না করে শুধু কথা কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয়েছে বলে দাবি করেন। সাংবাদিক মারধরের এই ঘটনা ঘটেছে বিচারকের চোখের সামনে। এমন পরিস্থিতিতেও বিচারক নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং এজলাস থেকে নীরবে প্রস্থান করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, কাকরাইলের এইচআর ভবনে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী বকেয়া বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পরিশোধের দাবিতে দৈনিক *ভোরের কাগজ* থেকে চাকরিচ্যুত সংবাদকর্মীরা অবরোধ করলে হামলার শিকার হন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এই পত্রিকার মালিক ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর দলবল লাঠিসোটা নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে অন্তত ৮ জন সংবাদকর্মী আহত হন।

৫ জুন ২০২৫, রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের দৃশ্য ডিজিটাল মাধ্যমে লাইভ করার সময় পুলিশের উপস্থিতিতেই টার্মিনাল শ্রমিকদের দ্বারা হামলার শিকার হন দৈনিক *কালের কণ্ঠে*-র মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রাইয়ান হোসাইন। ৩০ আগস্ট ২০২৫, হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান থেকে কাঠ পাচারের তথ্য সংগ্রহ ও পাচারের মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করলে পাচারকারী দুইজন রেঞ্জ কর্মকর্তার হামলার শিকার হন দৈনিক কালবেলা-র সাংবাদিক মুজাহিদ মসি ও স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক ত্রিপুরারি দেবনাথ।

৩১ আগস্ট ২০২৫, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'স্থানীয়'দের সংঘর্ষের ঘটনায় খবর সংগ্রহের সময় ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টারে*-র দুই সাংবাদিক সিফায়েত উল্লাহ সিফাত ও মাহফুজ আহমেদের ওপর হামলা হয়। একই দিন রাজধানীর মতিঝিলে *ডিবিসি নিউজে*-র সাংবাদিক রেদওয়ানুল হক এবং দৈনিক কালবেলার সাংবাদিক এ জেড ভুঁইয়া আনাসের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা হয়।

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের সংঘর্ষে ১ জন নিহত হওয়ার ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করার সময়, হামলার শিকার হন *এখন টেলিভিশনে*-র চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান হোসাইন জিয়াদ এবং চিত্রসাংবাদিক মো. পারভেজ। জানা যায়, ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর প্রায় ৫০-৬০ জন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। তাদের সঙ্গে থাকা ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ভাঙচুর হয় ক্যামেরা। গুরুতর আহত অবস্থায় জিয়াদ ও পারভেজকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

৯ জানুয়ারি ২০২৬, লক্ষ্মীপুরে দৈনিক *নয়াদিগন্ত* পত্রিকার মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার তারেক মাহমুদ সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। পত্রিকাটিতে আহত সাংবাদিক তারেক মাহমুদ জানান, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তার চোখ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বারবার চাবি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এই আক্রমণের সময় এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় বিএনপি কর্মী কিরণ ও ফরিদ এই হামলার নেতৃত্বে ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনায় দুইজন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অন্যান্যদের খোঁজে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল হক।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনগত হয়রানি ও সকল ধরনের নিপীড়ন প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'এটি পুরো গণমাধ্যমের জন্য একটি বার্তা যেমন তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে, কিংবা অপরাধ সেক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে – এরকম ঢালাওভাবে অধিকার হরণের জায়গায় নিয়ে যায় তখন কিন্তু পুরো গণমাধ্যমকে নজরদারিতে নিয়ে আসা হয় ও একধরনের হুমকি, ভয়-ভীতির পরিবেশ তৈরি করা হয়।'

রাজধানীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী গ্রাফিতি। (ছবিটি কোন এলাকায় এবং কত তারিখে তোলা সেই তথ্য হারিয়ে গেছে)।

আলোকচিত্রী: সনি রামানি

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

'হাইব্রিড রেজিমের যুগে, হাইব্রিড মিডিয়া সিস্টেমে ওয়ান মিডিয়া, ওয়ান ওনার থিওরি আর খাটে না'

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: গণমাধ্যম কমিশনের রিপোর্টকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? সুপারিশগুলো কি বাস্তবায়নযোগ্যভাবে করা হয়েছে বলে মনে করেন? অনেক সুপারিশই মনে হয়েছে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় কার্যকর করা সম্ভব না। যেমন ক্রস ওনারশিপ নিষিদ্ধ করা, একাধিক মিডিয়ার মালিকদের কাছ থেকে মিডিয়া সরিয়ে নেওয়া। এই সময় এসে এসব কী আদৌ সম্ভব?

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: প্রথম কথা হলো, সংস্কার কমিশনের রিপোর্টটাকে মোটা দাগে দেখলে বলতে হবে – এটা একটা ভালো উদ্যোগ। আমাদের দেশে আগেও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন হয়েছে, কিন্তু কোনোটা বাস্তবায়িত হয়নি। যেকোনো রিপোর্টেই সব চাহিদা একসাথে পাওয়া যায় না। কেউ যদি দশটা পয়েন্ট চায়, হয়তো আটটা পাওয়া যাবে। সেই বিবেচনায় উদ্যোগটা খারাপ ছিল না। কিন্তু গণমাধ্যম সংস্কার করতে গেলে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, গণমাধ্যম একটা সিস্টেম। পৃথিবীতে এমন কোনো গণমাধ্যম সিস্টেম নেই, যেটা কোনো দেশের রাজনৈতিক কাঠামো থেকে আলাদা। আপনি যদি গণমাধ্যমকে সিস্টেম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপনাকে ম্যাক্রো লেভেলে চিন্তা করতে হবে। আমার কাছে মনে হয়েছে, উইথ ডিউ রেসপেক্ট – এই সংস্কার রিপোর্টটা খুব মাইক্রো লেভেলে করা। সাংবাদিকের বেতন, নিরাপত্তা, মালিকানা – এসব অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু

ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এগুলো পুরো সিস্টেমের খুব ছোট অংশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সিস্টেম নিজেই ইউনিক। পৃথিবীর আর কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। এর কারণ, আমরা নিজের রাজনৈতিক সিস্টেমের ওপর আস্থা রাখতে পারি না।

আপনি নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করলেই মিডিয়া সংস্কার হয়ে যাবে – এটা হয় না। সংস্কার করতে চাইলে রাজনৈতিক সিস্টেমের ছাঁচ বদলাতে হবে। কারণ এই দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি – সবকিছুই রাজনৈতিক সিস্টেমের অধীনে চলে। যতক্ষণ আপনি রাজনৈতিক সিস্টেমকে বুঝবেন না, ততক্ষণ মিডিয়া সিস্টেমের প্রকৃতি ধরতে পারবেন না। আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন ক্রস ওনারশিপ। পৃথিবীর সব দেশেই কোনো না কোনোভাবে এটা আছে। দক্ষিণ ইউরোপে পার্টি প্রেস (দলীয় সংবাদমাধ্যম) খুবই ওপেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এখানে দলীয় পত্রিকা আছে, অথচ তারা কখনো প্রকাশ্যে বলে না যে তারা পার্টি প্রেস। নীতিটা হওয়া উচিত ছিল – পার্টি প্রেস থাকতে পারবে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত – যে কোনো দলের মুখপাত্র মিডিয়া থাকতে পারে। পাঠক দেখবে কী দেখবে না, সেটা পাঠকের ব্যাপার। আপনি বিএনপির পক্ষে কথা বলছে বলে কোনো পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন – এটা গণতান্ত্রিক চিন্তা না। রাজনৈতিকভাবে ডেমোক্রেসি আনতে হলে এই জায়গাটায় আসতেই হবে। মিডিয়া সিস্টেমেরই অংশ।

এখন প্রশ্ন হলো, ক্রস ওনারশিপ কেন বাস্তবে বন্ধ করা যায় না? কারণ প্রতিটি বিনিয়োগই কোনো না কোনো ইন্টেনশন নিয়ে আসে। সরকার নিজেও একটা ইন্টেনশন নিয়েই যে কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। বিটিভি কি নিরপেক্ষ? কেন না? কারণ রাজনৈতিক সিস্টেমে সরকারের প্রোপাগান্ডা টুল দরকার। এখানেই মূল সমস্যা। তাই শুধু বিটিভি সংস্কার করলেই মিডিয়া সংস্কার হবে না। আপনি যা করতে পারতেন – বিটিভিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনের বাইরে এনে রাষ্ট্রপতির অধীনে দেওয়া। এর বাইরে বাস্তব কোনো পরিবর্তন হবে না। শুধু বলা যে, একসময় এটা বিবিসির আদলে করা হয়েছিল, আবার সেদিকে ফিরিয়ে নিতে চাই, এভাবে হবে না। কারণ রাজনৈতিক সিস্টেম আলাদা, বাস্তবতা আলাদা।

এই রিপোর্টটা মাইক্রো লেভেলের হওয়ার আরেকটা কারণ হলো – ওনারা বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিচ্ছেন, ইন্দোনেশিয়া বা অন্য দেশ। সেখানে মিডিয়ার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব থাকে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে। মিডিয়া তার বিনিময়ে লাইসেন্স পায়। বাংলাদেশেও লাইসেন্স পায়। কিন্তু বাংলাদেশে মিডিয়া শুধু রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে চলে না – এখানে মিডিয়া সরকারের ক্লায়েন্ট। যদি মিডিয়া কেবল রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে চলত, তাহলে ২০০৬ সালে যেসব চ্যানেল ছিল, সেগুলো খোলাখুলি বিএনপির *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

শেষবেলায় অধ্যাদেশ, হেলায় হারানো সংস্কার

মনোয়ারুল ইসলাম

দেশের বিপর্যস্ত গণমাধ্যম খাত রক্ষায় ও সত্যিকার অর্থে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন আকারের বিষদ রূপরেখাটি জমা দেওয়ার আজ প্রায় দশ মাস হতে চললেও, জবাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অবলম্বন করা সকল পন্থায় সংস্কারের চেয়ে বিলম্ব, বিচ্যুতি ও অবক্ষয়ের ছবিই আশঙ্কাজনকভাবে বিদ্যমান। ন্যাশনাল মিডিয়া কমিশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৬ ও ব্রডকাস্ট কমিশন অর্ডিন্যান্স, একদম শেষ মুহূর্তে উন্মোচিত এ দু'টি খসড়া অধ্যাদেশ কোনোভাবেই বহুল প্রতিশ্রুত কাঠামোগত সংস্কারের প্রতিফলন তো নয়ই, বরং তারা খোলামেলাভাবে দেখায় কত সহজেই বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ উপেক্ষা করে, কীভাবে একটি সংস্কার প্রক্রিয়া পরিণত হতে পারে অন্তঃসারশূন্য, পরামর্শবিহীন ও গ্রহণযোগ্যতাবিহীন এক ফাঁপা, লোকদেখানো আনুষ্ঠানিক অনুশীলনে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা জোরদার করার বদলে, এই খসড়া অধ্যাদেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করে আসা – সেই নির্বাহী নিয়ন্ত্রণকেই আরও পোক্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন কোনো তাৎক্ষণিক বা প্রতীকী উদ্যোগ না। অন্তর্বর্তী সরকার এই কমিশন গঠন করার পর – টানা কয়েক মাস ধারাবাহিকভাবে অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ, তুলনামূলক গবেষণা এবং গভীর আইনি বিশ্লেষণ শেষে গত বছরের মার্চ মাসে কমিশনটি তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। সেই প্রতিবেদনের মূলে যে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব ছিল তা হলো একটি একীভূত, স্বাধীন ও স্বশাসিত বাংলাদেশ মিডিয়া কমিশন গঠন, যা হবে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য উদাহরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমিশনটি বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল ও সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে একত্র করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রস্তাব করে, যা আর্থিকভাবে স্বাধীন এবং রাষ্ট্রের কাছে নয়, বরং আপামর জনগণ ও খোদ গণমাধ্যম পেশাটির আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। কিন্তু প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও বাস্তবায়িত হয়নি কমিশনের এই সুপারিশগুলোর একটিও। উল্টো, কর্তৃপক্ষ দুটি পৃথক কমিশন গঠনের পথে এগিয়েছে, যা শুধু সংস্কার কমিশনের মূল প্রস্তাবকে উপেক্ষাই করে না, বরং তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। খণ্ডিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সেই সমস্যা যার সমাধান করতে শুরু হয়েছিল এই সংস্কার প্রক্রিয়া।

এমনিতেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম খাত একাধিক কর্তৃত্বের সংঘাত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও নির্বাহী হস্তক্ষেপে জর্জরিত, অন্যদিকে আছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের হাতে লাইসেন্স ও মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে অতিমাত্রার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ ইতোমধ্যেই সতর্ক করেছেন, একই কাজের ক্ষেত্রে দুটো পৃথক কমিশন গঠন বরং জটিলতা বাড়াবে এবং আদতে কার্যকারিতা হারানোর ঝুঁকি থেকে যায় – যেমনটি আমরা প্রেস কাউন্সিলের ক্ষেত্রে দেখেছি। কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারার কারণে সংস্কার কমিশন প্রেস কাউন্সিলকে বিলুপ্ত করার পরামর্শও দিয়েছে।

একইভাবে উদ্বেগজনক হলো, প্রস্তাবিত কাঠামোগুলোতে সত্যিকার স্বাধীনতার অভাব। খসড়া অধ্যাদেশগুলো গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত মডেলের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিকভাবে এমন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করে, যা কার্যত শক্তপোক্তভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণেই নতজানু থাকবে। ব্রডকাস্ট কমিশন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী, কমিশনার নিয়োগের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটির অন্তত তিনজনই সরাসরি আমলাতন্ত্র থেকে আসবেন। এই কমিটিতে থাকবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, সম্প্রচার খাতে অন্তত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুই ব্যক্তি, এবং একজন অতিরিক্ত সচিব, যিনি সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। একই ধরনের আমলাতন্ত্র-প্রধান বাছাই কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে জাতীয় মুদ্রণ ও অনলাইন গণমাধ্যম তদারককারী ন্যাশনাল মিডিয়া কমিশনের ক্ষেত্রেও। এ ধরনের বন্দোবস্ত খোদ স্বাধীনতার মৌলিক ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

যখন আমলারা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নির্ধারক ভূমিকা পালন করেন এবং যখন সরকারই সেসব কমিশনারদের পদমর্যাদা, বেতন, সুযোগ-সুবিধা, সদর দপ্তর ও শাখা কার্যালয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় – তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে, এমন দাবি জিইয়ে রাখা কঠিন। সংস্কার কমিশন এর বদলে প্রস্তাব করেছিল একটি আর্থিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা পরিচালিত হবে গণমাধ্যমের আয় থেকে নেয়া একটি সামান্য শুল্ক দ্বারা এবং শতভাগ শর্তহীন সরকারি অনুদান দ্বারা। এই প্রস্তাবটিকে নীরবেই বেমালুম বর্জন করা হয়েছে।

এর চেয়েও অধিক উদ্বেগজনক হলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের খসড়া অধ্যাদেশগুলোতে সংস্কার কমিশনের যে বিষয়গুলো সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন নিজেই দুটি বিস্তারিত আইনগত খসড়া প্রস্তুত করেছিল, বাংলাদেশ মিডিয়া কমিশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৫ ও সাংবাদিক অধিকার সুরক্ষা অর্ডিন্যান্স, ২০২৫, যা কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা এবং সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করার লক্ষ্যে তৈরি। এসব খসড়ায় প্রস্তাব ছিল দণ্ডিত অপরাধী ও ঋণখেলাপিদের গণমাধ্যমের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে রাখা, কার্যকর নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপবিহীন স্বাধীনভাবে সম্প্রচার ও অনলাইন লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণ এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক চাপ বা নির্বিচারে বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিকারের লক্ষ্যে স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বর্তমান খসড়া অধ্যাদেশে এসব প্রস্তাবের কোনো চিহ্নই নেই।

সাংবাদিকদের জন্য প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ সব সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোও বাদ দেয়া হয়েছে। সংস্কার কমিশন সাংবাদিকদের গোপনীয়তা রক্ষায় স্পষ্ট বিধান, বিশেষ করে অবৈধভাবে বাড়িতে প্রবেশ ও সম্পত্তি জব্দের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হুমকি বা হয়রানির জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান প্রস্তাব করেছিল, যার মধ্যে জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবহির্ভূত উভয় পক্ষ দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা, জবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শন থেকে সাংবাদিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের ওপর স্পষ্ট দায়িত্ব আরোপের কথা বলা হয়েছিল। অথচ এসবের বদলে এখানে কেবল রয়েছে দণ্ডবিধির বিদ্যমান ধারার কিছু অস্পষ্ট উল্লেখ, যা আমাদের বাস্তবতায় – যেখানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা হরদম বিচারহীনই রয়ে যায়, সেখানে কোনও উন্নত, বাড়তি প্রতিরোধ তৈরি করে না।

বিষয়বস্তুর মতো প্রক্রিয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ, আর এখানেও সরকার ব্যর্থ। দেশের গণমাধ্যমকে ঢেলে সাজাবে এমন পুনর্গঠনের অধ্যাদেশের ওপর জনমত দেওয়ার জন্য, মাত্র তিন দিন ধার্য করা ছিল একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এটি স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার মৌলিক নীতিকেই খাটো করে। আরও গুরুতর হলো, অধ্যাদেশ তৈরির কোনো পর্যায়েই গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। কমিশনের বিশেষজ্ঞদের স্ব স্ব পারদর্শিতার প্রতি এহেন অবহেলা, অনীহা দেখে প্রশ্ন জাগে – আদৌ এই সংস্কার প্রক্রিয়ার আন্তরিক বাস্তবায়নের কোনও সদিচ্ছা কী ছিল কখনো?

প্রধান অংশীজনরাও ন্যায্যভাবেই অধ্যাদেশ দু'টো, তাদের বিষয়বস্তু এবং পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে সম্পাদক পরিষদ, খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও অনুমোদনের জন্য ঠিক যেই মুহূর্তে বেছে নেওয়া হলো – তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, কাঠামো ও বিধানগুলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার বদলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর আশঙ্কাই তৈরি করছে। একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

এই পদক্ষেপটি নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সময় বেছে নিয়েছে তা আমাদের আশঙ্কাকে তীব্র করে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন এবং তার পরপরই এক সম্পূর্ণ নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের যে দোদুল্যমান, অনিশ্চিত প্রেক্ষাপট – সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার মেয়াদের আখেরি প্রহরে এসে হুলস্থুল করে অধ্যাদেশ জারি করা অপ্রয়োজনীয়, অদূরদর্শী ও কিঞ্চিৎ হঠকারী হিসেবেই ধরা দেয়। এমন কি স্বয়ং তথ্য উপদেষ্টা স্বীকার করেন যে, অবশিষ্ট সময়ে কমিশনগুলো গঠন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়, ঐকমত্য, স্বচ্ছতা ও নিশ্চয়তার বালাই উড়িয়ে দিয়ে হুড়োহুড়ি করে কেনইবা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত?

এ কথা স্পষ্ট, গণমাধ্যম সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন ও অনিবার্য। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, মালিকানার কেন্দ্রীকরণ ও কুক্ষিগতকরণ, প্রতিকূল কর্মপরিবেশ ও ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকা সম্পাদকীয় স্বাধীনতার সংকটে বাংলাদেশের গণমাধ্যম জর্জরিত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৩৯ 'চিন্তা, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' নিশ্চিত করার কথা বললেও, শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ছাড়া এসব সাংবিধানিক নিশ্চয়তা অর্থহীন। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সুসংহত, নীতিনিষ্ঠ ও দেশীয় বাস্তবতা দ্বারা লব্ধ কাঠামো প্রস্তাব করেছিল। সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো পাশ কাটিয়ে বরং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার ও তোষণের পক্ষে এক জোড়াতালি পন্থাকে গ্রহণ করে সরকার আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের এক বিরল সুযোগ নষ্ট করে।

অধ্যাদেশ দিয়ে সংস্কার, বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে এসে ও কোনও প্রকার পরামর্শবিহীন অধ্যাদেশ দিয়ে সংস্কার অসম্ভব। সরকার যদি সত্যিই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তবে এইসব তড়িঘড়ি প্রক্রিয়া স্থগিত করতে হবে। সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ আমলে নিয়ে তা নিয়ে অর্থবহ সংলাপে বসতে হবে, এবং মূল সুপারিশ অনুযায়ী একটি একক ও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন মিডিয়া কমিশন গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি সুপারিশগুলোতে ছাড় দিলে, অধ্যাদেশগুলো যে সমস্যা সমাধানের দাবি করছে, সেগুলোকেই দীর্ঘায়িত করবে, এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকার নিয়ে যে সন্দেহ ও অনাস্থা, তা আরও ঘনীভূত করবে। ●

মনোয়ারুল ইসলাম ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ এর একজন সহকারী সম্পাদক। লেখাটি ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, নিউ এজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদ করেছেন রিয়াসাত সালেকিন।

দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ের ধ্বংসস্তূপে একজন সাংবাদিক। কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫। *আলোকচিত্রী: আব্দুল গনি*

দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ

‘অন্তর্বর্তী সরকারের দায়মুক্তির সংস্কৃতির ফল’

নিজস্ব প্রতিবেদক

২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাতে দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো* ও *দ্য ডেইলি স্টার* সংঘবদ্ধ হামলার শিকার হয়। পত্রিকা দুটির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ডেইলি স্টারে প্রায় ২৮ জন সাংবাদিক জ্বলন্ত ভবনে কয়েক ঘণ্টা আটকা পড়ে ছিলেন। সংঘবদ্ধ আক্রমণকারী গোষ্ঠী ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কার্যক্রমেও বাধা দেয়।

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পুলিশ প্রশাসনের আচরণ এবং বক্তব্যে বোধ হয়, তারা ঘটনার আকস্মিকতায় যথাযথ ভূমিকা নিতে পারেনি। বাস্তবে ২০২৪ এর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকার পতনের কিছুদিন পর থেকেই পত্রিকা দুটোকে ‘ভারতীয় আধীপত্যবাদের সমর্থক’ হিসেবে টার্গেট করা হয়।

২১ নভেম্বর ২০২৪

প্রথম আলো-কে ভারতীয় দালাল আখ্যা দিয়ে পত্রিকাটির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

২২ নভেম্বর ২০২৪

দ্য ডেইলি স্টার এর সামনে জুম্মার নামাজ আদায় করেন একটি দল। পাশাপাশি বিক্ষোভ পালনের মধ্য দিয়ে ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ‘গরু জবাই’ করে জিয়াফত কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। একইসঙ্গে ফেইসবুকে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কারওরান বাজারে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার কার্যালয়ের সামনে ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ‘বাংলাদেশের জনগণ’ এর ব্যানারে ‘জোড়া গরু জবেহ’ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এই পত্রিকাগুলো ‘ভারতের দালাল’ ও ‘ফ্যাশিস্টের দোসর’ – ‘তওবা’ করানোর জন্য গরু জবাইয়ের মাধ্যমে ‘জিয়াফত’ পালন করা হয়েছে। রাতে একপর্যায়ে পুলিশি ধাওয়ায় ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন তারা।

তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম একটি বেসরকারি টেলিভিশনে তার ক্ষমতাসীন সময়ে এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘তারা যখন ভায়োলেন্ট (সহিংস) হচ্ছে আমরা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করছি। এখন কেউ যদি বাইরে গিয়ে গরু জবাই করেন সেটা কি আপনি ঠেকাতে পারবেন?’

একইসঙ্গে এই ঘটনাকে তিনি ‘মব’ না বলে ‘মবের মতো আচরণ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

১২ ডিসেম্বর ২০২৫

ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ঢাকার রামপুরা এলাকার অন্যতম সংঘটক ও অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী রাজনীতিতে সোচ্চার, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন। তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে *ডেইলি স্টার*, *প্রথম আলো*, ছায়ানট ও উদিচীকে টার্গেট করে ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানো হয়।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

১৯ ডিসেম্বর রাত ৯টার পর শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে *দ্য ডেইলি স্টার* ও *প্রথম আলো*-তে হামলার আহ্বান জানানো হয়। হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগে জড়ো হয় সমর্থক-সহযোদ্ধারা। রাত ১১টার পর হঠাৎ সেখান থেকেই হামলাকারী একটি দল এসে হাজির হয় কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ের সামনে। অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাটসহ শুরু হয় সহিংস কর্মকাণ্ড।

প্রথম আলো ভবনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর পর হামলাকারীরা পৌঁছায় *দ্য ডেইলি স্টার* কার্যালয়ের সামনে। প্রাণের ভয়ে ডেইলি স্টার ভবনের ছাদে আটকে পড়েন ২৮ জন সংবাদকর্মী। আক্রমণকারীরা ‘নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর’, ‘ভারতীয় দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘ধইরা ধইরা জবাই কর’ স্লোগান দিচ্ছিলেন বলেও জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

প্রায় ৩ ঘণ্টা পর রাত ২টার দিকে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর দেখা মেলে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) *প্রথম আলো* কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। আনুমানিক রাত ২টা ৩০ মিনিটে, ফায়ার সার্ভিস ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

আশা করা হয়েছিল ১৮ই ডিসেম্বরের অগ্নিকাণ্ডের পর সরকার নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটবে এবং সরকার এই টার্গেটেড প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করবে। কিন্তু তা ঘটেনি – পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে, কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটেও প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম, বগুড়া, রাজশাহী ও বরিশালের কার্যালয়েও হামলার চেষ্টা হয়।

পরবর্তীতে *দ্য ডেইলি স্টার* ও *ডিসমিসল্যাব* ৩ হাজার ৬৪টি ফেসবুক পোস্ট বিশ্লেষণ করে দেখেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, এমনকি মাসজুড়ে হুমকি আসছিল, হামলার পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল। (ডেইলি স্টার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)।

এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত আইরিন খান যথাযথই বলেছেন, ‘এসব হামলা হঠাৎ করে ঘটেনি। দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা এবং গণমাধ্যম ও শিল্পের স্বাধীনতা সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার ফল।’ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতিতে এ কথা বলেন তিনি।

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার এই নিষ্ক্রিয়তার নীতি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সক্রিয়তাকে নিশ্চিত করার জন্যই অবলম্বন করেছিল কী? – এই প্রশ্নটাও উত্থাপন করা জরুরী।

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে যৌন হয়রানি

অভিযোগ সেল গঠনে কাঠামোগত অবহেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে নিবন্ধিত ও প্রকাশিত অনলাইন সংবাদমাধ্যম *ঢাকা স্ট্রিম* এর সংবাদকর্মী স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমে যৌন হয়রানির বিষয়টি আবারও কিছুদিনের জন্য জনপরিসরে আলোচনায় আসে। স্বর্ণময়ী বিশ্বাস *ঢাকা স্ট্রিম*-এ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতেন। ১৮ অক্টোবর ২০২৫, সন্ধ্যায় রাজধানীর সোবহানবাগ এলাকায় তিনি নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেন। দরজা ভেঙে পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর খবরের প্রেক্ষাপটে তার সহকর্মীদের মাধ্যমে কর্মস্থলে যৌন হয়রানির অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসে। ফেসবুকে প্রকাশিত এই অভিযোগ থেকে জানা যায়, ১৩ জুলাই ২০২৫, ঢাকা স্ট্রিমের ২৮ জন সংবাদকর্মী পোর্টালের বাংলা বিভাগের সম্পাদক আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সম্পাদক বরাবর দরখাস্ত করেন। এর মধ্যে ৭ জন নারী সহকর্মীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। অন্যান্যরা এই অভিযোগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ৭ জন নারী অভিযোগকারীদের একজন স্বর্ণময়ী বিশ্বাস। এই নারী সংবাদকর্মীদের আনীত অভিযোগ, আলতাফ শাহনেওয়াজ নারী সহকর্মীদেরকে যৌনাত্মক মন্তব্য করতেন এবং তাদের যৌন সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন।

স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের মৃত্যুর পর এই বিষয়টি সামনে এনে তার সহকর্মীরা ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি অনিষ্পন্ন যৌন হয়রানির অভিযোগের সাথে স্বর্ণময়ীর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে কি না – তা তদন্তের দাবিও উঠে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মীদের মতে, স্বর্ণময়ীর আত্মহত্যার একমাত্র কারণ আলতাফ শাহনেওয়াজ নন। কিন্তু যৌন হয়রানির অভিযোগের মাত্র ৩ মাসের মাথায় সহকর্মীকে হারিয়ে তাদের উপলব্ধি এই যে – অভিযুক্ত আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে *ঢাকা স্ট্রিম* কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। যা স্বর্ণময়ীকে মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে বলেও জানিয়েছেন তার সহকর্মীরা। এই ঘটনায় পরোক্ষভাবে *ঢাকা স্ট্রিম* কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের অনেকেই।

ঢাকা স্ট্রিমের বক্তব্য

ঘটনার দিন বিকেলে *ঢাকা স্ট্রিম*-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক পি এম সজল আহমেদের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়, আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে 'অসৌজন্যমূলক আচরণে'র প্রমাণ মেলেছে। এর ফলে আলতাফ শাহনেওয়াজকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং অভিযোগ তদন্তে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এসব সিদ্ধান্তে কর্মীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, তার মৃত্যুর সঙ্গে আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনো সম্পর্ক নেই। তিন মাস আগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও দাবি করে প্রতিষ্ঠানটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পরদিন ১৯ অক্টোবর ২০২৫, *ঢাকা স্ট্রিম*-এর সম্পাদক গোলাম ইফতেখার মাহমুদ এক বিবৃতিতে সহকর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে জানান–অভিযোগ এলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্তকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনে সহকর্মীদের সাথে আলতাফ শাহনেওয়াজের কিছু ক্ষেত্রে 'অসৌজন্যমূলক আচরণে'র প্রমাণ পাওয়া সাপেক্ষে অভিযুক্তকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।

২১ অক্টোবর ২০২৫, *ঢাকা স্ট্রিম*-এর ব্যাখ্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ২৪৩ জন নাগরিক একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিদাতারা আত্মহত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন। যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়ার পরও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় সংবাদমাধ্যমটির সম্পাদক, প্রকাশক, ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধানের ভূমিকা তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

নারী অধিকারকর্মীদের প্রতিবাদ ও পদক্ষেপ

কর্মস্থলে স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের অভিযোগ ও তার আত্মহননের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন। সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ২৬ অক্টোবর ২০২৫, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা স্ট্রিম-এর বিবৃতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে ১৯ অক্টোবর ২০২৫, পাঁচজন নারী অধিকারকর্মী পৃথকভাবে নিউজ পোর্টালটির প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক গোলাম ইফতেখার মাহমুদকে একটি চিঠি দেন এবং তাদের চিঠিটি ফেসবুকে প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন লেখক ও নৃবিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ, অধ্যাপক গীতিআরা নাসরীন, অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, সাংবাদিক ও গবেষক সায়দিয়া গুলরুখ ও অধ্যাপক সামিনা লুৎফা। এই দলটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাকে স্মরণ করিয়ে চিঠির মাধ্যমে *ঢাকা স্ট্রিম*-এর প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছে জানতে চান, যৌন হয়রানির অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আদেশ মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নিয়েছে? আরও জানতে চান, ঢাকা স্ট্রিমের 'বিবৃতিতে উল্লেখিত দুই সদস্যের তদন্ত কমিটিতে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী-পুরুষের অনুপাত রক্ষিত হয়েছিল কি-না বা বহিঃস্থ সদস্য ছিলেন কি না?... তদন্ত কমিটির কার্যপরিধি (টার্মস অফ রেফারেন্স) কী ছিল?' উত্তরে *ঢাকা স্ট্রিম* কর্তৃপক্ষ বলেন, 'অভিযোগ যৌন হয়রানির থাকলেও *ঢাকা স্ট্রিম* 'অসৌজন্যমূলক' আচরণের তদন্ত করে অভিযুক্তকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহার করেছেন।'

এই প্রতিষ্ঠানটির সংবাদকর্মীরা জানিয়েছেন, বার্তাকক্ষ থেকে অভিযুক্ত আলতাফ শাহনেওয়াজকে প্রত্যাহার করা হয়েছে তা বলা হলেও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শুধু বার্তাকক্ষ থেকে একজন অভিযুক্তকে প্রত্যাহার করাটা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আদৌ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নয়। কারণ এ ধরনের ঘটনায় অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্তের নিয়ম থাকলেও *ঢাকা স্ট্রিম* তা অনুসরণ করেনি। যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে এই পুরুষতান্ত্রিক ঔদাসিন্য, যৌন হয়রানি প্রশ্নে – *ঢাকা স্ট্রিম*-এর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এই চিঠির উত্তরে সম্পাদক গোলাম ইফতেখার মাহমুদ জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পাওয়ার দিনই একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন মরিয়ম আখতার সুমি (এক্সিকিউটিভ-এইচআর ও অ্যাডমিন) এবং পি এম সজল আহমেদ (হেড অব এইচআর)। নানাবিধ কারণে কমিটির গঠনপ্রক্রিয়া শ্রম আইন (সংশোধিত ২০২২)-এর শর্তগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন করা যে সম্ভব হয়নি, সে সম্পর্কে আমরা অবগত। এর জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।'

ঢাকা স্ট্রিম-এর যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষাপটে ১০ নভেম্বর ২০২৫, উপরোল্লিখিত ৫ জন নারী অধিকারকর্মী যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ নিউজপেপার মালিক সমিতি (নোয়াব), অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো), সম্পাদক পরিষদ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, এবং ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারকে (বিজেসি) চিঠি দেন। চিঠিতে তারা বলেন, '২০১১ সালে বাংলাদেশ নারী আইনজীবী সমিতির একটি রিট পিটিশনকে আমলে নিয়ে উচ্চ আদালত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে একটা বিস্তারিত নীতিমালা (গাইডলাইন) দিয়েছিলেন। উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও আমরা দেখছি বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমে যৌন হয়রানির অভিযোগকে অমীমাংসিত রেখে দেয়া হয় এবং নিউজরুমে নানাভাবে পুরুষালীপনাকে আস্কারা দেয়ার সংস্কৃতি বিরাজ করছে। *ঢাকা স্ট্রিম*-এর যৌন হয়রানির অভিযোগ এই বাস্তবতার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।'

আরও উল্লেখ করা হয় যে, যৌন হয়রানি বিরোধী নীতিমালা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সেল গঠন না করাকে নারী অধিকারকর্মীরা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন, তারা মালিক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটি উচ্চ আদালতের আদেশ অবমাননার সামিল। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পুরুষতান্ত্রিক ঔদাসিন্য শুধু *ঢাকা স্ট্রিম*-এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি নয়, বরং একই অবহেলা সকল সংবাদমাধ্যমের জন্যই প্রযোজ্য বলে জানিয়েছেন তারা।

নারী অধিকারকর্মীদের এই আহ্বানে সম্পাদক পরিষদের তৎকালীন সভাপ্রধান, *দ্য ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম ছাড়া আর কোনো সংগঠন থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সংবাদমাধ্যম সংশ্লিষ্ট মালিক, সম্পাদক ও উচ্চপদস্থ সাংবাদিকদের এসকল সংগঠন থেকে সংবাদমাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তাদের উদ্বেগ, করণীয় বা দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়ে কোনো ধরনের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এই আইন প্রণয়ন হলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রতিকারের জন্য শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, আইনের আশ্রয় নেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে ভেবে অনেক নারী সাংবাদিক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তবে অর্ন্তবর্তী সরকার শেষ মুহূর্তে খসড়াটির অনুমোদন করলেও অজ্ঞাত কারণে তা অধ্যাদেশ হিসাবে গৃহীত হয়নি।

অন্যদিকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর নারী সাংবাদিক কেন্দ্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী অধিকারকর্মীদের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, দায়িত্বটা মূলত রাষ্ট্রের। যাতে কর্মস্থলে যৌন হয়রানির ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ●

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

'মিডিয়া সমাজের বাইরে নয়, সমাজে নারীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রতিফলন মিডিয়ায় আছে'

আলোকচিত্র: শেখ সাবিহা আলমের সৌজন্যে

শেখ সাবিহা আলম

ঢাকা ব্যুরো প্রধান, এএফপি

আমি আসলে এক্সটেন্টটা বুঝতে চাই। আমি বিশ বছর ধরে সাংবাদিকতা করি এবং 'কাঠামোগত যৌন সহিংসতা' শব্দটায় আমার আপত্তি আছে। যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে, ঘটেও। কিন্তু সংখ্যাটা কেমন সে সম্পর্কে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই। আমি যা বলার চেষ্টা করছি, সেটা হলো মিডিয়া সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে একদম আলাদা কিছু নয়, আবার কিছুটা আলাদাও। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতি বৈষম্য আছে, নারীবিদ্বেষী মনোভাব আছে, কোথাও কোথাও নিপীড়নের অভিযোগও আছে। সংবাদমাধ্যমও তাই। নিপীড়ন নৈমিত্তিক ঘটনা, এটা আমি বিশ্বাস করি না।

আর আলাদা বলছি এই কারণে, সংবাদমাধ্যমে যারা কাজ করেন তারা 'অবলা' নন, বরং তারা অভিযোগ জানাতে পারেন, বা কথা বলতে পারেন। আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো এই অভিযোগ খুব ভালোভাবে হয়তো নেওয়া হয় না, আবার একেবারেই নেওয়া হয় না তাও না। নারীদেরকে কটাক্ষ করে বাজে কথা বলার কথাই যদি ধরি, এটা শুধু গণমাধ্যমেই ঘটে? এখানে আসলে গণমাধ্যমকে 'সিঙ্গেল-আউট' করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না। বাংলাদেশের কজন পুরুষ নারীবাদী? কতজন নারীই বা নারীবাদী?

'কাঠামোগত যৌনসহিংসতা' খুব ভারী শব্দ। এমনিতেই মিডিয়া নিয়ে নানারকম প্রচার-অপপ্রচার আছে। যখন 'মি টু' মুভমেন্ট হলো তখন সংবাদপত্র থেকে অভিযোগ খুব বেশি শুনিনি। তবে যৌন নিপীড়নের ঘটনা চেপে যেতে হবে সেটা আমি একেবারেই বলছি না। আমি কোনও অন্যায়ই চুপ করে সয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই, আর কর্মস্থলে 'যৌন হয়রানি' একটা জঘন্য অপরাধ। বার্তাকক্ষে আকছার যৌন হয়রানি হয় এটা বলার মধ্য দিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে আমি একটা ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম প্রশিক্ষক হিসেবে। সেখানে মেয়েদের মাথায় গেঁথেই আছে এই 'কাঠামোগত' ব্যাপারটা, যে মিডিয়া হাউসে সব ধর্ষকেরা বসে আছেন। কখন ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাদের এই দুর্ভাবনা। তখন তাদেরকে এটা বোঝাতেই আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে যে, সংবাদপত্র আলাদা কিছু না। তুমি সমাজে যা দেখ, সেটারই রিফ্লেকশন তুমি সংবাদপত্রে, মিডিয়া হাউজে দেখবে। এবং সংবাদপত্রে যেই মেয়েরা আছেন আমার মনে হয় তারা অনেক বেশি রেজিলিয়েন্ট।

সম্প্রতি বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর গবেষণা উদ্ধৃত করে বেশ কিছু গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে গণমাধ্যমের সাত-আটজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আমি জানতে চাই, ভুক্তভোগী কারা এবং কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কারণ এই তথ্য একটা অত্যন্ত ভয়াবহ তথ্য। এটা আমি সত্যি জানতে চাই, কারণ সাত-আটজন হলেও সেটা মিডিয়ার জন্য খুবই বড় ও ন্যক্কারজনক ঘটনা। দোষীদের অবশ্যই এ জন্য শাস্তি পেতে হবে। খুব এক্সট্রিম কেসের বাইরে সংবাদপত্রে কথাবার্তার যে আদান-প্রদান সেটাকে যৌন হয়রানি বলব না, আমি বলব জেন্ডার ইনসেন্সিটিভিটির দৃষ্টান্ত। নারীর জন্য বাস্তবতা আরও ভালো হবে, যদি বার্তাকক্ষে অনেক মেয়ে থাকে। সংবাদপত্রে জেন্ডার সেন্সিটিভ মেয়ে বেশি নিয়োগ দিতে হবে, তাহলে বার্তা কক্ষগুলো জেন্ডার সেন্সিটিভ হবে। কিন্তু সবগুলি সংবাদপত্রে জেন্ডার নীতিমালা নাই। বা হাইকোর্ট যে কমিটি করতে বলেছে, সেই কমিটিও নেই। বড় সংবাদপত্রগুলি ছাড়া। এখন অনেকে বলতে পারে যে এটা হাতি পালার মতো। প্রথম অলো-র বার্তাকক্ষে দুজন নারী সাংবাদিক আছেন, তারপরও তারা একটা কমিটি রেখেছেন। কমিটি বানানো যেমন জরুরি, একইভাবে জরুরি হচ্ছে পাঁচজনের কমিটি হলে দশটা মেয়ে রিপোর্টার নিয়োগ দেওয়া, সেই জায়গায় আমাদের অনেক ঘাটতি আছে, দুই দিকেই ঘাটতি আছে। পাঁচ জনের যৌন হয়রানির কমিটি আছে, কিন্তু দশটা রিপোর্টার নাই, এটাই হচ্ছে দুঃখ।

গণমাধ্যম কমিশন যদি এমন সুপারিশ করত যে সরকার গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়া-না দেয়া বিষয়টি নারী সাংবাদিক নিয়োগের সাথে শর্তযুক্ত করে দিত, বা নারীর নিয়োগের কারণে প্রতিষ্ঠান কিছু সুবিধা পাবে। যেমন, কমিশন যদি বলত আপনি যদি দশটা মেয়ে রিপোর্টার নেন তাহলে আপনি এতগুলি বিজ্ঞাপন পাবেন, নাহলে পাবেন না। এবং প্রতি বছর নীতিমালাটি মানা হয়েছে কি না তা রিভিউ করেন তাহলে সংবাদপত্রগুলো বাধ্য হবে নারী নিয়োগ দিতে। শুধু যৌন হয়রানি এবং এর প্রতিরোধে করণীয়র আলোচনার চক্করে পড়ে নারী সাংবাদিকের গণমাধ্যমে আসা এবং নারী নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি হয়।

আমরা বলছি গণমাধ্যমে লিডারশিপে নারী নাই। এন্ট্রি লেভেলেই তো নেই। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাংবাদিক সমিতিতে কয়টা মেয়ে আছে? গোড়ায় নাই, গোড়া কেটে আগায় পানি ঢাললে লাভ আছে? আমি আশা করেছিলাম যে কমিশনের রিপোর্টে এই বিষয়ে কিছু সুপারিশ থাকবে, যেন সংবাদপত্রগুলি মেয়েদেরকে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। আরও ভালো লাগবে গণমাধ্যম নিজেরাই যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মেয়েদের নিয়োগ দেয়। কারণ সরকারের সঙ্গে মাখামাখি যত কম করা যায় ততই ভালো। রিক্রুটমেন্টের সময় সংবাদপত্রগুলোই ঘোষণা দিক, এই প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ। ●

শেখ সাবিহা আলম এএফপির ঢাকা ব্যুরো প্রধান। লেখাটি গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের একাংশ এবং মতামত তার নিজস্ব। মীর হুযাইফা আল মামদূহ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১৯ এপ্রিল ২০২৬।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

‘মিডিয়ার পাঠকের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হলে নৈতিক সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই’

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: দেশের বহুলপঠিত দৈনিক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের রিপোর্টকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? সুপারিশমালাগুলো কী কার্যকর করা সম্ভব বলে মনে করেন?

সাজ্জাদ শরিফ: প্রথমত আমি এটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখতে চাই। কারণ বাংলাদেশে মিডিয়া নিয়ে কাঠামোগতভাবে খুব একটা ভাবা হয়নি। এখন কেবল একটা মিডিয়া কমিশনের রিপোর্টেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন প্রত্যাশা আমি করি না। এই রিপোর্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে, আবার অনেক বিষয় বাদও পড়েছে। বিশেষ করে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে নতুন বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে – নতুন প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া, এআই, এই পরিবর্তনগুলো সাংবাদিকতাকে যেভাবে নতুন ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো হয়তো আরও গভীরভাবে আলোচিত হতে পারত। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পরিস্থিতিকে আরও দ্রুত বিপুলভাবে বদলে দেবে। সামনে অভাবিত আরও বহু পরিবর্তন আসবে। বিষয়গুলো নিয়ে সারা বিশ্বই এখনো একটা ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে আছে। এই কমিশনের কাছ থেকে তাই খুব পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রস্তাব আশা করাও বাস্তবসম্মত নয়।

বাংলাদেশের বিদ্যমান মিডিয়া বাস্তবতায় রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, আমি সেটাকে গ্রহণযোগ্য একটি সূচনা হিসেবে দেখি। আমরা তো মিডিয়া হিসেবে অনেক পিছিয়ে আছি। একটি-দুটি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে বলা যায়, কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কাঠামোগতভাবে দুর্বল। এই বাস্তবতায় কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি অকার্যকর, তা আমি মনে করি না। আরও বেশি ও সুগভীর সুপারিশের কোনো শেষ সীমানা নেই। এটা সত্য যে রিপোর্টে কিছু উচ্চাভিলাষী সুপারিশ আছে। যেমন ক্রস

আলোকচিত্রী: নাসির আলী মামুন

সাজ্জাদ শরিফ
নির্বাহী সম্পাদক, প্রথম আলো

ওনারশিপ নিষিদ্ধ করা। বাস্তবে তো কেউ কেউ এই মালিকানা পেয়েই গেছে। একাধিক মিডিয়ার মালিকানা থাকার ফলে তারা এক ধরনের মিডিয়া-মনোপলির ক্ষমতা অর্জন করেছে। দেশের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপক ক্ষমতা তাদের হাতে চলে গেছে। এখন যদি এসব মালিকানার পেছনে দুর্বৃত্তায়িত অর্থ থাকে এবং সেই অর্থ ক্ষমতা-কাঠামোর দুষ্টচক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে তাদের দাপট প্রায় সীমাহীন হয়ে ওঠে। এটা একটা বিষাক্ত চক্রের মতো কাজ করে। যাদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ভালো, তারাই মূলত এ ধরনের মালিকানা পেয়ে এসেছে। সবাই পায়নি। আমি অনেকের কথা বলতে পারি যারা চেয়েও পায়নি। অর্থাৎ এখানে ক্ষমতার নিজস্ব পছন্দ কাজ করে – কে তাদের লোক, কে তাদের লোক নয়। ফলে সরকার যদি স্বৈরাচারী হয়, যারা মিডিয়ার এ ধরনের মালিকানা পেয়েছে, তারা সেই স্বৈরাচারকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আর তার বিনিময়ে তাদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা সুরক্ষিত থাকে। এখানে একটা স্পষ্ট আদান-প্রদান আছে। এই বাস্তবতায় কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে পারলে অবশ্যই ভালো হতো। প্রশ্ন হলো, যারা এরই মধ্যে এই অবস্থানে আছে, তাদের নিয়ে কী করা হবে? ভবিষ্যতে যে সরকার আসবে, তারা কী সাহস ও শক্তি নিয়ে এসব বড় পুঁজির বিরুদ্ধে যেতে পারবে?

আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালো কিছু বলে না। এমনকি নির্বাচিত সরকারগুলোকেও আমরা এ ধরনের বিষয়ে শক্ত ভূমিকা নিতে দেখিনি। ১৯৯০ সালের পর প্রথম কয়েকটি নির্বাচনকে তো আমরা গ্রহণযোগ্য বলতে পারি। সেসব সরকারও বড়, মন্দ পুঁজির সঙ্গে আপসই করে গেছে। যারা দুর্বৃত্তায়িত বড় পুঁজির মালিক, তারা সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে চট করে নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলে। আজ তারা এই সরকারের বন্ধু, কাল অন্য সরকারের। এই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, ক্রস ওনারশিপ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সেটার জন্য আমাদের গণতন্ত্রকে অনেক দূর পথ হেঁটে যেতে হবে। মিডিয়ার কার্যক্ষেত্রের পরিসর দেশের গণতান্ত্রিক পরিসরের ওপরে গভীরভাবে নির্ভরশীল। এই দুইয়ের সম্পর্কটি সরাসরি। আমরা এখনো সে পর্যায়ের গণতন্ত্রে পৌঁছাতে পারিনি, যেখানে এ ধরনের সংস্কার সম্ভব। গ্রহণযোগ্য মাত্রার গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরি না হলে মিডিয়ার স্বাধীনতার চর্চা করা কঠিন।

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: প্রতিবেদনে একদিকে গণমাধ্যমকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়েছে, আবার অন্যদিকে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবেও দেখার কথা বলা হয়েছে। আপনার মতে গণমাধ্যমের আদতে কোন ভূমিকায় থাকা উচিত, আর সেটা কীভাবে সম্ভব?

সাজ্জাদ শরিফ: এটা একটা জটিল সমীকরণ। গণমাধ্যমকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে না দেখলে তো সমস্যা আছে। একটা পত্রিকা ছাপাতে আমাদের যে খরচ পড়ে, তার প্রায় আড়াই ভাগ কম খরচে আমরা সেটা বিক্রি করি। হকার আর এজেন্টকে কমিশন দিয়ে হাতে আসে আরও কম। মানে প্রতি কপিতে লোকসান হয় প্রচুর। যার যত সার্কুলেশন, তার লোকসানও তত বেশি। এর পর তো এস্টাবলিশমেন্ট ব্যয়, অফিস খরচ, বেতন সব মিটিয়ে পত্রিকাকে লাভজনক হতে হয়। পত্রিকাকে টিকে থাকতে হলে তাকে অবশ্যই আর্থিকভাবে লাভজনক হতে হবে। কিন্তু এখানেই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। কোনো পত্রিকা যদি ভালো সাংবাদিকতা না করে, তাহলে পাঠক তো সেটা কিনবে না। লাভ করতে চাইলে আমাকে এমন সাংবাদিকতা করতে হবে, যাতে পাঠকের মধ্যে এই আস্থা তৈরি হয় যে এই পত্রিকা আমাকে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত তথ্য দিচ্ছে। ফলে ভালো সাংবাদিকতা আর লাভজনক প্রতিষ্ঠান একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত। এই কারণেই মিডিয়ার চতুর্থ স্তম্ভ হয়ে ওঠা আর আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত একমাত্র ভালো সাংবাদিকতাই পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখে। দুর্বল বা অপসাংবাদিকতা দিয়ে গণমাধ্যমের পক্ষে টেকা সম্ভব নয়। *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

প্রথম আলোর অগ্নিদগ্ধ ভবনে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সংঘবদ্ধ হামলায় আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ দৈনিক *প্রথম আলো* ভবনে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে শুরু হয় একটি ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। বিশিষ্ট শিল্পী মাহ্বুবুর রহমানের পরিকল্পনায় নির্মিত এই প্রদর্শনীতে পুড়ে যাওয়া কম্পিউটার, টেবিল, চেয়ার, বই, নথিপত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ শিল্প-উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আলো, শব্দ, ভিডিও ও ইনস্টলেশন শিল্পের সমন্বয়ে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে হামলার ভয়াবহতা।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর, ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা ৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন এবং ১৮ ডিসেম্বর রাতে মৃত্যুবরণ করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার ‘ভারতপন্থী’, ‘ভারতের দালাল’ ট্যাগের শিকার হলেও, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হিসেবে পরিচিত ওসমান হাদির মৃত্যুর রাতে – সেই অনলাইন ট্যাগিং প্রত্যক্ষ সহিংসতার রূপ নেয় এবং দুটো পত্রিকার ভবনেই হামলা হয়। সংঘবদ্ধ ডানপন্থীগোষ্ঠী ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের পর এই দুটি সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো ভবনটিকেই গ্যালারিতে রূপান্তরিত করেন শিল্পী মাহ্বুবুর রহমান।

১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এবং বিকেলে প্রদর্শনীটিকে ঘিরে বিদেশি কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, ইতালিসহ আরও অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত এই বিশেষ আয়োজনে এসে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার নিন্দা জানান। উপস্থিত

অগ্নিদগ্ধ প্রথম আলো ভবনে এই প্রদর্শনীতে ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি করা হয় শিল্পকর্ম। কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। *আলোকচিত্রী: হাবিবুল হক/দৃক*

রাষ্ট্রদূতসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, ‘হামলাকারীরা আমাদের ভবন পুড়িয়ে দিয়েছে; কিন্তু আমাদের সাহস, মূল্যবোধ ও সাংবাদিকতার প্রতি আমাদের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতাকে পোড়াতে পারেনি। আমরা এখন আরও প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে নিষ্ঠাবানভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাব।’

শিল্পী মাহ্বুবুর রহমান বলেন, দেশে সংবাদপত্র কার্যালয়ে এমন সহিংস হামলা আগে কেউ দেখেনি, কেউ প্রত্যাশা করেনি। এই ভয়াবহ হামলার শিকার প্রতিষ্ঠানটিতে ধ্বংসের কালো দাগের পাশাপাশি তিনি প্রাণশক্তি ও সাহসের প্রতীক হিসেবে উজ্জ্বল গোলাপি, হলুদ, সবুজ রং ব্যবহার করেছেন। বহু গাছপালা, পায়রাসহ বিভিন্ন জীবন্ত সত্তা ব্যবহার করে ধ্বংস ও সৃষ্টির বৈপরীত্যের দিকটি তুলে ধরেছেন।

এই প্রদর্শনীতে প্রতিদিনই দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভিড় করেছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান প্রদর্শনী দেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, ‘মাত্র কয়েক মাস আগে ভারতবিরোধী ও স্বাধীন গণমাধ্যমবিরোধী উগ্রবাদীদের হামলায় যে ভবনটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ভবনের ভেতরেই একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত ছিল, একইসঙ্গে সাহসী ও অনুপ্রেরণাদায়ী। এই প্রদর্শনী ধ্বংসকে রূপ দিয়েছে পুনর্ভাবনার উপাদানে, আর ক্ষয়ক্ষতিকে পরিণত করেছে অর্থবহ শিল্প-অভিজ্ঞতায়। এমন প্রদর্শনী সচরাচর দেখা যায় না।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিল্পসাংস্কৃতিক আয়োজনের একজন নিয়মিত দর্শক তিশা ফারহানা তার ফেসবুক প্রোফাইলে প্রদর্শনীর একাধিক ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘আলো আর অন্ধকারের যুদ্ধে অন্ধকারেরই পরাজয় হয়। প্রথম আলোর এই প্রদর্শনীতে খাঁচায় বন্দী উড়ন্ত সাদা কবুতর আমাদের সেই শান্তির বার্তাই দিয়েছে।’

তরুণ গবেষক শোভন দাস তার দর্শক প্রতিক্রিয়াতে তীব্র সহিংসতার মুখে প্রথম আলোর ঘুড়ে দাড়ানোর দৃঢ়তাকে আশাজাগানিয়া উল্লেখ করে বলেন, তিনি প্রদর্শনীটিকে ভিন্ন মতাদর্শিক গোষ্ঠীর চিরন্তন দ্বন্দ্বের উপস্থাপন হিসেবেও পাঠ করেছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আলো এবং অন্ধকার, ধ্বংস এবং সৃষ্টিশীলতা, সাহস এবং ধর্মভীরুতা, উগ্রবাদ এবং যুক্তিশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তার অবকাশ আছে। এই আলো-অন্ধকারের ভিজুয়াল ডিসকোর্স ঔপনিবেশিক ও পশ্চিমা ইসালামোফোবিক চিন্তাকে উসকে দেয়। প্রথম আলো ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছে, এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু সংঘটিত হামলার ক্ষেত্রে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের, রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাসহ আরও নানা পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তাকে শৈল্পিক পরিবেশনে বিবেচনা করা হয়নি। এই অনুল্লেখ ‘সমস্যাজনক’ কারণ, ধর্মীয়গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে, ভূরাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে দেখাটা খুবই ঝুকিঁপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম আলোতে হামলার বিচার চাই, কিন্তু আলো বনাম অন্ধকার, ধর্মান্ধতা বনাম আধুনিকতার এই মতাদর্শিক ফাঁদ থেকেও মুক্তি চাই।’

অনেক দর্শক গণমাধ্যমের প্রতি এমন নজিরবিহীন হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদের একটি স্বকীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রদর্শনীটিকে বিবেচনা করেছে। দর্শকের আগ্রহ বিবেচনা করে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ প্রর্দশনীটির সময়সীমা তিন দিন বাড়াতে বাধ্য হন এবং ২ মার্চ দর্শনার্থীদের ভিড়, আগ্রহ এবং সংহতির মধ্য দিয়ে প্রদর্শনী সমাপ্ত হয়। ●

লিঙ্গ, ক্ষমতা ও গণমাধ্যম সংস্কার: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

টিনা নন্দী

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দেড় বছর পর, ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করে। মাঝখানের সময়টি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের – যার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় সংস্কার, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, এবং একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা। সংস্কার ও পুনর্গঠনের সন্ধিক্ষণের এই সময়টিকে এক ধরনের সংশ্লেষণ হিসেবে দেখা যায় – যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনর্বহালের ভিত্তি স্থাপন করা হবে।

তবে বাস্তবতা খানিকটা ভিন্ন কথা বলে, যদিও অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় সহজ নয়। রাষ্ট্রক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রসঙ্গ, এবং গণমাধ্যমের ভূমিকাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। এই সময়ে গণমাধ্যমে রদবদলের বড় কিছু ঘটনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বছরের শুরুতে একজন নারী সাংবাদিককে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে সরাসরি বাধা দেওয়া হয়েছে – যে অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা নিজে উপস্থিত ছিলেন। এসব ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কেবলমাত্র নিরীহ ‘অ্যাক্সেস’-এর প্রশ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো আমাদের সামনে কিছু মৌলিক প্রশ্ন রাখে। কোন শর্তে এবং কী কারণে একজন নারী সাংবাদিককে তার পেশাদারি কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে? কেন একজন নারী কেবল তার লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয়ক সংবাদ করার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়?

এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ ও সুপারিশ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার রূপ। যদিও প্রতিবেদনটি নারীদের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে, তবুও এটি লিঙ্গকে মূলত উন্নয়নমূলক এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করে – প্রতিনিধিত্ব, নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে – যেখানে ক্ষমতা, নারীর অধিকার এবং প্রতিনিধিত্বকে নিয়ন্ত্রণকারী গঠনমূলক কাঠামো যথেষ্ট বিবেচনায় আনা হয়নি। এর ফলে গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নকে টেকনিক্যাল প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখার ঝুঁকি তৈরি হয়, যেখানে সংস্কারের ভাষা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতাকে আড়ালে রাখে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো গণমাধ্যমের মালিকানার পরিবর্তন এবং নারী সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে বৃহত্তর ক্ষমতার অংশ হিসেবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করা, পাশাপাশি কমিশনের লিঙ্গভিত্তিক সুপারিশের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা। তবে কমিশনের প্রতিবেদনের তাত্ত্বিক সমালোচনায় যাওয়ার আগে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কমিশন কোন পরিস্থিতি এবং শর্তের মধ্যে থেকে কাজ করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন আমরা মব দেখেছি, ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলামী ফার রাইট গোষ্ঠীর ক্ষমতা চর্চা লক্ষ করেছি, জোরপূর্বক গণমাধ্যমের মালিকানা ও সম্পাদকীয় অবস্থানের রদবদল এবং নিয়ন্ত্রণ দেখেছি, এবং নারীর অধিকারের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অসম, এমনকি দ্বিমুখী আচরণও লক্ষ্য করেছি। কাঠামোগতভাবে প্রতিকূল এই সময়ে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা স্বীকার করা অত্যন্ত জরুরি।

কমিশনের লিঙ্গ সুপারিশমালা: সমর্থনমূলক না রূপান্তরমূলক?

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের লিঙ্গভিত্তিক সুপারিশগুলো নারীর নিয়োগ, নিরাপত্তা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার নীতিমালা সম্পর্কে রূপরেখা দেয়। কিন্তু এর পরিধি এবং মৌলিক ধারণায় যে সীমাবদ্ধতা আছে তা সমালোচনামূলক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নারীবাদী তাত্ত্বিক ন্যান্সি ফ্রেজার (১৯৯৭) আমাদের দেখান কী উপায়ে সমর্থনমূলক (affirmative) পদক্ষেপ অসমতা লোপ করে ঠিকই, কিন্তু যেসব কাঠামো অসমতা উৎপাদন করে তা অক্ষত রাখে – ফলত ক্ষমতার আর্কিটেকচার সচল থাকে। অন্যদিকে, রূপান্তরমূলক (transformative) সমাধান সেই কাঠামোকে প্রশ্ন করে, তাকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করে।

কমিশনের লিঙ্গ সুপারিশমালা ঠিক এই অর্থে সমর্থনমূলক, কারণ এগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারীদের সঙ্গে ‘ভালো ব্যবহার’ করার পক্ষে সুপারিশ করে বা সুরক্ষা নিশ্চিত করায় জোর দিয়েছে – কিন্তু প্রশ্ন করে না কার মালিকানায় প্রতিষ্ঠান চলে এবং তাদের জবাবদিহিতা কার কাছে? ২০২৪ সালের অগাস্টের পরে যেসব গণমাধ্যমের মালিকানা বা নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়েছে, তা কোন শর্ত বা নীতিমালা মেনে হয়েছে? অথবা নারীদের বার্তাকক্ষের ক্ষমতার অ্যাক্সেস রাজনৈতিক সমর্থন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত কি না – এই প্রশ্নগুলো প্রতিবেদনে অনালোচিত থেকে গেছে। নিউজরুমের অভ্যন্তরীণ হয়রানি-বিরোধী নীতি কার্যকর করা বা লিঙ্গীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোনও সংস্কার নয়; এটি সর্বোচ্চ একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব মাত্র। একই সঙ্গে বাস্তবে ক্ষমতাকাঠামো স্থিতিশীল বা অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে প্রক্রিয়াগত সংস্কার সেই ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস মোকাবেলা করতে কোনোভাবেই সক্ষম হয় না।

ক্ষমতা, সত্য, ও নারীর দৃশ্যমানতা: ফুকোর বিশ্লেষণ

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ‘কওমী উদ্যোক্তা সম্মেলন’-এ সংবাদ সংগ্রহের জন্য যাওয়া *ইউএনবি*-র নারী সাংবাদিক এমি জান্নাতকে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি – স্পষ্টভাবে তার লিঙ্গকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। এই ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এবং একই সঙ্গে এটি শুধুমাত্র নিরাপত্তা বা ‘অ্যাক্সেস’-এর প্রশ্নও নয়। এখানে মৌলিক প্রশ্ন ক্ষমতা সম্পর্কিত। মিশেল ফুকোর (১৯৭২) বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতিটি সমাজে একটি নির্দিষ্ট ‘সত্যের শাসনব্যবস্থা’ (regime of truth) গড়ে ওঠে, যা নির্ধারণ করে কোন জ্ঞান গ্রহণযোগ্য, কোন আচরণ স্বাভাবিক, এবং কোন ধরনের বিষয় বা ব্যক্তিকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই কাঠামোর মধ্যেই নারীর সম্পর্কে একটি অভিভাবকসুলভ ও পিতৃতান্ত্রিক ধারণা তৈরি হয়, যেখানে তাদের উপস্থিতি ‘সুরক্ষার বিষয়’ হিসেবে দেখা হয়, ‘অধিকারের বিষয়’ হিসেবে নয়– অথবা ধর্মীয় বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে তার গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়।

এখানে প্রশ্ন শুধু একজন নারীকে তার কাজ করতে বাধা দেওয়ার নয় বরং রাষ্ট্র নারীকে কীভাবে ধারণ করে, তার সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে, কোন ধরনের উপস্থিতি রাজনীতি ও ধর্মীয় স্থানে উপযুক্ত, দৃশ্যমান বা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে – ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রশ্ন আমাদের সামনে হাজির করে। কর্তব্যরত নারী সাংবাদিককে একটি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ঢুকতে না দেওয়া এমন এক মানসিকতা, বিশ্বাস, এবং চর্চার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে নারীকে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়। এটি সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক প্রশ্ন – উদার নারীবাদী *২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন

যমুনা টিভির প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন

সামিয়া রহমান প্রিমা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই প্রতিবেদনটির পাঠক প্রতিক্রিয়ার স্ক্রিনশট থেকে চিত্রটি তৈরি হয়েছে।

সাধারণত পাহাড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে কোনো ঘটনা, গুম-খুন, সহিংসতা, নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয় না। তবে ২০২৫ সালে খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, ১২ বছরের মারমা কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাটি ব্যাপক প্রচার করেছে দেশের সংবাদমাধ্যম। বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই ঘটনাটিকে ‘কথিত ধর্ষণ’ কিংবা ধর্ষণ ঘটেনি মর্মে খবর প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ধর্ষণ, লিঙ্গীয় নিপীড়নের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আদর্শগত মানদণ্ড ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ধর্ষণের অভিযোগ খারিজ করার লক্ষ্যে বেআইনিভাবে মেডিকেল প্রতিবেদনের কপি বহুল প্রচার চালিয়েছে দেশের প্রথম সারির বেসরকারি টেলিভিশন ‘যমুনাটিভি’। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘন করে পরবর্তীতে প্রায় সকল মিডিয়া একই তথ্য অনুসরণ করে তা প্রচার করেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর আগে অতি গোপনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রচার, ‘বেআইনি’ বলে আখ্যায়িত করেছে, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের খাগড়াছড়ি শাখা।

ধর্ষণের অভিযোগ ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালায় ৮ম শ্রেণির একজন মারমা কিশোরীকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠে। রাত প্রায় ৯টায় একজন শিক্ষকের বাসা থেকে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এই শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়। পরিবার, এলাকাবাসী সবাই মিলে কিশোরী মেয়েটিকে খুঁজতে থাকলে – একপর্যায়ে একটি ধানক্ষেত থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরেছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন ভুক্তভোগী কিশোরী।

মধ্যরাতে ভিকটিম কিশোরীর বাবা মামলা করতে খাগড়াছড়ি সদর থানায় যান। পরেরদিন সকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০২০) এর ৭/৯ (৩) ও ৩২৮ দন্ডবিধি ১৮৬০ এ মামলা দায়ের করা হয়। অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, খাগড়াছড়ি সদরে ‘জুম্ম ছাত্র-জনতার’ ব্যানারে ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ভিকটিম কিশোরীর জবানবন্দি অনুযায়ী সিঙ্গিনালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ অভিযুক্ত সয়ন শীল (১৯) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত বাকি দুইজনের বিষয়ে জানা যায়নি।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আধাবেলা সড়ক অবরোধ পালিত হয়। কিন্তু রাত ৮টার পর জুম্ম ছাত্র-জনতার সংগঠক ও বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উক্যনু মারমাকে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উক্যনুকে আটকের প্রতিবাদে সিঙ্গিনালা, পানখাইয়া পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। রাত ১০টার পর উক্যনু মারমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী পরের দিন শিক্ষার্থী-জনতাকে যৌন নিপীড়ন বিরোধী মহাসমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শান্তিপূর্ণভাবে যৌন নিপীড়ন বিরোধী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ থেকে পরেরদিন ‘জুম্ম ছাত্র-জনতার’ পক্ষ থেকে পূর্ণদিবস সড়ক অবরোধ ঘোষণা করা হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল থেকে খাগড়াছড়িতে সর্বাত্মক সড়ক অবরোধ পালন করতে থাকে শিক্ষার্থী-জনতা। এই ধর্ষণের ঘটনায় বিচারের দাবি সমেত পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মের মাঝে, ঘটে যাওয়া অন্যায়-নিপীড়ন ও অমীমাংসিত বিষয়গুলোতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন বেলা ২টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে। স্বনির্ভর বাজার, মহাজন পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় দোকান-পাট সকাল থেকে বন্ধ ছিল। তারপরও পাহাড়ি ও বাঙালিদের দোকানপাটে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেনা ও পুলিশের উপস্থিতির মাঝেই কয়েকটি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকজন পাহাড়ি আদিবাসী হামলার শিকার হয়ে আহত হন। ৩ জন পাহাড়ি তরুণকে কুপিয়ে জখম করা হয়, তারা হলেন – কুমিয়া ত্রিপুরা, মংসাঅং মারমা ও মংহ্লা মারমা।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শান্তিপূর্ণ অবরোধে হামলার প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত ধর্ষকদের বিচারের দাবি করে – সকাল ৯টা থেকে আবারও শুরু হয় পূর্ণ অবরোধ। খাগড়াছড়ি সদর ছাড়িয়ে গুইমারা উপজেলায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয় ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই সহিংসতার মাঝে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ জন পাহাড়ি আদিবাসী তরুণ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লিঙ্গ, ক্ষমতা ও গণমাধ্যম সংস্কার: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

২৫-এর পৃষ্ঠার পর

কাঠামোয় একে দেখার সুযোগ নেই।

উপনিবেশবিরোধী নারীবাদী তাত্ত্বিক সাবা মাহমুদ (২০০৫) উদার নারীবাদী কাঠামোর সমালোচনা করেন এই যুক্তি দিয়ে যে এই কাঠামো শুধুমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে এজেন্সি ধরে, বাধ্যবাধকতাকে ভুক্তভোগিতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তিকে ক্ষমতায়ন হিসেবে গণ্য করে। কমিশনের বিশ্লেষণ লিঙ্গকে যখন 'অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষার' প্রশ্ন হিসেবে সামনে আনে, তখন তা মূলত উদার নারীবাদী কাঠামোকেই পুনঃস্থাপন করে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক স্থানের সীমানা কে নির্ধারণ করে, এবং এই নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি নিজেই কীভাবে একটি ক্ষমতার চর্চা – এই প্রশ্নটি উদার নারীবাদী বিশ্লেষণের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়। উল্লেখ করা দরকার যে ধর্ম উপদেষ্টার উপস্থিতি এই ঘটনাকে 'বেসরকারি ধর্মীয় অনুভূতি'র প্রশ্ন থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রশ্নে নিয়ে যায় – যা কমিশনের প্রতিবেদনে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।

বাটলার, পারফরমেটিভিটি ও বর্জনের রাজনীতি

লিঙ্গ তাত্ত্বিক জুডিথ বাটলার (১৯৯০) লিঙ্গকে কোনও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, বরং পারফরমেটিভ প্রভাব হিসেবে বোঝার জন্য একটি কাঠামো হাজির করেন। নারী সাংবাদিকদের গণমাধ্যমে উপস্থিতির সীমা একটি পুনরাবৃত্তিমূলক অর্জন, যা রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। বাটলার যুক্তি দেন যে বিষয়টি বঞ্চনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বঞ্চনাই এর শেষ কথা নয় (১৯৯২, ১৯৯৩)।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শুধু নারীকে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং কোন ধরনের নারী-উপস্থিতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিসরে দৃশ্যমান হবে তা নির্ধারণের একটি নতুন কাঠামো তৈরি হতে দেখা গেছে। বাটলারের পরিভাষায় বলতে গেলে, এটি কেবল কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য নয় – এটি এমন একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বর্জন, যা নারী সাংবাদিককে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সত্তার বাইরে স্থাপন করে এবং সেই বর্জনকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য হিসেবে উপস্থাপন করে। এই বর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর 'অযোগ্যতা' নির্মিত হয়, কাঠামোগত পুনরাবৃত্তির ফল হিসেবে।

গণমাধ্যমের মালিকানা ও ক্ষমতার রাজনৈতিক অর্থনীতি

এই বিশ্লেষণ আমাদের সামনে গণমাধ্যম সংস্কারের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করে। যখন সংস্কারের ভাষা অন্তর্ভুক্তি, নিরাপত্তা এবং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন সে ভাষা কার্যত ধরে নেয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষ এবং কেবল নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলেই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক মালিকানার অধীনে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে, যে পরিসরগুলো ধর্মীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের সমীকরণে পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সংস্কার নয় – এটি কেবল বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোতে নারীকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা, সেই কাঠামো প্রশ্ন না করেই।

এখানে সন্তাল মুফে এবং আর্নেস্তো লাক্লাউয়ের আধিপত্য (hegemony) ধারণাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মালিকানার রদবদল কেবল অর্থনৈতিক নয় – এটি নির্ধারণ করে কোন ধরনের কণ্ঠস্বর 'স্বাভাবিক' এবং কোন ধরনের সংবাদ 'গ্রহণযোগ্য' বলে বিবেচিত হবে। নারী সংবাদকর্মীদের ক্ষমতার অ্যাক্সেস যদি রাজনৈতিক আনুগত্যের শর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগত বৃদ্ধি লিঙ্গ-ন্যায্যতার সূচক হিসেবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ক্ষমতার এই স্থাপত্যকে উপেক্ষা করে শুধু নিরাপত্তা নীতিমালার কথা বলা হলে সংস্কার কার্যত ক্ষমতার বৈধতা উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বহন করে।

একটি রূপান্তরমূলক সংস্কারের দিকে

ফ্রেজারের ভাষায়, এটিই সমর্থনমূলক পদক্ষেপের সীমা। রূপান্তরমূলক সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন এবং গভীর প্রশ্ন: কোন রাজনৈতিক শর্তে গণমাধ্যমের মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই মালিকানা সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে কীভাবে নির্ধারণ করছে? রাষ্ট্র-সমর্থিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারী সাংবাদিকের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হলে রাষ্ট্র কোন অবস্থান নেয়? এবং সংস্কার কমিশন কী এই প্রশ্নগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় আনতে সক্ষম হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন কমিশনের ইচ্ছাশক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য নয়। বরং এটি স্বীকার করা যে সংস্কারের ভাষা ও ক্ষমতার বাস্তবতার মধ্যে যে শূন্যস্থান থেকে যায়, তাকে দৃশ্যমান করা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দায়িত্ব। গণমাধ্যমে লিঙ্গ-ন্যায্যতার প্রশ্ন তখনই রূপান্তরমূলক হয়ে উঠবে যখন তা নারীর সুরক্ষার ভাষা থেকে সরে নারীর রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতির প্রশ্ন সামনে আনবে, এবং একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলবে কার জন্য কোন সত্য উৎপাদিত হচ্ছে, কোন কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক বলে গণ্য হচ্ছে, এবং কে সেই স্বাভাবিকতা নির্ধারণ করছে।

বাংলাদেশের এই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গণমাধ্যম সংস্কারকে যদি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে প্রশাসনিক নীতির বাইরে গিয়ে কাঠামোগত ক্ষমতার প্রশ্নকে কেন্দ্রে আনতে হবে। নারী সাংবাদিকের অধিকার কেবল নিউজরুমের ভেতরে নয়, রাজনীতি ও ধর্মের যে পরিসরে সংবাদ তৈরি হয় সেখানেও নিশ্চিত করতে হবে – এবং সেই নিশ্চয়তার দায় রাষ্ট্রের, প্রতিষ্ঠানের, এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির। ●

টিনা নন্দী একজন শিক্ষক ও গবেষক।

যমুনা টিভির প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন

২৫-এর পৃষ্ঠার পর

নিহত তিনজন হলেন – রামসু বাজার এলাকার আলাকাই মারমার ছেলে তৈইচিং মারমা (২০), আমতলী পাড়ার থুইলাঅং মারমার ছেলে আথুইপ্রু মারমা (২১) ও চেং গুলি পাড়ার হাসু মারমার ছেলে আখ্রাউ মারমা (২২)। আহত হয়েছেন অনেক আন্দোলনকারী, সাধারণ শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী, নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও। এই ঘটনায় হামলা, ভাঙচুর, লুটপাটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাহাড়ি ও বাঙালিসহ অনেক সাধারণ মানুষ।

এই ঘটনায় মিডিয়া কী বলেছে

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগ, এর ধারাবাহিকতায় বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও তিনজন পাহাড়ি আদিবাসী তরুণ গুলিতে নিহতের ঘটনায় দেশের সংবাদমাধ্যম সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরবে – এটি স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তবে হুট করেই দেখা গেল খাগড়াছড়ির ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় 'ধর্ষণের আলামত মেলেনি' উল্লেখ করে তা ফলাও করে প্রতিবেদন প্রচার করেছে বেসরকারি চ্যানেল যমুনা টেলিভিশন। এই টেলিভিশনের দুটি রিপোর্টকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, এটি যেমন অত্যন্ত অনৈতিক ও অসংবেদনশীল, তেমনি উদ্দেশ্যমূলক। *যমুনা টিভি*-র সংবাদটি প্রচারের পরপরই *বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর*, *প্রথম আলো*, *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন*, *একুশে টেলিভিশন*, *আরটিভি*, *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*সহ অন্যান্য প্রায় সকল সংবাদমাধ্যম একই ধারায় সংবাদটি প্রচার করে। এসকল মিডিয়ার ডিজিটাল মিডিয়া তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের ফলে – ভিকটিম শিক্ষার্থীর পরিবার থেকে শুরু করে, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ডিজিটাল মিডিয়ার ফটোকার্ডে ১২ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া মারমা কিশোরী মেয়েটিকে কেন্দ্র করে ঘৃণাসূচক ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্বেষ ছড়ানোর পেছনে বেসরকারি টেলিভিশন 'যমুনা টিভি' থেকে সাংবাদিকতার নৈতিকতা বিবর্জিত দুইটি সচিত্র সরেজমিন প্রতিবেদন পরপর প্রচারের বিশেষ ভুমিকা ছিল।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ প্রচারিত রিপোর্টের শিরোনাম: *খাগড়াছড়ির ঘটনায় মেডিকেল পরীক্ষায় মেলেনি ধর্ষণের আলামত*

এই প্রতিবেদনে নিউজ প্রেজেন্টার পঠিত ইন্ট্রোর তথ্য ছিল,

> 'খাগড়াছড়ির সেই মারমা কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় মেডিক্যাল পরীক্ষায় ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। জেলার সদর হাসপাতালের করা পরীক্ষায় রিপোর্ট, এ সংক্রান্ত ১০টি কাউন্টের সবগুলোতেই এসেছে নরমাল। হাসপাতালের গাইনোকোলোজিস্ট ডাক্তার জয়া চাকমাসহ ৩ চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত সেই রিপোর্ট হাতে এসেছে যমুনা নিউজের। এদিকে খাগড়াছড়ি ও গুইমারার দুই রিজিওন কমান্ডার জানিয়েছেন, ধর্ষণ ঘটনাকে পুঁজি করে পাহাড় অশান্ত করার পরিকল্পনা ছিল ইউপিডিএফের। এর আগে মামলার এজাহারে ভুক্তভোগীর বাবা জানান, ঘটনার রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে নিখোঁজ হয় মেয়েটি। পরে অচেতন অবস্থায় একটি ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। পাঠানো হয় সদর হাসপাতালে।'

এরপর ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে এই প্রতিবেদনের সকল তথ্য,

> 'ভুক্তভোগী সেই কিশোরীর তাৎক্ষণিক মেডিক্যাল পরীক্ষা হয় সদর হাসপাতালে। গাইনোকোলোজিস্ট ডা. জয়া চাকমার নেতৃত্বে। কী এসেছে সে মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টে? ৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ধর্ষণের লক্ষণ পাওয়া যায় এমন ১০টি কাউন্টের কোনোটিতে মেলেনি আলামত। সবগুলোই নরমাল। শরীরের ভেতর-বাহির কোথাও ধর্ষণের চিহ্ন পায়নি ৩ সদস্যের চিকিৎসক দল। রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন গাইনোকোলোজিস্ট ডা. জয়া চাকমা, মেডিক্যাল অফিসার মীর মোশারফ হোসেন ও ডা. নাহিদা আকতার। যদিও মামলার এজাহারে ভুক্তভোগীর বাবা জানান, ঘটনার রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে নিখোঁজ হয় মেয়েটি। পরে অচেতন অবস্থায় একটি ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। পাঠানো হয় সদর হাসপাতালে।'

এরপরের স্ক্রিপ্টেই রিপোর্টার রিয়াজ রায়হান বলছেন, 'এদিকে খাগড়াছড়ির ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করছে সেনাবাহিনী।' এই তথ্যের পরপরই খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় দায়িত্বরত দুই সেনাসদস্যের বক্তব্য যুক্ত করা হয় প্রতিবেদনে। সেনাবাহিনীর এই দুই সদস্যের যতটুকু বক্তব্য এই প্রতিবেদনে প্রচার করা হয়েছে, সেখানে চলমান বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য থাকলেও – ধর্ষণের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। এরপর বিক্ষোভ ও হামলার সহিংসতায় প্রত্যক্ষদর্শী, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও এই বিষয়ে জেলা প্রশাসকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই প্রতিবেদনটি শেষ হয়। ধর্ষণের অভিযোগ কিংবা এই সংক্রান্ত 'মেডিক্যাল রিপোর্টের' বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কোনো ধরনের বক্তব্য এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।

অর্থাৎ *যমুনাটিভি*-র ৪ মিনিট ২৮ সেকেন্ডের এই প্রতিবেদনটিতে ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদক তার হাতে আসা অতি গোপনীয় একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে একটি তথ্য স্পষ্টভাবে প্রচার করেছেন যে – 'ধর্ষণের আলামত মেলেনি।' অথচ ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাটি সদ্য পুলিশি তদন্তাধীন ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় ছিল। সাংবাদিকতার নীতিমালার বিচারে এই প্রতিবেদনটি অনৈতিক, অসঙ্গতিপূর্ণ ও অসংবেদনশীল ।

অসঙ্গতি ১) প্রথমত, ধর্ষণের প্রমাণ শুধুমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টে শনাক্ত করা যায় না। ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণে প্রাথমিক আলামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে। একইসঙ্গে ভিকটিমের জবানবন্দি, সাক্ষ্য-প্রমাণ, ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক বা অবস্থাগত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ, পুলিশি তদন্তসহ আদালতের সার্বিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্ষণের ঘটনা, ঘটেছে কি ঘটে নাই তা আদালত প্রমাণ বিবেচনায় রায় দিয়ে থাকেন। এই বাস্তবতায় শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে 'পরীক্ষায় মেলেনি ধর্ষণের আলামত' এই শিরোনামে ও বয়ানে ব্যাপক প্রচার, আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

অসঙ্গতি ২) ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষায় সাধারণত ৩০টি সূচক থাকে। আর এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, '৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ধর্ষণের লক্ষণ পাওয়া যায় এমন ১০টি কাউন্টের কোনোটিতে মেলেনি আলামত। সবগুলোই নরমাল।' ফলে অস্পষ্টতা রয়ে যাচ্ছে।

অসঙ্গতি ৩) 'শরীরের ভেতর-বাহির কোথাও ধর্ষণের চিহ্ন পায়নি ৩ সদস্যের চিকিৎসক দল' – এই প্রতিবেদনটিতে এমন আপত্তিজনক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত 'শরীরের ভেতর ও বাহিরে ধর্ষণের চিহ্ন' বলতে কী বোঝায় তা বোধগম্য নয়। এছাড়া আমরা ভিকটিমের জবানবন্দী, আদালত ও থানা পুলিশের নথিপত্র থেকে জানি যে গ্রামবাসী মেয়েটিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। ভিকটিম জ্ঞান ফেরার পর জানিয়েছে পেছন থেকে তার মুখে রুমাল চেপে ধরা হলে একধরনের গন্ধ পান। উদ্ধারের পরপরই মেয়েটিকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রস্রাবের সময় কিশোরী মেয়েটির যোনিপথ থেকে রক্তপাত হয়। তার বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই অবস্থায় ঘটনার রাতেই কিশোরী মেয়েটিকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষত নিরাময়ের জন্য হাসপাতাল থেকে প্রতিষেধক হিসেবে মলম ও ব্যাথার ওষুধ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর বাড়ি ফেরত আসে এই স্কুল শিক্ষার্থী।

অসঙ্গতি ৪) এই প্রতিবেদন দেখে মেডিক্যাল রিপোর্টটি যমুনা নিউজ সঠিকভাবে যাচাই করেছেন কি না, তা স্পষ্ট হয়নি। স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মন্তব্য এই প্রতিবেদনে দেখা যায়নি। ডা. জয়া চাকমাসহ যে কমিটি এই রিপোর্ট দিয়েছেন, তাদের কোনো বক্তব্য নেই। এছাড়াও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকেও এই মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রসঙ্গে কোনো বক্তব্য এই প্রতিবেদনে দেখা যায়নি। তাহলে আমরা কি ধরে নিব, অত্যন্ত সংবেদনশীল এই মেডিক্যাল রিপোর্টের বিশ্লেষণ সাংবাদিক নিজেই করেছেন? একজন সাংবাদিক তো আর চিকিৎসক নন। অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা না মেনে শুধুমাত্র দ্রুত প্রচার করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে – তাহলে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব-কর্তব্য বিবেচনায় এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

উল্লেখ্য *একুশেটিভি* থেকে ডা. জয়া চাকমার বক্তব্য জানতে চেয়ে একটি ফোন রেকর্ড প্রচারিত হয়, সেখানে উল্টো তিনি প্রশ্ন করেন 'এটা কেমনে বের হলো সেটা আমার প্রশ্ন। কারণ এটা তো গোপনীয়তা বজায় রাখার কথা।' এই প্রতিবেদক রিপোর্টে কী পেয়েছেন জানতে চাইলে এই চিকিৎসক স্পষ্ট করে জানান, শুধুমাত্র একটি রিপোর্টের উপর নির্ভর করে না।

যমুনাটিভি-র দ্বিতীয় প্রতিবেদনটিও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। ৫ মিনিট ১২ সেকেন্ডের এই দ্বিতীয় প্রতিবেদনটিতেও একই ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। অপ্রাসঙ্গিক, উদ্দেশ্যমূলক ও আপত্তিজনক শব্দ, বাক্য ও শিরোনামে 'ক্লিকবেইট চর্চা'র পাশাপাশি 'আদিবাসী এবং ধর্ষণের ভিকটিম বিরোধী বয়ান' নির্মাণের চেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

১ অক্টোবর ২০২৫, প্রচারিত রিপোর্টের শিরোনাম: *সেদিন কী ঘটেছিল মারমা কিশোরীর সাথে? যমুনা টিভিকে জানালেন নিজেই*

এই প্রতিবেদনে নিউজ প্রেজেন্টার পঠিত ইন্ট্রোর তথ্য ছিল,

> 'খাগড়াছড়ির যে মারমা কিশোরীর ধর্ষণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ৩ জনের প্রাণ গেল, উত্তপ্ত জনপদে পরিণত হলো পুরো জেলা, সেই ভিকটিম কিংবা তার পরিবার মামলা করা ছাড়া প্রকাশ্যে কথাই বলেনি। ঘটনার সপ্তাহখানেক পর প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের সামনে। কী বলেছেন তারা, কীভাবে ঘটনা ঘটেছে সবকিছু নিয়ে কথা বলেছেন সহকর্মী রিয়াজ রায়হান ও ছবি তুলেছেন জিহাদ ইসলাম।'

এই প্রতিবেদনের প্রথম বাক্যটি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে প্রতিবেদক বলতে চাচ্ছেন, হাজারো মানুষের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ও সহিংসতায় ৩ জন খুন হওয়ার দায় মূলত ১২ বছরের সেই কিশোরীর। মারমা কিশোরী ও তার পরিবার অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ না তুললে এই সহিংসতার ঘটনা ঘটত না। না, প্রতিবেদক এমন কথা সরাসরি বলেননি। তবে স্ক্রিপ্টে বলেছেন, '*ধর্ষণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ৩ জনের প্রাণ গেল*'... '*তার পরিবার মামলা করা ছাড়া প্রকাশ্যে কথাই বলেনি*', এই অসংবেদনশীল ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের আর কী কারণ হতে পারে? প্রতিবেদক রিয়াজ রায়হান আরও দাবি করেছেন, 'কীভাবে ঘটনা ঘটেছে সবকিছু নিয়ে কথা বলেছেন।' একটি ধর্ষণের অভিযোগের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে প্রতিবেদনের শুরুতেই প্রতিবেদক বলেছেন, 'সবকিছু' নিয়ে কথা হয়েছে যা নেহাত আপত্তিজনক।

একজন ভিকটিম ও তার পরিবার কোনো সাংবাদিককে সবকিছু বলতে বাধ্য নন। একইসঙ্গে সবকিছু জানিয়ে সংবাদ প্রচার করাও সাংবাদিকতার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সাংবাদিকতা মানেই, যা কিছু জানি বা নিশ্চিত জানা গেছে সেসকল তথ্য সবসময় প্রচার করা না। বরং হাতে আসা তথ্য যাচাই করার পাশাপাশি কোন তথ্য, কোন সময়ে ও কীভাবে প্রচার করবেন বা করবেন না সেটা বিবেচনা করতে পারাই সাংবাদিকতা।

এ ছাড়াও এই প্রতিবেদনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি রয়েছে–

অসঙ্গতি ১) এই প্রতিবেদক ভিকটিমের বক্তব্য নিয়েছেন, যা যমুনাটিভি অনেক গর্বের সাথে প্রচার করেছেন। যেমন শিরোনামে বলা হয়েছে, *সেদিন কী ঘটেছিল মারমা কিশোরীর সাথে? যমুনা টিভিকে জানালেন নিজেই*, এ ছাড়া প্রতিবেদনের বিভিন্ন শব্দচয়ন ও বাক্য, যেমন *প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের সামনে* ইত্যাদি।

এখানে আপত্তির মূল বিষয় এই দুটি রিপোর্টের কোথাও এই প্রতিবেদক, ধর্ষক হিসেবে অভিযুক্ত আসামির কোনো ধরনের কোনো তথ্য দেননি। ঘটনার পরের দিনই সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে স্থানীয় বাঙালি সয়ন শীল নামে একজন গ্রেপ্তার হন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অভিযুক্তসহ আরও দুইজন অভিযুক্তের বিষয়ে প্রতিবেদনে কোনো তথ্য কিংবা কোনো জিজ্ঞাসা রাখেনি যমুনা নিউজ।

অসঙ্গতি ২) দ্বিতীয় প্রতিবেদনটিতে ভিকটিমের ঘর-বাড়ির ছবি প্রচারের মাধ্যমেও অন্যায় হয়েছে। প্রথম সারির একটি সংবাদমাধ্যম হিসেবে দায়িত্বশীলদের জানার কথা ছিল যে ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক কোনো সংবাদমাধ্যম ভিকটিমের পরিচয়, ঠিকানা ও এমন কোনো তথ্য জনপরিসরে প্রকাশ করতে পারে না, যাতে ভিকটিমকে শনাক্ত করা যায়।

অসঙ্গতি ৩) প্রতিবেদনটির একপর্যায়ে প্রতিবেদকের প্রশ্ন, 'এতো কাছ থেকেও কোনো শব্দ পায়নি কেউ?' যে জায়গাটির কথা প্রতিবেদক বলছেন, সেখান থেকে ভিকটিমকে রাত

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিভুরঞ্জন সরকারের খোলা চিঠি

সাংবাদিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও শ্রম অধিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

দৈনিক *আজকের পত্রিকা*-র জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকার (৭১) ২১ আগস্ট ২০২৫, ভোরে অনলাইন নিউজপোর্টাল *bdnews24.com*-এ একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি ইমেইল করেন। পরদিন ২২ আগস্ট বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার মৃত্যুর পর খোলা চিঠি প্রকাশ করে এই অনলাইন সংবাদমাধ্যম।

এই চিঠিতে বিভুরঞ্জন সরকার সাংবাদিক হিসেবে তার দীর্ঘ কর্মজীবনের চড়াই-উতরাই, পতিত আওয়ামী আমলে সাংবাদিক মহলে সরকারের আনুগত্যের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার প্রসঙ্গ, এবং তার পরিবার নিয়ে উদ্বেগ, আর্থিক সংকটের কারণে একাধিকবার শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করেও অসফল হওয়ার কথা জানিয়েছেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের আমলে 'আওয়ামী ট্যাগ' এবং দৈনিক *আজকের পত্রিকা* কে 'লাল চোখ দেখানো'র অভিযোগ জানিয়েছেন। এসকল অভিযোগ ও তার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সাংবাদিকতার বাস্তবতা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এই আলাপে যে প্রশ্নটি যথাযথ মনোযোগ পায়নি, অথচ বিভুরঞ্জন সরকারের চিঠির কেন্দ্রীয় বিষয়, তা হলো একজন সাংবাদিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা।

আলোকচিত্রী: হাসান রাজা, আজকের পত্রিকা

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার

তিনি লিখেছিলেন, '*আজকের পত্রিকা*'য় কাজ করছি ৪ বছর হলো। এই সময়ে না হলো পদোন্নতি, না বাড়ল বেতন। অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। সংবাদপত্র আর কীভাবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, ঘরের মধ্যেই যেখানে অনিয়ম।' *(bdnews24.com, ২২ অগাস্ট ২০২৫)*

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তা মূলত কাঠামোগত সমস্যা। সংবাদমাধ্যমে মালিকপক্ষের পাওনা পরিশোধ না করা, পদোন্নতি, বেতন-বোনাস আটকে রাখার বহু নজির আছে। উল্লেখ্য ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সিকদার গ্রূপের মালিকানাধীন ইংরেজি দৈনিক *দ্য বাংলাদেশ পোস্ট*-এর সংবাদ প্রতিবেদক আহমেদ মুন্নি বকেয়া বেতনের দাবিতে অনশন কর্মসূচি করেন। আহমেদ মুন্নি বলেন, অনশন কর্মসূচির পর আংশিক পাওনা বুঝে পেলেও এই প্রতিষ্ঠানের অনেকেই আছেন যারা এখনও উৎসব ভাতাসহ বকেয়া বেতনের জন্য লড়ছেন।

২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পত্রিকাটির সাংবাদিক ও কর্মচারীরা বকেয়া বেতন-বোনাস ও অন্যান্য পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত সিকদার হাউজের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের পর ২রা মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে *বাংলাদেশ পোস্ট* সাংবাদিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে একটা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় এবং মালিকপক্ষকে আবারও বকেয়া পরিষদের আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ পোস্ট সাংবাদিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপ্রধান নাসিমা আক্তার সোমা বলেন, 'আমরা গত অক্টোবর ২০২৫ থেকে আমাদের দীর্ঘ দিনের বকেয়া বেতন-বোনাস ও বিভিন্ন পাওনাদি আদায়ের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচী ও অনশন কার্যক্রম পালন করে আসছি। এখন অবধি মালিকপক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাইনি।'

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও সাংবাদিকদের চরম অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার প্রসঙ্গে বিষদ বর্ণনা পাওয়া যায়, 'কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোনো সময় বিনা নোটিশে সাংবাদিকদের বরখাস্ত করা হয়। অনেক সময় নিয়োগপত্রেও অন্যায়ভাবে সেরকম শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে সাংবাদিক তার মোবাইলের মেসেজে জানতে পারেন যে তার চাকরি নেই। অনেক সময় অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফিরে এসে সাংবাদিক দেখতে পান তাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অথচ শ্রম আইনে ছাঁটাই, বরখাস্ত বা চাকরি থেকে ডিসচার্জ করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে সাংবাদিককে আগে থেকে নোটিশ প্রদান এবং ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে, যা বেশির ভাগ গণমাধ্যম লঙ্ঘন করে থাকে।'

অন্তত কাগজে কলমে বাংলাদেশের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি শ্রম আইনের অধীনেই পরিচালিত হয়। সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের চিঠির প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের শ্রম আইন কোনো সুরক্ষা দিতে না পারার প্রসঙ্গে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজের (বিলস) পরিচালক সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এক দিকে শ্রম আইনের দুর্বলতা ও এর দুর্বল প্রয়োগ, অন্যদিকে গোটা গণমাধ্যমই ক্রমান্বয়ে, দ্রুতগতিতে করপোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি তাবেদার, অপেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা গণমাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্বল সাংবাদিক সংগঠন এবং আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষার প্রায় কোনো পথ খোলা রাখেনি, বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু আমাদেরকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি করে।'

অনেক সাংবাদিক শ্রম আদালতের শরণাপন্ন হন কিন্তু সেখানে মালিকপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক দীর্ঘসূত্রিতা, শ্রম আদালতের কাঠামোগত দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কোনো প্রতিকার পেতে সাংবাদিকের দীর্ঘ সময় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় কাটাতে হয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শ্রম আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার ৫০০। যদিও শ্রম আইন অনুযায়ী যে কোনও মামলা ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার বিধান রয়েছে, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে

২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিভুদা'র আত্মহনন, মর্মস্পর্শী চিঠি, শ্রম বাস্তবতা ও আমাদের ভূমিকা

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

বিভুরঞ্জন সরকার – বিভুদা'র আত্মহনন ও তার সেই মর্মস্পর্শী চিঠি আমাদের সবাইকে, জাতিকে ব্যথিত করেছিল, আমাদেরকে সম্মুখীন করেছিল অনেক প্রশ্নের। যে সাংবাদিক, লেখক, কলামিস্টরা তাদের সকল সীমাবদ্ধতা, বাধা-বিপত্তি পেরিয়েও প্রতিদিন সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, অবিচার আমাদের সামনে তুলে ধরে; কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেন অসঙ্গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার – সেই লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্টরা প্রতিদিন নিজেরাই যুদ্ধ করেন অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে, একধরনের অবজ্ঞার বিরুদ্ধে। বাইরে তারা একজন বুদ্ধিবৃত্তিক সৈনিক, কিন্ত চাকুরির ক্ষেত্রে তারা নিজেকে একজন বেতনভুক্ত চাকুরিজীবী এবং সেই চাকুরিও একধরনের নব্য উদীয়মান করপোরেট পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত – যা এখন পর্যন্ত সত্যিকারভাবে শিল্পগোষ্ঠীও হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের প্রত্যেকেরই হয় এখন একটি মিডিয়া অথবা একটি মিডিয়া হাউজ আছে, পত্রিকা আছে। আমরা যখন শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমজীবী মানুষের সাথে মতবিনিময় করেছি তার অংশ হিসেবে একাধিকবার আমরা গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে বসেছি। দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার পরও শ্রমিক অধিকার নিয়ে, শ্রম ইস্যু নিয়ে কাজ করার পরও আমার কাছে গণমাধ্যমকর্মীদের সমস্যাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছিল খুব বেদনাদায়ক এবং নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। বিভুদা'র সেই চিঠিতে তারই কিছু অংশ, কিছু প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়েছিলাম।

খুব বিস্তারিত না গিয়ে আমি বলতে চাই যে সাংবাদিকরা 'শ্রমিক' হিসেবে বাংলাদেশের শ্রম আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকার কথা, আইনে সেগুলো উল্লেখও আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের শ্রম আইন যে সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – কারখানার শ্রমিক কিংবা বাইরের শ্রমিক, তাদেরকেও সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয় না। এই শ্রম আইনে অনেক ফাঁকফোকর আছে এবং প্রতিবার সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে এমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সংশোধন করা হয়, তাতে যে শ্রমিকদের সুরক্ষার কথা বলা হয় তাদেরও কিন্তু সুরক্ষার অভাব থাকে। তারপর আছে বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরসহ সার্ভিস সেক্টরের নিম্নপদস্থ ও মধ্যমসারির কর্মকর্তারা যারা সবাই শ্রম আইনের বাইরে।

শ্রম আইনের ধারা ২ এর দফা (৬৯), (৭০), (৭১) ও (৭২) এ সুনির্দিষ্টভাবে যথাক্রমে 'সংবাদপত্র', 'সংবাদপত্র ছাপাখানা শ্রমিক', 'সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান', ও 'সংবাদপত্র শ্রমিক' – এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। ধারা ৯৮ মোতাবেক সংবাদপত্র শ্রমিক ও তাদের উপর 'নির্ভরশীল'গণ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের খরচে চিকিৎসা পরিচর্যা পাবার অধিকারী। ধারা ১১৭(১)(গ) মোতাবেক সংবাদপত্র শ্রমিকগণ কোনও প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্নভাবে এক বৎসর চাকুরি পূর্ণ করে থাকলে তিনি প্রতি এগারো দিন কাজের জন্য এক দিন মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি পাবার অধিকারী। সংবাদপত্র শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ, মজুরি বোর্ড গঠন এসব বিষয়ে ধারা ১৪৩ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদপত্র শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন বিষয়ে ধারা ২৭৩-এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকগণ শ্রম আদালতে বিচার চাইতে পারেন। কিন্তু আদর্শগতভাবে শ্রম আইন শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও এখানে অনেক ফাঁকফোকর আছে যার শিকার শ্রমিকরা যেমন হন, সাংবাদিকরাও হন। লক্ষ রাখার বিষয় এই যে, সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে শ্রম আইন কার্যকর করা কিংবা যেকোনও ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, যাদের জন্য আইন তাদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। আইনের ভিত্তিতে শ্রমিকদের যেসকল সুযোগ-সুবিধা বা সুরক্ষা দরকার সেগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য সংগঠিত হওয়া, যৌথ দরকষাকষি করা এবং চূড়ান্তভাবে আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার জন্য আদালতে আশ্রয় গ্রহণ – এসব অধিকার কিন্তু শ্রমিক কিংবা সাংবাদিকদের রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দীর্ঘদিন যাবৎ সাংবাদিকতা একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে ঢুকে আছে এবং সাংবাদিকরা একধরনের করপোরেট হাউজগুলোর চাকরিজীবীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি এই করপোরেট হাউজগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সেই গোষ্ঠীগুলোর রাজনীতি ও স্বার্থের কাছে নিজেদের বলি দিতে বাধ্য হন। অনেক সময় সাংবাদিকরা একদমই ব্যবহৃত হন সেসব গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে যারা বিভুরঞ্জন সরকার-এর মতো স্বাধীনভাবে চলতে চান, স্বাধীন সাংবাদিকতা করতে চান তাদেরকে হয় গুটিয়ে নিতে হয়, নইলে সীমাহীন অবজ্ঞার মধ্যে তার চাকুরিজীবন পার করতে হয় অথবা আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। এই আত্মহনন বিভুদা'র মতো দৈহিকভবে আত্মহনন হতে পারে আবার অনেক সময় আদর্শগত, চেতনাগত আত্মহনন হয় যেটা অপ্রত্যাশিত হলেও আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি।

আমরা জানি, যদি সাংবাদিক ইউনিয়নের কথা আমরা বলি তাহলে একসময়ে বাংলাদেশের সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিক সাংবাদিক ইউনিয়ন তারা খুবই শক্তিশালী ছিল, তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং অনেক খ্যাতিমান শ্রমিকনেতা তাদের মধ্যে থেকে এসেছিলেন। দুঃখজনকভাবে তারা আজ বিভক্ত। একদিকে শ্রম আইনের দুর্বলতা এবং দুর্বল প্রয়োগ, অন্যদিকে পুরো গণমাধ্যমটাই ক্রমান্বয়ে খুব দ্রুতগতিতে উঠতি করপোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাশাপাশি অপেশাদার, তাবেদার ব্যক্তিদের মাধ্যমে সেই গণমাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদিকে সাংবাদিকদের সংগঠনের দুর্বলতা এবং শ্রম আদালতের দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বলতা সব মিলিয়ে আমরা মনে করি যে – সুস্থ ও অগ্রসর সমাজ গঠন এবং মানুষের অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে, এবং অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সারা জাতিকে সার্বক্ষণিক জাগ্রত রাখার জন্য যে সাংবাদিকরা দিনরাত কাজ করেন তাদের সুরক্ষার জন্য এখনকার যে শ্রম আইন, শ্রম কাঠামো আছে, পরিদর্শন ব্যবস্থা আছে সেটি প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এখানে আরও দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, সাংবাদিক পরিদর্শনের দায়িত্বে যারা থাকেন অর্থাৎ কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর – একদিকে যেমন তাদের জনবলের ঘাটতি আছে, সক্ষমতার ঘাটতি আছে ঠিক তেমনি তাদের জন্য সংবাদপত্রভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। কারণ, জনমনে একটা ধারণা বিদ্যমান যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান কারখানার মধ্যে পড়ে না – এটি একটি আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক সমতা। এছাড়া, এর মালিকরা এবং উচ্চপদস্থ নীতি নির্ধারকরা এত বেশি উঁচু পর্যায়ের, এত বেশি ক্ষমতাশালী যে এখানকার সাংবাদিকদের ব্যাপারে আইন মানা হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন করা শ্রম পরিদর্শকদের জন্য অনেক সময় খুবই দুষ্কর হয়ে যায়।

গণমাধ্যমে একধরনের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা আমরা সবসময়ই দেখি। পাশাপাশি এখন যে ডিজিটাল গণমাধ্যম তৈরি হয়েছে সেখানে প্রচুর সাংবাদিক কাজ করেন। অনেক সাংবাদিক এখন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করেন। তাদের সুরক্ষা কিন্তু আইনে নেই। এর পাশাপাশি সংবাদপত্রের কর্মচারীদের কথাও বলতে হবে যে তাদের বিরাট অংশই সুরক্ষার বাইরে, অথচ তাদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করা জরুরি। পুরো বিষয়টি দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে যে বাংলাদেশের সমাজ কতখানি মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। বাংলাদেশের শ্রম আইন এবং শ্রম নীতি, শ্রম ইস্যুতে করণীয় যে বিষয়গুলো, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সংগঠন করার অধিকার, দরকষাকষির অধিকার এগুলো বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য কতখানি সুরক্ষিত, বিস্তৃত এবং কার্যকর – সেসব দিক আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। এই শ্রমজীবীদের একটি অংশ হলো সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীরা। এক অর্থে তারা সমাজের অগ্রসর অংশ, অথচ আইন থাকার পরও তারাই যদি পর্যাপ্ত সুরক্ষা না পান, তাহলে দেশের প্রান্তিক শ্রমজীবী গোষ্ঠী কতটা সুরক্ষিত সে বিষয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়।

বিভুদা'র সেই খোলা চিঠি আমাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমি মনে করি, প্রশ্ন করতে করতেই সমাজকে জাগ্রত করা যাবে এবং যারা জাগ্রত করেন, সেই সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই আমরা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার কাজটি করে যাব।

বিভুদা বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। শ্রদ্ধা।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ,
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)

বিচারের অপেক্ষায় পরিবার

৩৩-এর পৃষ্ঠার পর

তার বুক। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই নিভে যায় জীবনপ্রদীপ।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কাফিলাতলী গ্রামের মো. বেলায়েত হোসেন ও রাশেদা বেগমের একমাত্র ছেলে ছিলেন শাকিল। তিন বোনের একমাত্র ভাই ছিল শাকিল। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ'র তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

শাকিলের বাবা মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, 'গুলি করে ওর বুকটা ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল। একজন বাবা হিসেবে এই দৃশ্য কোনোদিন ভুলতে পারব না।'

কথা বলতে গিয়ে বারবার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বাবা। তিনি জানান, ছেলেকে হারানোর পর থেকে তিনি ও তার স্ত্রী দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। 'মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠি। মনে হয় শাকিলকে দেখলাম। ওর মাও প্রায়ই ছেলেকে স্বপ্ন দেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুম থেকে উঠে', বলেন এই শহীদের বাবা।

সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তরা পূর্ব থানায় মামলা করেছেন বেলায়েত হোসেন। আইসিটিতেও ৭২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু এত সময় পেরিয়ে গেলেও তদন্ত বা বিচারিক অগ্রগতির বিষয়ে পরিবারকে স্পষ্ট কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তার।

তিনি বলেন, 'মামলার কী অবস্থা, সেটা আমরা জানি না। পুলিশ কোনো আপডেট দেয় না। বহুদিন আগে একবার থানায় ডেকেছিল। এরপর আর কিছু জানায়নি। বিচার হবে কি না, কবে হবে – এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাই না।'

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিবারটি প্রায় ৫০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। তবে বেলায়েত হোসেনের ভাষায়, 'আমার একটাই চাওয়া – আমার ছেলে হত্যার বিচার হোক। আমি শুধু ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় আছি।'

আলোকচিত্রী: আবরার প্রণয়

শহীদ সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, শুক্রবার। রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় জুমার নামাজের পর আন্দোলনের ছবি তুলছিলেন ফ্রিল্যান্স ফটোসাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। মাত্র ২৯ বছর বয়সে থেমে যায় একজন স্বপ্নবাজ তরুণের জীবন। মিলেছে জুলাই শহীদের স্বীকৃতি। প্রায় ৪০ লাখ টাকা অনুদান পেয়েছেন পরিবারটি।

প্রিয়র মা, সামসি আরা জামান কলি, বর্তমানে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের (জেএসএসএফ) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, আর্থিক সহায়তা পেলেও তার প্রধান দাবি বিচার। প্রিয়'র মা বলেন, 'আমি চাই না আর কোনো মা তার সন্তানকে এভাবে হারাক। যারা গুলি চালিয়ে আমার ছেলেকে মেরেছে, তাদের বিচার হোক। জুলাই এর নৃশংসতা যেন আর কখনও ফিরে না আসে।'

প্রিয়'র হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তাসহ আটজনকে আসামি করে নিউমার্কেট থানায় বাদী হয়ে মামলা করেন তার মা। পরে মামলাটি ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়। তবে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে হতাশ শামসি আরা জামান। তিনি জানান, পুলিশ কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করেনি। যত তথ্য-প্রমাণ আছে, তিনি নিজেই পুলিশকে দিয়েছেন।

সামসি আরা জামান কলি'র অভিযোগ, শুরুতে আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আর মামলার অগ্রগতির বিষয়ে যোগাযোগ করেনি। তিনি বলেন, 'অনেক ফোন দিয়েছি। সবাই বলেছে হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আমি সব আল্লাহ্'র ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'

আলোকচিত্রী: ওয়াসিমা জান্নাত মানহা

শহীদ সাংবাদিক আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাব

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, শুক্রবার। জুমার নামাজের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে সিলেট নগরী। বন্দরবাজারের মধুবন মার্কেট এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন, দৈনিক *নয়া দিগন্ত*-এর সিলেট ব্যুরো প্রধান ও দৈনিক জালালাবাদ এর সাংবাদিক আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাব। সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত নাম এটিএম তুরাব। শরীরে সাংবাদিক পরিচয়সংবলিত জ্যাকেট, মাথায় নিরাপত্তা হেলমেট – সবকিছুই পরিহিত ছিল। তবুও প্রাণ রক্ষা হয়নি তার।

তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তুরাব ছিলেন সবার ছোট। করোনাকালে মারা যান তার বাবা আব্দুর রহিম। তিনিও ছিলেন একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক। বাবার পথ অনুসরণ করেই সাংবাদিকতায় এসেছিলেন তুরাব।

এই শহীদ পরিবার জানান, সংবাদ সংগ্রহের সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় তার। বিয়ের মাত্র ২ মাস ৬ দিনের মাথায় থেমে যায় এই নবদম্পতির স্বপ্নের সংসার। তুরাবের মৃত্যুর পর সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেছেন তার স্ত্রী তানিয়া ইসলাম। লন্ডনপ্রবাসী তানিয়ার সঙ্গে ২০২৪ সালের ১২ মে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তুরাব। তানিয়ার এই নতুন জীবন শুরু না হতেই শেষ হয়ে যায়। তুরাবের পরিবার ৪০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। বিচার প্রশ্নে এই পরিবারও রয়েছেন অন্ধকারে।

বয়স ও অসুস্থতায় ন্যুব্জ তার বৃদ্ধ মা মমতাজ বেগম ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। তুরাবের ভাই আবুল আহসান মো. জাবুর বলেন, 'মা এখন খুব একটা কথা বলতে পারেন না। শারীরিক অবস্থা ভালো না। তারপরও মাঝেমধ্যে তুরাবের কথা জিজ্ঞেস করেন। ছেলেকে মনে করেন। আর একটা কথাই বলেন – আমার ছেলে হত্যার বিচার হবে না?'

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ভাইয়ের শরীরে সাংবাদিকের জ্যাকেট ছিল, মাথায় হেলমেট ছিল। সবাই বুঝতে পারার কথা যে সে একজন সাংবাদিক। তারপরও তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে। তার শরীর ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ সংগ্রহ করাটাই কী তার অপরাধ?'

তুরাব হত্যার ঘটনায় সিলেটের তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপকমিশনার, দুই থানার ওসি এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীসহ ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন তার বড় ভাই। বর্তমানে মামলাটি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে। তবে দুই বছর পেরিয়ে গেলেও মামলার দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই।

এই শহীদ সাংবাদিকের ভাই আরও বলেন, 'অনেকদিন আগে ট্রাইব্যুনাল থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিভিন্ন তথ্য নিয়েছেন। এরপর আর কোনো খবর পাইনি। থানা-পুলিশ থেকেও কোনো তথ্য জানানো হয়নি। জানি না মামলার কী অবস্থা, আদৌ বিচার দেখতে পারব কি না।'

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় হত্যার শিকার হন সাংবাদিক

আলোকচিত্র: পরিবারের সৌজন্যে

শহীদ সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক

প্রদীপ কুমার ভৌমিক। তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটি সবশেষ দৈনিক *খবরপত্র*-এর রায়গঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি এবং রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও শহীদ সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি মেলেনি তার। ফলে এই পরিবারটি প্রায় সকল সরকারি-বেসরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমনকি স্থানীয় কঠিন পরিস্থিতির কারণে পরিবারটি এখনও হত্যা মামলা দায়ের করতে পারেননি।

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট সকালেও অন্য দিনের মতোই সংবাদ সংগ্রহে বের হয়েছিলেন প্রদীপ কুমার ভৌমিক। সকাল ১১টার দিকে ছেলেকে ফোন করেছিলেন তিনি। ছোট ছেলে সুজন কুমার ভৌমিক সেই কথোপকথনের স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি। এই শহীদের সন্তান বলেন, 'বাবা বলেছিল, আমি প্রেস ক্লাবে আছি। বাইরে খুব ঝামেলা হচ্ছে। তোমরা সাবধানে থাকো। এটাই ছিল বাবার সঙ্গে আমার শেষ কথা।'

আধাঘণ্টা পর থেকেই সাংবাদিক প্রদীপের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। কিছু সময় পর খবর আসে, রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন প্রদীপ কুমার ভৌমিক। পরিবার ছুটে যান হাসপাতালে। পৌঁছে দেখতে পান প্রিয়জনের নিথর দেহ। সুজন বলেন, 'দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালে গিয়ে দেখি বাবা আর নেই। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দুনিয়াটা ভেঙে খানখান হয়ে যায়।'

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রেস ক্লাব ভবনের পাশেই ছিল তৎকালীন স্থানীয় আওয়ামী লীগের কার্যালয়। সেদিন সেখানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসময় কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী প্রেস ক্লাবে আশ্রয় নেন। পরে প্রেস ক্লাবেও হামলা হলে অন্যান্যদের সঙ্গে সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিকও হামলার শিকার হন। নির্মম মারধরে মৃত্যু হয় তার।

মা গীতা ভৌমিক মারা যাওয়ার পর প্রদীপ কুমার ভৌমিকই ছিলেন পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। ২০২৩ সালে বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক কষ্টে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন ছেলেরা। কিন্তু পরের বছরই হারাতে হয় পরিবারের প্রধান ভরসাকে। সুজন বলেন, 'বাবা ছাড়া আমাদের আর কেউ ছিল না। এখন মানবেতরভাবে দিন কাটছে। বড় ভাই একটা চাকরি করেন, আমি সাংবাদিকতা করি। তারপরও বাবার শূন্যতা এবং আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।'

বাবার পথ অনুসরণ করে তিনিও সাংবাদিকতা পেশায় এসেছেন। প্রথমে দৈনিক *সবুজ বাংলা*-য় কাজ করেছেন। বর্তমানে *কালের কণ্ঠ*-এর রায়গঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সেই পেশাগত পথও তার জন্য সহজ হয়নি। তার অভিযোগ, বাবাকে রাজনৈতিকভাবে, ভুলভাবে উপস্থাপন করায় এখনও নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হয়। 'আমাদের বাবা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন, রায়গঞ্জ উপজেলা সেক্রেটারিও ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তাকে আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে ট্যাগ দেওয়া হয়। অথচ তিনি কোনোদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না,' বলেন সুজন।

তিনি জানান, বাবাকে জুলাই শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং উপজেলা প্রশাসনের কাছে তিনবার আবেদন করেছেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই আবেদন বাতিল হয়েছে। 'যখনই বাবাকে নিয়ে কোনো সংবাদ প্রকাশ হয়, তখনও নানা প্রশ্ন ওঠে। চাপ আসে। কেন বাবার বিষয়টি সামনে আনা হচ্ছে, সেটাও জানতে চাওয়া হয়। এসব কারণে এখনও একটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়' বলেও জানান তিনি।

সবচেয়ে বড় আক্ষেপ এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখনও মামলা করতে পারেননি পরিবার। সুজনের ভাষায়, 'বাবার সঙ্গে ওইদিন আরও কয়েকজন নিহত হয়েছিলেন। স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় মামলা করতে গেলে নানা ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। তাই আমরা আর এগোতে পারিনি।'

সরকারিভাবে কোনো স্বীকৃতি না মেলায় তেমন আর্থিক সহায়তা পাননি এই পরিবার। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ১ লাখ ও বসুন্ধরা গ্রুপের পক্ষ থেকে ২০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে পরিবারটি। তবে সুজনের প্রশ্ন, 'বাবা সাংবাদিক পরিচয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা যান, কেন তাকে শহীদ সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না? কেন প্রেস ক্লাবের ভেতরে নিহত একজন সাংবাদিক এখনও এই রাষ্ট্রে শহীদদের তালিকায় জায়গা পেলেন না?'

আলোকচিত্রী: মৌসুমি আক্তার

শহীদ সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জি

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা সদর। পুলিশের সহিংসতা চলছিল। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বানিয়াচং থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন স্থানীয় সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জী। পরে তার মৃত্যু হয়। দৈনিক *লোকালয় বার্তা*-র প্রতিবেদক ছিলেন সোহেল আখঞ্জী। তার মৃত্যুর দিন একই ঘটনাস্থলে একজন শিশুসহ আরও ৮ জন নিহত হয়েছেন।

স্ত্রী মৌসুমি আক্তার এখন তিন সন্তানকে নিয়ে সংগ্রামের জীবন কাটাচ্ছেন। স্বজন বলতে পাশে দাঁড়ানোর মতো তেমন কেউ নেই। সরকারি সহায়তাসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় ৩৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। তিনি জানান, মাসিক সরকারি ২০ হাজার টাকা দিয়ে তিন সন্তান নিয়ে সংসার চালানো কঠিন।

তিনি বলেন, 'আমাগো পাশে দাঁড়ানোর মতো তেমন কেউ নাই। তিনডা বাচ্চা লইয়া কষ্ট কইরা জীবন চালাইতাছি। সরকার কিছু টাকা দিছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই টাকা দিয়া কী সারাজীবন চলব? বাচ্চাগো লেখাপড়া, খাওন-দাওন, ভবিষ্যৎ – সবকিছু নিয়া চিন্তা করতে হয়।' তার বড় মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলে ক্লাস ওয়ানে। ছোট মেয়ের বয়স তিন বছর।

মামলার বিষয়ে ক্ষোভ আর হতাশা একসঙ্গে ঝরে পড়ে তার কণ্ঠে। 'মামলার কথা কইয়া লাভ কী? যারা মামলা করছে, তারাই সব জানেন। আমরা তো কিছুই জানি না। বিএনপির ভাইয়েরা মামলা করছে। পরে আমি জিগাইছি মামলার কী অবস্থা। কেউ ঠিকঠাক কিছু কইতে পারেন না। তারা কইছে, ওসি স্যারের লগে কথা কও। এরপর ওসি স্যার কইছে, চার্জশিট এখনও হয় নাই। আর কিছুই জানি না।'

এই শহীদের স্ত্রী জানান, বানিয়াচংয়ের ৯জন নিহতের ঘটনায় একটি যৌথ হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় এই পরিবারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে পরিবারের কাছে কোনো তথ্য পৌঁছায় না।

স্বামী হত্যার বিচার চান মৌসুমি। তবে তার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ সন্তানদের ভবিষ্যৎ। সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার তিনডা বাচ্চার লেখাপড়ার দায়িত্ব যদি সরকার নিত, অনেক উপকার হইত। আর আমারে একটা চাকরির ব্যবস্থা কইরা দিলে বাচ্চাগো নিয়া বাঁচতে পারতাম। আমি যদি মরে যাই, তাইলে এই বাচ্চাগো দেখব কে?'

দুই বছর পরও বানিয়াচংয়ের সেই ঘরে সন্ধ্যা নামলে সন্তানরা বাবার গল্পে মেতে ওঠে। কেউ বাবার কবরের কথা বলে, কেউ ভাবে দূরে কোথাও চলে গেছে। আর তাদের মা অপেক্ষা করেন – একদিন হয়তো মামলার খবর আসবে, হয়তো বিচার হবে, হয়তো সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সাংবাদিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও শ্রম অধিকার

২৭-এর পৃষ্ঠার পর

আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আরও ৯০ দিন সময় দেয়ার বিধান রয়েছে। বাস্তবে ১৫০ দিনের মামলা নিষ্পত্তির উদাহারণ বিরল।

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে মালিকপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাওনা আদায় করা, সাংবাদিকের শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিক সংগঠনগুলো আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারে না বলেও অভিযোগ আছে। এই প্রসঙ্গে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপ্রধান মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, 'সুবিধা নিতে চান এমন সাংবাদিক নেতা এখনও আছে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি এই জায়গায় যাতে স্বচ্ছতার সাথে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ভূমিকা রাখেন এবং জবাবদিহিতার আওতায় থাকেন। ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে এবং রাষ্ট্রের কাছে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।'

অন্তর্বর্তী সরকার প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোলা চিঠিতে উল্লিখিত অভিযোগ – 'এর মধ্যে গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তার প্রেস বিভাগ তো মনখোলা নয়। মিডিয়ার যারা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তারা সবাই আতঙ্কে থাকেন সব সময়। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর! এর মধ্যে আমার একটি লেখার জন্য 'আজকের পত্রিকা'র অনলাইন বিভাগকে লালচোখ দেখানো হয়েছে।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে দৈনিক *আজকের পত্রিকা*-য় চাপ দেওয়া প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রেস সচিব শফিকুল আলমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ক্ষমতার কাঁধে চড়ে ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার উত্থান

সামিয়া রহমান প্রিমা

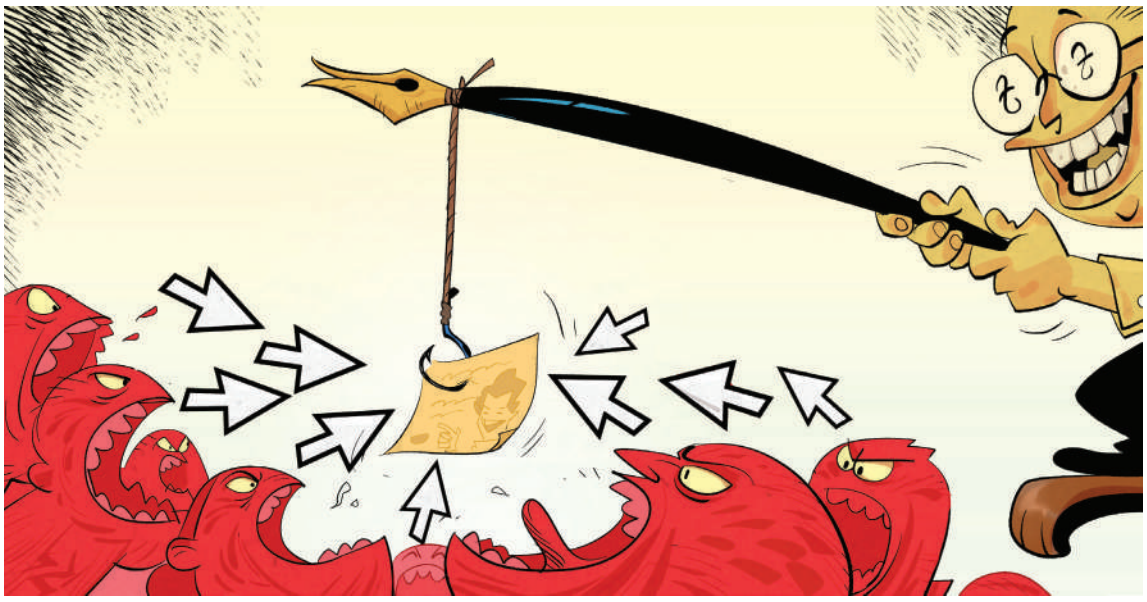

পাঠকদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলক শিরোনাম, লেখা, তথ্য ও উপস্থাপনার যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা মূলত 'ক্লিকবেইট' চর্চা। সংবাদমাধ্যমগুলোর এ ধরনের চর্চা কেবল উদ্দেশ্যমূলক নয়, কখনো কখনো বিভ্রান্তিমূলক, অসংবেদনশীল, অসম্মানজনক, অসম্পূর্ণ ও সংবাদমূল্যহীন একটি কনটেন্ট। সংবাদমাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্তার করার কারণে-বেশিরভাগ সাধারণ পাঠক এখান থেকেই তথ্য কিংবা সংবাদ জেনে নেন। আমরা অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমের সাথেও পরিচিত। এই অ্যালগরিদমের ফলে একজন পাঠক ক্লিকবেইট কনটেন্টে ক্লিক করলে একই ধরনের বিষয়বস্তু বারবার হোমপেজে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। এরকম ঘটে থাকলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ থেকেও পাঠক বঞ্চিত হন।

এছাড়া কম্পিউটার মেডিয়েটেড কমিউনিকেশন (CMC) কেবল যোগাযোগ ও প্রযুক্তির বিকাশকে অন্বেষণ করেনি, পাশাপাশি প্রযুক্তির সাথে মানব প্রজাতির দৈনন্দিন আচরণকে অধ্যয়ন করেছে, যা রজার সিলভারস্টোন এবং এরিক হার্শ 'domestication' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রযুক্তিগত কার্যকারিতার বাইরেও মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে প্রযুক্তি। (Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, 1992; Domestication of Media and Technology, 2005)

ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণকেও বিপথগামী করে। ক্লিকবেইট একটি অযাচিত কৌতুহল তৈরি করে, জ্ঞানগত ফাঁকফোকর তৈরি করে একটি অনুভুতিতাড়িত প্রতিক্রিয়া আদায় করে নেয়। তাই ক্লিকবেইট শুধু যে নির্ভরযোগ্য তথ্য বা বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট তৈরি করে তা না, ডিজিটাল পরিসরে মানুষের আচরণ এবং ক্লিকবেইট একে অপরকে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন গবেষণার মতে ক্লিকবেইটের সাথে যুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো ভুল তথ্যের বিস্তার। তাই ব্যবসায়িক সফলতার স্বার্থে সাংবাদিকতার অনলাইন ও অফলাইন জগতে এই অনৈতিক চর্চাকে প্রশ্ন করা জরুরি। কীভাবে ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা বিবদমান ক্ষমতার সর্ম্পককে আরও গতিশীল করে সেটা নিয়ে আলাপ গড়ে তোলা এখন অপরিহার্য। কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে সুড়সুড়ি বা জাতিগত আধিপত্যে হাওয়া দিয়ে সমাজকে আরও অসংবেদনশীলতার দিকে ঠেলে দেয় এবং পরিশেষে এই ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা – কীভাবে কাঠামোগত অবিচারকে টিকিয়ে রাখে তা স্পষ্টভাবে চিনতে পারা এখন সময়ের দাবি।

ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র সংসদ দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে একটি উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে ডিজিটাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করেছি। এই প্রচারণার মূলমন্ত্র ছিল ক্লিকবেইট এবং এই প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল অভিযানের বিপরীতে সমালোচনাকে আড়াল করে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সমর্থন উৎপাদন করা।

সাংবাদিকতার সাথে রাষ্ট্র-সরকার তথা ক্ষমতার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে যা সাংবাদিকতার ডিসকোর্সে যুগ যুগ ধরে আলোচিত। নোয়াম চমস্কি এবং এডওয়ার্ড এস. হারম্যান যেমন বলেছেন, সাধারণত অভিযানকেন্দ্রিক প্রচারণা অভিজাত শ্রেণির স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। (Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, 1988)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সংশ্লিষ্ট সর্বমিত্র চাকমাকে অনেকেই চিনে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও এর আশেপাশে উচ্ছেদ অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই উচ্ছেদ অভিযান দেশের সংবাদমাধ্যমে যেভাবে প্রচারিত হয়েছে – বিশেষ করে ডিজিটাল মিডিয়ায় যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে – তা 'ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা'র সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের অনন্য উদাহরণ।

সর্বমিত্রের অভিযানে ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার পুঁজি ছিল গরিব মানুষ, মাদক, ঘৃণা ও বিদ্বেষ। যেহেতু এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে ঢাবির ক্ষমতাসীন শিক্ষার্থী সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, ফলে নাগরিকবান্ধব চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে রাখা হয়েছে। মূলত শ্রেণীবিদ্বেষকে ব্যবহার করে এই অভিযানের সমর্থন যোগানোর কাজ করার মধ্য দিয়ে ক্লিকবেইট কনটেন্টের বিস্তার ঘটেছে। এই ঘটনায় দেশের প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের বেশ কয়েকটি শিরোনাম খেয়াল করুন।

১) *ঢাবিতে ভবঘুরে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে বিতর্কের জবাব দিলেন সর্বমিত্র চাকমা (সমকাল/ফেসবুক পেইজ, ৫ নভেম্বর ২০২৫)*

২) *বস্তায় লাঠিচার্জ করা হয়েছে এবং ভিতরে মাদক ছিল: সর্বমিত্র চাকমা (সমকাল/ফেসবুক পেইজ, ৬ নভেম্বর ২০২৫)*

৩৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রোকেয়া লিটা

সেই ১৮৩৫- এর 'The great moon hoax' (চাঁদে বসতির ঐতিহাসিক ভুয়াখবর) থেকে আপনি যতটা ভাবেন, ইতিহাসে তারও অনেক বেশি সময় ধরে হলুদ সাংবাদিকতা বিরাজমান। কিন্তু এটা কি অনন্তকাল টিকে থাকতে পারবে? কোনও একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম দেখে ক্লিক করে ভেতরে দেখা যায় যে শিরোনামে বলা বিষয়বস্তুর সঙ্গে মূল লেখার খুব সামান্যই মিল – এমন নিরাশজনক অভিজ্ঞতা প্রায় সব পাঠকেরই আছে। একে সাধারণত বলা হয় 'ক্লিকবেইট' সাংবাদিকতা।

সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার হওয়া খবরের লিংকগুলো এখন ক্লিকবেইটের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ। এসব লিংকে সাধারণত একটি চটকদার শিরোনামের সাথে থাকে চটকদার কোনও দৃশ্যগত উপস্থাপনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সন্ত্রাসী হামলার মতো সংবাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের চাঞ্চল্যকর শিরোনাম ব্যবহারের যৌক্তিকতা থাকলেও ক্লিকবেইট সংবাদগুলো মূলত এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করে এমন সব লেখার জন্য, যেগুলোর সংবাদমূল্য প্রায় নেই বললেই চলে। ধরা যাক, 'ক্যান্সার সম্পর্কে ১০টি তথ্য যা আপনার জানা জরুরি' – এ ধরনের শিরোনাম কৌতূহল জাগায় কারণ ক্যান্সার গুরুতর একটি রোগ। কিন্তু লিংকে ক্লিক করে ভেতরে ঢুকে হয়তো দেখা যাবে নতুন কোনও তথ্য লেখায় নেই।

সার্চ এঞ্জিন জার্নালের (Search Engine Journal) মতে, 'এটার কারণে ওটা (X reasons why)' বা 'এটা হল' (This is what)' ধরনের বাক্যাংশ ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি ক্লিক পাওয়া যায়। এ ধরনের লিংক আরও মনোযোগ কাড়ে যখন কোনও মূলধারার গণমাধ্যম এগুলো ব্যবহার করে। খবরের ভেতরে ঢুকে তেমন কিছুই না পেয়ে পাঠক হতাশ হতে পারেন ঠিকই কিন্তু তাতে সেই প্ল্যাটফর্মের কিছু যায় আসে না। একবার ক্লিক করলেই পাঠক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখতে বাধ্য হয়, যা ওই সংবাদ পরিবেশনকারী বা সামাজিক মাধ্যমের মূল আয়ের উৎস। তাই পাঠক লেখাটি পড়ল কি না তা নয়, এখানে বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো লিংকে ক্লিক করা।

'হলুদ সাংবাদিকতা' থেকে ইনফোমার্শিয়াল

সংবাদ শিরোনামে অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখার ভেতরে সেটা পূরণ না করার এই প্রবণতা আদতে আমাদের ধারণার আরও অনেক বেশি সময় ধরে চলে আসছে। ১৮০০ শতকে বিভিন্ন ছাপানো মাধ্যমে এ ধরনের প্রবণতার সূচনা হয়, তখন সাংবাদিকরা এর নাম দেয় 'ইয়েলো জার্নালিজম', বা 'হলুদ সাংবাদিকতা'। হলুদ সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করা যেন তারা বেশি বেশি পত্রিকা কিনতে উদ্বুদ্ধ হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সংবাদমাধ্যমের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। তাদের একজন ছিল জোসেফ পুলিৎজার, সে বিষয়ে আমরা পরে আসছি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সম্প্রচারমাধ্যমে এই প্রবণতা দেখা দেয় একটি ভিন্ন নামে: 'ইনফোমার্শিয়াল'। অফ-পিক সময়ে বিজ্ঞাপনে ভর্তি এই ইনফোমার্শিয়ালগুলো চলত, এবং এগুলোর প্রযোজকরা এমন ভান করত যেন তারা 'জীবন বদলে দেওয়া' তথ্য দিচ্ছেন। বর্তমানে অনেক অনলাইন প্রকাশনা অতিরঞ্জিত শিরোনামের মাধ্যমে পাঠককে তাদের ওয়েবসাইটে আকৃষ্ট করার ওপর নির্ভরশীল, যেখানে পাঠক ওয়েবসাইটে ঢোকামাত্রই নানান বিজ্ঞাপনের মুখোমুখি হয়।

ক্লিকবেইটের মূল লক্ষ্য হলো জনসাধারণের মনোযোগ কাড়ার জন্য চটকদার সংবাদ শিরোনাম তৈরি করা, যেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা কিংবা বিভ্রান্তিকর। সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুরু থেকেই এ ধরনের কৌশল বিদ্যমান। এই চর্চার সবচেয়ে পুরানো উদাহরণগুলোর একটি হলো 'Great moon hoax of 1835' (চাঁদে বসতির ঐতিহাসিক ভুয়াখবর ১৮৩৫)। *দ্য নিউ ইয়র্ক সান* নামের নিউ ইয়র্কের একটি পত্রিকা 'চাঁদে জীবনের সন্ধান পাওয়া গেছে' এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করে। সে সময় এই পত্রিকাটির বয়স মাত্র দুই বছর।

স্যার জন হার্শেল নামক একজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর তথাকথিত এই আবিষ্কারের গল্পটি বেশ কিছুদিন ধরে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু ভুয়া কিছু ছবিসহ প্রকাশিত এই খবরটি ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এটি ছিল অত্যন্ত সফল। প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জানা যায় যে পত্রিকাটির সম্পাদক রিচার্ড অ্যাডামস লক নিজেই এই ভুয়া খবরটি লিখেছিল। এরপরেও পত্রিকাটি বেশ ভালো জনপ্রিয় ছিল। মিথ্যা এই খবরের কারণে পত্রিকার কাটতিও বেড়েছিল।

১৯০০ শতকের শুরুতে উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্টের *নিউ ইয়র্ক জার্নাল* এবং জোসেফ পুলিৎজারের *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড* এর মধ্যকার প্রতিযোগিতা ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উভয় পত্রিকাই পাঠক টানতে চমকপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার করত যা বিভিন্নভাবে সাংবাদিকতার নৈতিকতা লঙ্ঘন করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সফলভাবে পাঠক আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

১৯৮৩ সালে *নিউ ইয়র্ক পোস্ট* এর সম্পাদক ভিনি মুসেতো – যাকে কেউ কেউ 'ক্লিকবেইটের গডফাদার' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন – তার পত্রিকার প্রথম পাতায় বিশাল এক শিরোনাম দেন: 'নগ্নবক্ষা বারে মাথাকাটা লাশ (Headless body in topless bar)।' খবরটি ছিল মূলত একজন বার মালিকের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। এই চমকপ্রদ শিরোনামের ভেতরের খবরে 'নগ্নবক্ষার (Toplessness)' কোনও উল্লেখ ছিল না, আর 'মাথাকাটা লাশে'র কথাও খবরের তৃতীয় অনুচ্ছেদের আগে আসেনি।

সাংবাদিকতার মৃত্যু?

আরও সাম্প্রতিক সময়ে, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে *সিএনএন* আলাস্কার ধর্ষণের হার নিয়ে একটি উত্তেজক শিরোনাম ব্যবহার করে। মিডিয়া প্রফেশনাল দ্বারা 'দেশের কোন রাজ্যে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি? জানলে অবাক হবেন।' ('What state has highest rate of rape in the country? It may surprise you') শীর্ষক শিরোনামটি সমালোচনার মুখোমুখি হলেও *সিএনএন* দাবি করে এরকম গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মনোযোগ আকৃষ্টকারী শিরোনাম দেওয়াটা যৌক্তিক।

কিছু গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য জনমানুষের মনে কৌতূহল তৈরি করতে চায়, কিন্তু বেশিরভাগ চায় লিংকে পাঠকের ক্লিক। সংবাদের গুরুত্ব বা জনস্বার্থ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ক্লিকবেইট নতুন কিছু না হলেও অনেকেই মনে করেন ডিজিটাল যুগে এটি সাংবাদিকতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এর একটি কারণ হলো মূলধারার গণমাধ্যম এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। প্রায় সব সংবাদ প্রতিষ্ঠানেরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক অ্যাকাউন্ট আছে। এগুলো সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও পাঠকের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। মূলধারার গণমাধ্যমগুলো হয়তো মনে করেছিল যে সামাজিক এই মাধ্যমগুলোতে কনটেন্ট প্রকাশ করলে তাদের গ্রাহকের সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু আদতে এর প্রভাব হয়েছে উল্টো।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূলধারার মিডিয়ার অবাধ প্রাপ্যতার কারণে পাঠকের আচরণ বদলে গিয়েছে। আগে যারা সরাসরি নিজেদের পছন্দের প্রকাশকের ওয়েবসাইটে যেত সংবাদ পড়ার জন্য, তারা এখন আর সেই প্রয়োজন বোধ করে না। তার ওপর, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো একই প্ল্যাটফর্মে সংবাদের পাশাপাশি বিনোদনেরও উৎস। যুক্তরাজ্যের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা

৩৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৩ দশকে ৭৫ সাংবাদিক হত্যা

(১৯৯৬-২০২৫)

১৯৯৬

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক নীল সাগর
হত্যা

১৯ জুন ১৯৯৬
স ম আলাউদ্দীন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক পত্রদূত
গুলি করে হত্যা

১৯৯৮

৩০ আগস্ট ১৯৯৮
সাইফুল আলম মুকুল
সংবাদমাধ্যম: ডেইলি রানার
গুলি করে হত্যা

২০০০

১৫ জানুয়ারি ২০০০
মীর ইলিয়াস হোসেন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক বীর দর্পণ
অপহরণের পর হত্যা

২০০২

৫ জুলাই ২০০২
শুকুর হোসেন
সংবাদমাধ্যম: অনির্বাণ
হত্যা

৩ আগস্ট ২০০২
সৈয়দ ফারুক আহমেদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক পূবালি বার্তা
হত্যা

২০০৪

১৫ জানুয়ারি ২০০৪
মানিক সাহা
সংবাদমাধ্যম: নিউ এজ ও বিবিসি
বোমা হামলায় নিহত

২৭ জুন ২০০৪
হুমায়ুন কবির
সংবাদমাধ্যম: জন্মভূমি
গুলি করে হত্যা

২০০৫

২৯ মে ২০০৫
মুহাম্মদ গোলাম মাহফুজ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক কুমিল্লা মুক্তকণ্ঠ
সন্ত্রাসী হামলায় খুন

১৭ নভেম্বর ২০০৫
গৌতম দাস
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সমকাল
গুলি করে হত্যা

২০০৬

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬
বেলাল হোসেন দফাদার
সংবাদমাধ্যম: জনবাণী
সন্ত্রাসী হামলায় খুন

৮ নভেম্বর ২০০৬
কামরুল হাসান চৌধুরী আলীম
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক দিনকাল
পারিবারিক হামলায় নিহত

২০০৯

২ ডিসেম্বর ২০০৯
আবুল হাসান আসিফ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক ইনকিলাব
দুর্বৃত্তদের হামলায় খুন

২০১০

২৮ এপ্রিল ২০১০
ফতেহ ওসমানী
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক ২০০০
দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত

৯ মে ২০১০
শফিকুল ইসলাম মিঠু
সংবাদমাধ্যম: এটিএন বাংলা
ছুরিকাঘাতে নিহত

২৩ ডিসেম্বর ২০১০
মনির হোসেন রাঢ়ী
বরিশালের মুলাদী প্রেসক্লাবের সভাপতি
কুপিয়ে হত্যা

২০১২

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
মেহেরুন নাহার রুনি
সংবাদমাধ্যম: এটিএন বাংলা
নিজ বাসায় খুন

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
গোলাম মুস্তফা সরওয়ার সাগর
সংবাদমাধ্যম: মাছরাঙা টিভি
নিজ বাসায় খুন

১৫ জুন ২০১২
জামাল উদ্দিন
সংবাদমাধ্যম: গ্রামের কাগজ
কুপিয়ে হত্যা

১০ জুলাই ২০১২
জুনায়েদ আহমেদ জুনেদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক বিবিয়ানা
লাশের টুকরো উদ্ধার

২০১৩

২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
আফতাব আহমেদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক ইত্তেফাক
শ্বাসরোধ করে হত্যা

২০১৪

২ মার্চ ২০১৪
শাহ আলম সাগর
সংবাদমাধ্যম: অপরাধ দমন
থানার ছাদ থেকে ফেলে হত্যা

২৮ মার্চ ২০১৪
দেলোয়ার হোসেন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সমাচার
কুপিয়ে হত্যা

২১ মে ২০১৪
সদরুল আলম নিপুল
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক মাথাভাঙ্গা
লাশের টুকরো উদ্ধার

২০১৭

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
আবদুল হাকিম শিমুল
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সমকাল
আওয়ামী লীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলিতে হত্যা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
আবুল কালাম আজাদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক যুগান্তর
দুর্বৃত্তদের হামলায় খুন

২০১৮

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
মো. শাহ মনির পলাশ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক রূপবাণী
দুর্বৃত্তদের হামলায় খুন

১১ জুন ২০১৮
শাহজাহান বাচ্চু
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক আমার বিক্রমপুর
কুপিয়ে হত্যা

২০২০

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০
নাম: জুলহাস উদ্দিন
সংবাদমাধ্যম: বিজয় টিভি
প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা

১১ অক্টোবর ২০২০
মো. ইলিয়াস হোসেন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক বিজয়
ছুরিকাঘাতে হত্যা

২০২১

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১
বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার, বার্তা বাজার
আওয়ামী লীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলিতে হত্যা

২০২২

১৩ এপ্রিল ২০২২
মহিউদ্দিন সরকার নাঈম
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক কুমিল্লার ডাক
সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন

২০২৩

২৯ অক্টোবর ২০২৩
রফিক ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক
বিএনপির সমাবেশে পুলিশি হামলার শিকার ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু

২০২৪

২ মার্চ ২০২৪
তালুকদার মাসুদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক ভোরের ডাক
প্রেসক্লাবে হামলায় আহত হয়ে মৃত্যু

১৮ জুলাই ২০২৪
মেহেদী হাসান
সংবাদমাধ্যম: ঢাকা টাইমস
গুলি করে হত্যা

১৮ জুলাই ২০২৪
শাকিল হোসেন পারভেজ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক ভোরের আওয়াজ
গুলি করে হত্যা

২০২৫

২৫ জুন ২০২৫
খন্দকার শাহ আলম
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক মাতৃজগত
পিটিয়ে হত্যা

৭ আগস্ট ২০২৫
আসাদুজ্জামান তুহিন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ
প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
এমদাদুল হক মিলন
সংবাদমাধ্যম: বর্তমান সময় । শলুয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি
গুলি করে হত্যা

২০০০

১৬ জুলাই ২০০০
শামসুর রহমান
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক জনকণ্ঠ
বোমা হামলায় নিহত

২০০১

২১ এপ্রিল ২০০১
নাহার আলী
সংবাদমাধ্যম: অনির্বাণ
গুলি করে হত্যা

২০ জুলাই ২০০১
আহসান আলী
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক যুগান্তর
হত্যা

২০০২

২ মার্চ ২০০২
হারুনুর রশীদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক পূর্বাঞ্চল
গুলি করে হত্যা

২০০৪

২২ আগস্ট ২০০৪
কামাল হোসেন
সংবাদমাধ্যম: আজকের কাগজ
হত্যা

২ অক্টোবর ২০০৪
দীপংকর চক্রবর্তী
সংবাদমাধ্যম: দুর্জয় বাংলা
ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা

২৪ অক্টোবর ২০০৪
শহীদ আনোয়ার
সংবাদমাধ্যম: ডেইলি এশিয়ান এক্সপ্রেস
মাথায় গুলি করে হত্যা

২০০৫

১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
শেখ বেলালউদ্দীন আহমেদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সংগ্রাম
বোমা হামলায় নিহত

২০০৯

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
আতিকুল ইসলাম আতিক
সংবাদমাধ্যম: এনটিভি
গুলি করে হত্যা

৩ জুলাই ২০০৯
নূরুল ইসলাম রানা
সংবাদমাধ্যম: পাক্ষিক মুক্তমন
লাশ উদ্ধার

২৬ আগস্ট ২০০৯
এমএম আহসান হাবীব বারী
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়
দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন

২ অক্টোবর ২০০৯
আবদুল হান্নান
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক রূপালী দেশ
সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন

২০১১

২৮ জানুয়ারি ২০১১
ফরহাদ খাঁ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক জনতা
গলা কেটে হত্যা

৭ এপ্রিল ২০১১
আলতাফ হোসেন
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠ
বাসা থেকে লাশ উদ্ধার

৭ এপ্রিল ২০১১
মাহবুব টুটুল
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, সাপ্তাহিক সংবাদচিত্র
ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার

৭ ডিসেম্বর ২০১১
ফরিদুল ইসলাম রঞ্জু
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক ভোরের ডাক
গলা কেটে হত্যা

২০১২

২৩ অক্টোবর ২০১২
তালহাদ আহমদ কাবিদ
সংবাদমাধ্যম: নরসিংদী বাণী
দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত

২০১৩

১৫ জানুয়ারি ২০১৩
মাহমুদুল হাসান তারেক
সংবাদমাধ্যম: নিউ এজের শিক্ষানবিশ রিপোর্টার
রেলক্রসিং থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশ উদ্ধার

১৬ জানুয়ারি ২০১৩
দুর্জয় চৌধুরী দিপু
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক অপরাধ দমন
সন্ত্রাসীদের গুলিতে হত্যা

১৯ জানুয়ারি ২০১৩
ফারুক আহমেদ
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক মূলস্রোত
দুর্বৃত্তদের গুলিতে খুন

২০১৫

৭ জুলাই ২০১৫
আবু সায়েম
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সমকাল
দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন

৮ অক্টোবর ২০১৫
মুশফিকুর রহমান তুহিন
সংবাদমাধ্যম: সাপ্তাহিক অপরাধ জগৎ
দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন

২৩ ডিসেম্বর ২০১৫
আওরঙ্গজেব সজীব
সংবাদমাধ্যম: ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি, বাংলাদেশ প্রতিদিন
নদী থেকে লাশ উদ্ধার

২৪ ডিসেম্বর ২০১৫
মশিউর রহমান উৎস
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক যুগের আলো
শ্বাসরোধ করে হত্যা

২০১৮

২৮ আগস্ট ২০১৮
সুবর্ণা আক্তার নদী
সংবাদমাধ্যম: আনন্দ টিভি, দৈনিক জাগ্রত বাংলা
প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

২০১৯

২১ মে ২০১৯
ইহসান ইবনে রেজা ফাগুন
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক যুগের আলো
মরদেহ উদ্ধার

৩১ জুলাই ২০১৯
শাহজাদা মিয়া আজাদ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন,
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, রংপুর বেতার
হত্যা

২৭ অক্টোবর ২০১৯
শিরিন খানম
সংবাদমাধ্যম: আজকের ক্রাইম নিউজ
রহস্যজনক মৃত্যু

২০২২

৬ জুন ২০২২
আবু জাফর প্রদীপ
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক সরেজমিন বার্তা
হত্যা

৭ জুলাই ২০২২
হাসিবুর রহমান রুবেল
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক আমাদের নতুন সময়
নদী থেকে লাশ উদ্ধার

২০২৩

৯ জানুয়ারি ২০২৩
আশিকুল ইসলাম
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক পর্যবেক্ষণ
ছুরিকাঘাতে হত্যা

১৫ জুন ২০২৩
গোলাম রব্বানী নাদিম
সংবাদমাধ্যম: একাত্তর টিভি, বাংলা নিউজ ২৪
সন্ত্রাসী হামলায় খুন

২০২৪

১৯ জুলাই ২০২৪
তাহির জামান প্রিয়
সংবাদমাধ্যম: ফ্রিল্যান্স
গুলি করে হত্যা

১৯ জুলাই ২০২৪
আবু তাহের মো তুরাব
সংবাদমাধ্যম: নয়া দিগন্ত, দৈনিক জালালাবাদ
গুলি করে হত্যা

৪ আগস্ট ২০২৪
প্রদীপ কুমার ভৌমিক
সংবাদমাধ্যম: দৈনিক খবরপত্র
হত্যা

৫ আগস্ট ২০২৪
সোহেল আখঞ্জী
সংবাদমাধ্যম: লোকালয় বার্তা
গুলি করে হত্যা

সূত্র: বাংলা উইকিপিডিয়া, Committee to Protect Journalists (CPJ) ও বিভিন্ন সংবাদপত্র

সাগর-রুনি হত্যা মামলা

অন্তর্বর্তী আমলেও তদন্তে একই আওয়ামী-দীর্ঘসূত্রিতা

‘১৪ বছর হয়ে গেল! এখনও আমি জানি না কেন, বা কারা, আমার মা আর বাবাকে হত্যা করেছিল। আমি এটাও জানি না, কোনোদিন জানতে পারব কি না কেন তাদের হত্যা করা হয়েছিল। দেশের বিচারব্যবস্থা ও পুরো সিস্টেম নিয়ে আমি কতটা হতাশ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।’

মাহির সারওয়ার মেঘ
সাংবাদিক মেহেরুন রুনি ও সাগর সরওয়ারের ছেলে

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্তের আশ্বাস দেন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উচ্চ আদালত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার আদেশ দেন

২৩ অক্টোবর ২০২৪

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধানকে আহবায়ক করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে

২২ এপ্রিল ২০২৫

নির্ধারিত সময়রে মধ্যে তদন্ত শেষ হয়নি জানিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আরও ৯ মাস সময় আবেদন করলে উচ্চ আদালত আরও ৬ মাস সময় অনুমোদন করে

২৩ অক্টোবর ২০২৫

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স আবারও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয় এবং সময় চেয়ে আবেদন করলে উচ্চ আদালত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য চূড়ান্ত সময় বেধে দেন ২৩ এপ্রিল ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছর গড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার দূরের কথা, পুলিশি তদন্তে কোনো অগ্রগতি হয়নি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও। এখন পর্যন্ত মোট ১২৬ বার এই হত্যা মামলায় আদালতে পুলিশি তদন্ত জমা দেওয়ার তারিখ পেছানো হয়েছে। ঘটনার প্রথম ১২ বছরে শেখ হাসিনার আমলে তদন্তের সময় বাড়ানো হয়েছে ১১২ বার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে পুলিশ সময় নিয়েছে আরও ১২ বার। সাগর-রুনি হত্যা দেশের সবচেয়ে আলোচিত, দীর্ঘ ও অমীমাংসিত মামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দুঃশাসনের পতন হলেও মামলা ও বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতায় আদতে কোনো সংস্কার ঘটেনি।

মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক ছিলেন গোলাম মুস্তফা সরওয়ার সাগর এবং মেহেরুন নাহার রুনি, এটিএন বাংলা-র জেষ্ঠ প্রতিবেদক ছিলেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার পূর্ব রাজাবাজর এলাকার ভাড়া বাসায় তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের হত্যাকাণ্ড দেশে-বিদেশে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে। তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেছিলেন, ‘৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে।’ আদতে সরকার খুনিদের আড়াল করতেই ব্যস্ত ছিল।

অর্ন্তবতীকালীন সরকার দায়িত্বগ্রহণের দশ দিন পর, ১৮ আগস্ট ২০২৪, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির মামলা নিয়ে প্রহসন হয়েছে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পুনঃতদন্তদের মাধ্যমে বিচার হবে। পরবর্তীতে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডসহ বহুল আলোচিত পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বাস্তবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্সের তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

মামলা ও তদন্তের আদ্যোপান্ত

সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। হত্যাকাণ্ডের চার দিন পর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে মামলার তদন্ত হস্তান্তর করা হয়। দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল উচ্চ আদালতে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। তখন থেকে মামলাটির তদন্ত করছে র‍্যাব এবং শতাধিকবার তদন্ত জমা দেওয়ার সময় পিছিয়েছে এই বাহিনী।

> আসলে আমরা এখনও হত্যার মোটিভ ও আসামিদের চিহ্নিত করতে পারিনি। এখন পর্যন্ত আমরা হতাশ। মামলার তদন্তে কোনও অগ্রগতি নাই। আগে যা ছিল, সেই অবস্থাতেই আছে।
>
> **মো. মুস্তফা কামাল**
> *টাস্কফোর্স প্রধান ও অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক*

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর, সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে চার সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রে বলা হয়, ছয় মাসের মধ্যে টাস্কফোর্সকে এই হত্যা মামলার তদন্ত শেষ করে আদালতে জমা দিতে হবে। তবে টাস্কফোর্স গঠনের পর এই নিয়ে দুইবার তারা সময় চেয়ে উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করেছে। সর্বশষে ২৩ অক্টোবর ২০২৫, উচ্চ আদলতের শুনানিতে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ বলেন, ‘অনেকেই নাই-বা বাইরে চলে গেছে, অনেকে ঠিকানা পরিবর্তন করেছে। তাদের খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে। তদন্ত সোজা জিনিস নয়।’

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে জার্মান ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম *ডয়চে ভেলে বাংলা*-য় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে টাস্কফোর্সের প্রধান, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুস্তফা কামাল এই মামলার তদন্ত প্রসঙ্গে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আসলে আমরা এখনও হত্যার মোটিভ ও আসামিদের চিহ্নিত করতে পারিনি। এখন পর্যন্ত আমরা হতাশ। মামলার তদন্তে কোনও অগ্রগতি নাই। আগে যা ছিল, সেই অবস্থাতেই আছে।’

তিনি আরও জানান, পূর্বে আটক হওয়া ৮ জনের ক্ষেত্রে এই হত্যাকাণ্ডের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া আরও ২৫ জনের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে যা ম্যাচ করেনি। সবমিলিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এখনও অন্ধকারেই আছেন বলে স্বীকার করেন পুলিশের এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

পিবিআই’র তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মামলাটির সব আলামত ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে কিছু ছবি ও ভিডিও ফুটেজ ছাড়া আর কোনো আলামত তাদের কাছে নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাগর সরওয়ারের মা সালেহা মনির তার সন্তান হত্যার ১৪ তম বার্ষিকীতে গণমাধ্যমে বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার সাগর-রুনি নিয়ে কোনো কাজই করেনি। ওনাদের প্রতি অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু ১৭ মাস পরও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। আমি আশাহত।’

মেহরুন রুনির ভাই, এই হত্যা মামলার বাদী নওশের আলম হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, ‘সরকারের মনোভাব অনেকটা চাবি ভেতরে রেখে, বাইরে থেকে তালা খোলার চেষ্টা করার মতন। ন্যায়বিচারের আশা করতেও এখন ভয় লাগে।’

সর্বশেষ ২৭ এপ্রিল ২০২৬, টাস্কফোর্স উচ্চ আদলতে আবারও তদন্ত শেষ পর্যায়ে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুঁজে না পাওয়ার কারণে দেরী হচ্ছে জানিয়ে আবারও সময় আবেদন করলে, আদালত আরও ৬ মাস সময় দেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত ৬ সাংবাদিক

বিচারের অপেক্ষায় পরিবার

আরমান ভূঁইয়া

২০২৪ সালের রক্তাক্ত জুলাই। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন দল-মত নির্বিশেষে এদেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ। মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও উঠে আসেনি নৃশংসতার প্রকৃত চিত্র। তথ্যপ্রবাহ প্রায় স্থবির। এই বাস্তবতায়, মাঠের সাংবাদিকরা ঝুঁকি জেনেও পুলিশের মুহুর্মুহু গুলির মুখে ঘটনাস্থলে থেকেছেন, ছবি-ভিডিও ধারণ করেছেন, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৬ জন সংবাদকর্মী। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় ৩ জন, সিলেটে ২ জন এবং সিরাজগঞ্জে ১ জন সাংবাদিক রয়েছেন। পাশাপাশি আহত হয়েছেন দুইশতাধিক সাংবাদিক। প্রবল জনরোষে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীতে রাষ্ট্র নিহত সাংবাদিকদের 'জুলাই শহীদ সাংবাদিক' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলো এই পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। তবে থমকে আছে বিচারব্যবস্থা। গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পর পরিবারের কাছে স্বীকৃতির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূলধারার সাংবাদিক সংগঠনগুলো শহীদ সাংবাদিক পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রসিকিউটর আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, 'নিহত সাংবাদিকদের মামলা আইসিটিতে তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এ মুহূর্তে মামলার অগ্রগতি বা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।' তদন্তে অগ্রগতি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি জানান, আগামী অক্টোবরের মধ্যে কয়েকটি তদন্ত প্রতিবেদন হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

আলোকচিত্র: পরিবারের সৌজন্যে

শহীদ সাংবাদিক মেহেদী হাসান

জুলাই আন্দোলনের শহীদ সাংবাদিকদের একজন *ঢাকা টাইমস*-এর সিনিয়র রিপোর্টার মেহেদী হাসান। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন হাসান মেহেদী নামে। ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনি। মৃত্যুর সময় তার ছোট মেয়ে, মেহের আসবিন আনিশার বয়স ছিল মাত্র সাত মাস। বড় মেয়ে, মায়মুনা বিনতে নিশার বয়স তখন ৩ বছর।

কেরানীগঞ্জের ভাড়া বাসায় দুই সন্তানকে নিয়ে থাকেন স্ত্রী ফারহানা ইসলাম পপি। স্বামীর স্মৃতিগুলোই এখন তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। পপি বলেন, 'আমার ছোট মেয়েটা বাবাকে সেভাবে পায়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে হাজারও ছবির মধ্যে তার বাবার ছবিটা ঠিক চিনে ফেলে।'

মেহেদীর মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলাটি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে। তবে অভিযুক্ত প্রধান পুলিশ সদস্য কয়েক মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে পরিবারকে জানানো হয়েছে। এই তথ্য জানার পর পপির মনে হয়েছে, একটি প্রশ্ন আর কোনোদিন করা হবে না। তিনি বলেন, 'যে মানুষটা আমার স্বামীকে খুন করছে, তাকে একটা প্রশ্ন করার খুব ইচ্ছা ছিল। জানতে চেয়েছিলাম আপনি কী রাতে ঘুমাতে পারেন? আপনার কী ঘুম হয়? আমার সন্তান আজও বাবার জন্য কাঁদে, রাতে ঘুমাতে পারে না। আপনি কী আপনার সন্তানকে বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন? এই প্রশ্নটা তাকে আর করা হলো না।'

ঘটনার দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক মিনিট আগেও মেহেদী আন্দোলনের ভয়াবহ পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। ফ্লাইওভারের ওপর থেকে তিনি একটি চিরকুট নিচে ফেলেছিলেন। সেখানে লেখা ছিল, 'ভাই, উপরে অনেক লাশ। শিক্ষার্থীদের অঝোরে গুলি করে মারা হচ্ছে।' পরিবারের দাবি, ওই বার্তা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। রাবার বুলেটের গুলিতে মেহেদীর মুখ, বুক ও সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়। বুকে স্পষ্ট ছিল বুট জুতার পায়ের ছাপ।

মেহেদীর বাবা, প্রবীণ সাংবাদিক মোশাররফ হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত। ছেলের মৃত্যুর পর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। মেহেদীর মা, মাহমুদা বেগম অসুস্থ। মেহেদীর মেজো ভাই বিয়ে করেছেন, ঢাকায় থাকেন। ছোট ভাই নবম শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ভাই ও অসুস্থ মাকে নিয়ে মেহেদীর বাবা পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামে থাকেন। সেখানেই প্রথম সন্তান মেহেদীকে দাফন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'প্রতিদিন ছেলের কবরে যাই। ছেলে হারানোর কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমরা যেন জীবিত থেকেও মৃত মানুষের মতো দিন কাটাচ্ছি।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে পরিবারটি। মেহেদীর মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানরা প্রায় ৪৫ লাখ টাকা পেয়েছেন। এসকল আর্থিক সহায়তা সংকট কিছুটা লাঘব করতে পারে। কিন্তু পরিবারের প্রিয়জনের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।

মামলার অগ্রগতি নিয়েও হতাশা রয়েছে পরিবারের। মেহেদীর বাবা বলেন, 'আদৌ আমার ছেলে হত্যার বিচার দেখতে পারব কি না জানি না। আমি শুধু চাই, যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।'

আলোকচিত্র: জুলাই রেভ্যুলেশনারি অ্যালায়েন্স

শহীদ সাংবাদিক শাকিল হোসেন পারভেজ

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই, দুপুরে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন দৈনিক *ভোরের আওয়াজ*-এর রিপোর্টার শাকিল হোসেন পারভেজ। বিএনএস সেন্টারের সামনে আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করার সময় গুলিবিদ্ধ হয় *২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা

'সাংবাদিক হত্যার বিচারের দৃষ্টান্ত তৈরি হোক'

আবুল হাসান, *গাজীপুর*

প্রকাশ্যে শত শত মানুষের সামনে নৃশংস হত্যার শিকার হন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন। ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ রাতে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় সন্ত্রাসীদের একটি দল এলোপাথাড়ি কুপিয়ে তাকে হত্যা করে। দৈনিক প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে মামলার স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়নি। বিচার প্রক্রিয়ায় ধীরগতি রয়েছে জানিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিহতের স্বজন ও সাংবাদিক সহকর্মীরা। স্বজনরা জানিয়েছেন, একমাত্র উপার্জনক্ষম প্রিয়জনকে হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে পরিবার।

নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তুহিন গাজীপুর মহানগরীর পালের মাঠ এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তার পাঁচ ও দুই বছর বয়সী দুটি ছেলে রয়েছে। তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি একটি ইউনানি ওষুধ কোম্পানির সাথেও কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় স্থানীয় মসজিদ মার্কেটের সামনে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে। হত্যাকান্ডের দিন ৬/৭ জন যুবক দা ও চাপাতি নিয়ে বাদশা মিয়া নামে একজন ব্যক্তিকে ধাওয়া করছিলেন। তা দেখতে পেয়ে পেছনে ছুটে মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করছিলেন সাংবাদিক তুহিন, এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখতে পায়। জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি দৌড়ে ঈদগাহ (মসজিদ) মার্কেটের চা-পান বিক্রেতার দোকানে আশ্রয় নেন। সন্ত্রাসীরা সেখানে গিয়ে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে, গলায়, কাঁধে ও পিঠে এলোপাতাড়িভাবে কোপায় – ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার কিছু সময় আগে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি দোকানে বসে ছিলেন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান ও তার সহকর্মী শামীম হোসেন। সহকর্মী শামীম ঘটনার বর্ণনায় বলেন, চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় আমরা দুজন হেঁটে যাচ্ছিলাম। এসময় একজন নারী ও পুরুষ আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যান। এর কিছু সময় পর কয়েকজন লোক দেশি ধারালো অস্ত্র নিয়ে বলতে থাকে, 'এই পাইছি, তোরা আয়'। এসময় ওই পুরুষ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে ধাওয়া করেন। এই অবস্থা দেখে তুহিন মুঠোফোন বের করে তাদের পেছনে দৌড়াতে থাকে। পরে আমি তুহিনকে খুঁজতে এগিয়ে যাই। অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা হঠাৎ থেমে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে তুহিনকে ভিডিও ধারণ করতে দেখে। আমি চৌরাস্তা এলাকায় পুলিশের গাড়ি খুঁজতে থাকি। কোনো গাড়ি দেখতে না পেয়ে বাসন থানার ওসিকে ফোন করি। কিছু সময় পর পুলিশ আসে।

শামীম হোসেন আরও বলেন, 'এই হত্যায় জড়িতদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই যেন বাংলাদেশের মানুষ দেখে সাংবাদিক হত্যার বিচার হয়েছে। এর আগে সাংবাদিক হত্যার বিচার হয়নি, আমরা সাংবাদিক পরিবার চাই এ হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক, দৃষ্টান্ত তৈরি হোক যেন বলতে পারি, বিচার আমরা পাইছি।'

এ ঘটনায় নিহতের ভাই সেলিম হোসেন বাদী হয়ে বাসন থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে পুলিশ এই হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিল করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ঘটনার মূল হোতা

আলোকচিত্র: পরিবারের সৌজন্যে

নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন

মো. মিজান ওরফে কেটু মিজান, তার স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপি, ছিনতাইকারী মো. স্বাধীন, আল আমিন, মো. শাহজালাল, মো. ফয়সাল হাসান, সুমন ওরফে সাব্বিরসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাসন থানার উপ-পরর্দিশক দুলাল চন্দ্র দাস মূল হোতা কেটু মিজানসহ জড়িত ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। উল্লেখ্য, এই চক্র গাজীপুরের বাসন, ভোগড়া ও চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সক্রিয়। আসামিদের বিরুদ্ধে এর আগে থেকেই বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট প্রশান্ত দাস জানান, বিচারিক প্রক্রিয়া এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত ১১ জনের মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মো. শাহজালাল নামে আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। এই মামলায় অন্তত ২০ জনের স্বাক্ষ্য নিতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মামলার রায় হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আইনজীবী।

নিহত আসাদুজ্জামান তুহিনের স্ত্রী ফরিদা ওরফে মুক্তার সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। স্বামীর অকাল মৃত্যু মানতে পারছেন না তিনি। মুক্তা বলেন, '৮ মাস হলো তুহিন আমাদের মাঝে নেই। সংসার চালাতে মহানগরের হাড়িনাল এলাকায় একটি কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছি। সেখান থেকে ৯ হাজার টাকা বেতন পাই। খরচ বাঁচাতে বড় ছেলে তকি হাসানকে গ্রামের বাড়িতে রাখছি। এখানে ছোট ছেলেকে নিয়ে আছি। ঘর ভাড়া যাতে না দিতে হয় এই জন্য আমরা মাদ্রাসার ভেতরে থাকি।'

'যে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করার অপরাধে আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, ঘটনার পর থেকে তুহিনের সেই মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে চাইছিলাম কিন্তু পুলিশ বলেছে, মামলা দায়ের হয়েছে, জিডির প্রয়োজন নেই। এখন হত্যাকাণ্ডের ৮ মাস পার হলেও পুলিশ মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করতে পারেননি,' জানান তুহিনের স্ত্রী মুক্তা।

বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মুক্তা আরও বলেন, 'প্রকাশ্যে তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। এখনও মামলার রায় দেয়নি। কবে নাগাদ স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হবে তার কিছুই জানি না। আমরা চাই অপরাধীদের ফাঁসি হোক।' বিচারপ্রক্রিয়া ধীরগতি হলে আসামিরা জামিনে বের হয়ে যাবেন কি না এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেন তুহিনের পরিবার।

‘হাইব্রিড রেজিমের যুগে, হাইব্রিড মিডিয়া সিস্টেমে ওয়ান মিডিয়া, ওয়ান ওনার থিওরি আর খাটে না’

১০-এর পৃষ্ঠার পর

আপনি পত্রপত্রিকা দেখেন, যদি সত্যিকার অর্থে ওই আইনটা ফলো করতে চায়, তাহলে ওই দিন ৫০ শতাংশ সাংবাদিক জেলে যাবে। আপনি এখানে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন দিয়ে কী করবেন? আপনি মিডিয়া পলিসি দিয়ে কী করবেন?

মীর হুযাইফা আল মামদূহ: মিডিয়া ফ্রিডম নিয়ে যে সব ডোনার-ফান্ডেড প্রকল্প আছে, সেখানে ফ্যাক্ট চেকিংকে বেশ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভুয়া তথ্য বা সংবাদ উৎপাদন ও প্রবাহের যে রাজনীতি আছে, সেটা এসব প্রকল্পে আমলে নেওয়া হয় না। ফ্যাক্ট চেকিং প্রসঙ্গে কমিশনের সুপারিশকে আপনি কি এই এনজিওয়াইজড ডিসকোর্সের প্রভাব বলে মনে করেন?

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী: ওই যে বললাম, বাজওয়ার্ড। কখনো সিটিজেন জার্নালিজম, কখনো কিডস জার্নালিজম, কখনো এআই। কোনো দেশ প্রতি বছর, বা পাঁচ বছর পরপর একটা ডোনেশন দেয়। ডোনেশন দেবে, এখন বাজওয়ার্ড কী? ফ্যাক্ট চেকিং। আর উইদিন সিক্স মান্থস, ফ্যাক্ট চেকিং শব্দটা কেউ শুনবেই না। এটা এআই টুলসের অংশ হয়ে যাবে। আপনি এখন দেখেন, গুগল লেন্স কী বলছে? গুগল রিভার্স ইমেজকে গুগল নিজেই বলছে, এটা আমার এআই টুল। সো ফ্যাক্ট চেকিং আলাদা করে আর থাকবে না। যেরকম একসময় সিটিজেন জার্নালিস্ট শব্দটা খুব শুনতেন। পুরো প্রফেশনটাই নষ্ট করার জন্য। কারণ এগুলো বাজওয়ার্ড। ডোনাররা টাকা দেয় এই বাজওয়ার্ড ধরে।

একসময় শুনতেন ক্লাইমেট জার্নালিজম। এখন শুনেন? ক্লাইমেট কি মরে গেছে? এখন নাই? কারণ হলো, ওই বাজওয়ার্ডের এক্সপায়ারি ডেট শেষ। এগুলো মৌসুমি শব্দ। ওরা মৌসুমী ওয়ার্ড বানায়। এভরি ইনভেস্টমেন্ট কামস উইথ অ্যান ইনটেনশন। আপনি তাদের ইনটেনশন পুরোপুরি মেনে নেবেন না। বলবেন, ভাই, তুমি ৫০ শতাংশ দাও তোমার মতো করে, আর ৫০ শতাংশ এই প্রয়োজনটা দাও। এতদিন ধরে ক্লাইমেট জার্নালিজমে ডোনেশন আসছে। একটা প্রতিষ্ঠানও কি দাঁড় করানো গেছে, যেটা শুধুই ক্লাইমেট রিপোর্টিং নিয়ে নিউজ করবে? তাহলে কেন? অথচ যত টাকা খরচ হয়েছে, তার ২৫ শতাংশ আমাকে দিলে আমি চারটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারতাম। এটা তো ক্লায়েন্টের সম্পর্ক। আপনি ক্লায়েন্টকে বোঝাবেন, আপনার ৫০, আমার ৫০।

এখন এআই শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে নিউজ গ্যাদারিং থেকে শুরু করে নিউজ ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত, এমনকি কেউ যদি নিজে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট হতে চান, ঘর থেকে না বের হয়েও এআই দিয়ে সেটা পুরোপুরি কীভাবে সম্ভব, আমি দেখাই। সবাই চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে, কিন্তু আসলে কেউ প্রম্পটিং জানে না। যারা এআই কিনে ব্যবহার করে, আমি তাদের দেখাই, আমার না কেনা ভার্সন দিয়েই ভালো প্রম্পটিং করে কীভাবে আরও ভালো রেজাল্ট আনা যায়।

বাংলাদেশে আসলে প্রম্পটিংটাই শেখানো দরকার। অনেকেই অনেক টুলস জানে না। ধরেন, ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে গুগল পিনপয়েন্ট ব্যবহার করলে পুরোটা ট্রান্সক্রাইব করে দেয়। অটো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটেক্ট করে, পুরো বাংলায়। কোথাও কথা না বুঝলে সেখানে মার্ক করে দেয়, যাতে আপনি নিজে চেক করতে পারেন। আর সবকিছু সেকেন্ডের মধ্যে ভাগ করে দেয়। আমি এগুলো শেখাই।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা এআই বলতে শুধু চ্যাটজিপিটিকেই বুঝি। দ্যাটস দ্য প্রবলেম।

ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। মীর হুযাইফা আল-মামদূহ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ২৬ নভেম্বর ২০২৫। পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি দৃকনিউজে প্রকাশিত হয়েছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে জনস্বার্থে সংবাদ ও সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ এর বাইরের দেয়াল, রাজশাহী শহর । ২৫ আগস্ট ২০২৪। *আলোকচিত্রী: ইসতিয়াক করিম/দৃক*

ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতা

শান্তিতে সাংবাদিকতা করার সুযোগ ছিল না, এখনও নেই, আগামীতেও আশাব্যঞ্জক নয়

সায়দিয়া গুলরুখ: আপনি তো শেখ হাসিনার আমলে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের (ডিএসএ) ভুক্তভোগী ছিলেন, সেই মামলাটির বর্তমান অবস্থা কী?

আল মামুন জীবন: আমার মামলাটি হয় ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম অবস্থায় করোনা ও লকডাউনের জন্য পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় পরিবারের বাইরে থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন পাই। এরপরে নিম্ন আদালত, সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলার জন্য দীর্ঘ সময় লড়তে হয়েছে। ৫ আগস্টের পর যখন আওয়ামী লীগের পতন হয়, এরপরেও মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠার পর ২০২৫ সালের মে মাসের দিকে মামলা থেকে আমি অব্যাহতি পাই। এই দীর্ঘ সময়ে আমি আমার জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়েছি, আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে। দিনশেষে কেউ ভালো-মন্দ খবর রাখেনি।

সায়দিয়া গুলরুখ: আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর, বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

আল মামুন জীবন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সাংবাদিকতা সুখকর ছিল না। আমরা আশাবাদি ছিলাম অভ্যুত্থানের পর স্বাধীনভাবে লিখতে পারব। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা তাদের মতের বিরুদ্ধে কোনো খবর গেলে নানা প্রক্রিয়ায় বাধা দিতেন। সাংবাদিকদের মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ক্রমাগত আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেয়া হয়েছে, মামলার হুমকি দেয়া হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছবি তুলতেও বাধা দিয়েছে।

বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও জেলায় যুমনা টেলিভিশনের সাংবাদিক পার্থ সারথী দাস, দেশ টিভির সাংবাদিক শাকিল আহমেদকে জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলার আসামি পর্যন্ত করা হয়েছে। এই মামলাগুলো এখন চলমান। ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের গায়ে হাত তুলেছে, মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ছবি ডিলিট পর্যন্ত করিয়েছে। ২০২৫ এর জাতীয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত জামায়াতের অনুষ্ঠান কাভার করতে গেলে সেখানে বিএনপি ট্যাগ, বিএনপি'র অনুষ্ঠান কাভার করতে গেলে জামায়াত-আওয়ামী লীগ ট্যাগ দিয়ে সাংবাদিকদের সামাজিক মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ট্রলের শিকার হতে হয়েছে।

এক কথায় বলা চলে, শান্তিতে এই দেশে কিংবা কোনো জেলায় সাংবাদিকতা করার সুযোগ ছিল না, এখনও নেই, আগামীতে হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। এইসব মানিয়ে নিয়েও আমরা চেষ্টা করছি সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে যাওয়ার।

সায়দিয়া গুলরুখ: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের আলোচনায় ঠাকুরগাঁও থেকে কোনও সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছেন? সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর প্রেক্ষিতে আপনার মতামত কী?

আল মামুন জীবন: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বিভাগীয় শহরে আলোচনা করেছে।

সাংবাদিক আল মামুন জীবন

রংপুরের আলোচনা সভায় কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মীদের ডাকা হয়েছিল। যেহেতু জেলা তথ্য অফিস থেকে এসব আয়োজন করা হয়। তারা বেশির ভাগ সাংবাদিক সংগঠনের নেতাদের ডেকেছিল।

যতদূর শুনেছি, আলোচনা সভাগুলোতে সংস্কারের চেয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। অনেকেই কথা বলেছেন বিজ্ঞাপন নিয়ে, কেউ ফেসবুকে সাংবাদিকতার অপব্যবহার নিয়ে ইত্যাদি। সাংবাদিকদের বেতন, নিরাপত্তা, হামলা-মামলা, সুরক্ষা আইন, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, ভুঁইফোঁড় পত্রিকার 'কার্ড' বাণিজ্য বন্ধ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের ওপর বিজ্ঞাপনের চাপ, ঠুনকো অভিযোগে চাকরিচ্যুত হওয়া এসব বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা খুব কম হয়েছে।

গণমাধ্যম কমিশন যে সুপারিশগুলো করেছিল, তার মধ্যে ন্যূনতম একটা বেতন কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছিল। আমরা দেখছি দেশে একই গ্রুপ, একাধিক গণমাধ্যম পরিচালনা করছে। ইচ্ছামতো নিয়োগ ও ছাঁটাই করছে। এসব দেখার জন্য সরকারের নীতিমালা নাই। সাংবাদিক সংগঠনগুলো যাদের কাজ সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে সরব থাকা, তারা উল্টো কোনো গ্রুপের কাছে জিম্মি নয়তো ক্ষমতাসীনদের কাছে, সরকারের কাছে। সেটা যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন। ফলে সুপারিশ শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সায়দিয়া গুলরুখ: বিএনপি সরকারের কাছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য কী আশা করেন?

আল মামুন জীবন: যদি এক কথায় বলি- আশা করাটাই ভুল। এখন পর্যন্ত দেশের যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তাতে সাধারণ মানুষ তার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা তো পুলিশ কখনও দেয়নি, দিতেও রাজি না। সর্বদা প্রতিপক্ষ ভাবতে পছন্দ করে। হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশ সদস্য বাদে।

আমরা আশা করেছিলাম সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার অন্তত অন্তর্বর্তী সরকার অথ বা আওয়ামী লীগের পর যে সরকার আসবে তারা নিশ্চিত করবেন। এত বড় আলোচিত একটা বিষয়ের বিচার নিশ্চিত হয়নি। এর বাইরে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন, সাংবাদিকদের আত্মহত্যার কারণ চিহ্নিত করা, কিংবা বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি। তাই আগামীতে আশা করার মতো দৃশ্যমান কিছু দেখছি না। যদি দৃশ্যমান কিছু করতে পারে বিএনপি সরকার, তাহলে নিশ্চয়ই আশা রাখা যেতে পারে।

তবে অনেকেই এখন সাংবাদিকতা ছেড়ে দিচ্ছেন। অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় বেতন-কাঠামো নেই, ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলে কর্মস্থল থেকে নিরাপত্তা নেই। রাজনৈতিক চাপ এলে গণমাধ্যমগুলো যাচাই-বাছাই না করেই চাকরিচ্যুত করার কারণে এসব রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক সংবাদকর্মী।

তাছাড়া গত দুই বছরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। অনুসন্ধান করতে গেলে যে তথ্যের প্রয়োজন হয়, সে তথ্য চাইতে গেলে সাংবাদিকতাকেই রাজনৈতিক চাপে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যদি এরপরেও কেউ চেষ্টা করে তখন নিরাপত্তার হুমকি থাকে। সবমিলিয়ে সাংবাদিকতায় আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক পদে থাকা কিছু ব্যক্তি নামসর্বস্ব পত্রিকার পরিচয় বহন করে অপসাংবাদিকতা করে থাকেন। মোটাদাগে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গণমাধ্যমকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

আল মামুন জীবন দৈনিক আজকের পত্রিকার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা প্রতিনিধি ও সময়ের কণ্ঠস্বরের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। সায়দিয়া গুলরুখ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১৪ জুলাই ২০২৬।

ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা

ছাত্ররাজনীতির পরিবর্তনে নতুন সমীকরণ

ইবতেশাম রহমান সায়নাভ

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। এখানে যেমন জ্ঞানচর্চা হয়, তেমনি মতের বিনিময়, নেতৃত্বের বিকাশ, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং রাজনৈতিক সচেতনতারও বিকাশ ঘটে। এই বহুমাত্রিক পরিবেশে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসন এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তথ্যের সেতুবন্ধন তৈরি করে, অনিয়ম-অসঙ্গতি তুলে ধরে এবং জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা কখনোই পুরোপুরি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ছিল না। বিশেষ করে দলীয় ছাত্ররাজনীতির প্রভাব বহু ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশ এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করেছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে পরিবর্তন এসেছে, তার প্রতিফলন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির শক্তির ভারসাম্য বদলেছে, নতুন নেতৃত্বের উত্থান হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া ও আন্দোলনের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতাও প্রবেশ করেছে এক নতুন বাস্তবতায়। প্রশ্ন হলো, এই নতুন বাস্তবতা কী সাংবাদিকতার স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, নাকি শুধু ক্ষমতার কেন্দ্র বদলেছে?

দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়েছে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে। কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে অনেককে ভাবতে হয়েছে, এতে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষুব্ধ হবে কি না, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কি না, কিংবা সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক চাপ আসবে কি না। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই সংবাদমাধ্যমে যথাযথভাবে উঠে আসেনি। অনেক ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

জুলাই-পরবর্তী সময়ে এই চিত্র কিছুটা বদলেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকরা প্রশাসনিক অনিয়ম, আবাসিক হলের সমস্যা, টেন্ডার বা নিয়োগসংক্রান্ত অভিযোগ, যৌন হয়রানি, শিক্ষার মান, গবেষণার সংকট এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগের তুলনায় বেশি কাজ করছেন। আগে যেসব বিষয় প্রকাশ করতে দ্বিধা ছিল, সেগুলো নিয়েও এখন অনেক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। এটি ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি লক্ষণ। তবে এই পরিবর্তনকে অতিরঞ্জিত করারও সুযোগ নেই কারণ ক্ষমতার শূন্যতা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেখানে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাব কমে, সেখানে অন্য কোনো গোষ্ঠী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ফলে সাংবাদিকদের জন্য চ্যালেঞ্জের ধরন বদলালেও চ্যালেঞ্জ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার, ব্যক্তিগত আক্রমণ, অনলাইন হয়রানি কিংবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বিত চাপ এখন নতুন বাস্তবতা। ফলে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের শুধু মাঠেই নয়, ডিজিটাল পরিসরেও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

জুলাই-পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবেগে ভেসে গিয়ে কোনো সাংবাদিক যদি নিজেই কোনো পক্ষের ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন, তাহলে সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সংবাদকর্মীর দায়িত্ব কোনো গোষ্ঠীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করা নয় বরং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য তুলে ধরা। গণতান্ত্রিক সমাজে সাংবাদিকতার শক্তি এখানেই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, সংবাদ সংগ্রহে অযথা বাধা না দেওয়া, সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। একইসঙ্গে সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব তথ্য সংগ্রহে নৈতিকতা, ভারসাম্য এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখা। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এবং দায়িত্বশীল প্রশাসন দুটিই একে অপরের পরিপূরক।

এখানে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাও কম নয়। অনেক সময় ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায়। এটি সাংবাদিকতার জন্য ক্ষতিকর। একজন ক্যাম্পাস সাংবাদিকের পরিচয় তিনি প্রথমত, একজন সাংবাদিক, কোনও রাজনৈতিক কর্মী নন। তাকে তার কাজের মান, তথ্যের নির্ভুলতা এবং পেশাগত নৈতিকতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিও ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার চরিত্র বদলে দিয়েছে। একটি সংবাদ শুধু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না; মুহূর্তেই ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব পোর্টাল এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রেই তা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমন পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের দায়িত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। দ্রুত হওয়ার প্রতিযোগিতায় নয়, বরং নির্ভুল তথ্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হবে। একটি ভুল সংবাদ শুধু একজন ব্যক্তি নয়, পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে তথ্যের উৎস সুরক্ষিত রাখা, ব্যক্তিগত ডিভাইস ও অনলাইন অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভুয়া তথ্য শনাক্ত করার সক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সাংবাদিকতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তথ্য বিশ্লেষণ, ডেটা সাজানো কিংবা প্রাথমিক খসড়া তৈরিতে এআই সহায়ক হতে পারে। ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, মোবাইল জার্নালিজম, ফ্যাক্ট-চেকিং এবং মাল্টিমিডিয়া স্টোরিটেলিং – এসব দক্ষতা এখন আর বাড়তি যোগ্যতা নয় বরং সময়ের দাবি।

তবে প্রযুক্তি কখনো সাংবাদিকের বিচারবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক সংবেদনশীলতার বিকল্প হতে পারে না। তাই প্রযুক্তিকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও দায়বদ্ধতা সাংবাদিকেরই। জুলাই-পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার সামনে সবচেয়ে বড় সুযোগ হলো নতুন করে আস্থা অর্জন করা। দীর্ঘদিনের নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর মনে সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। এখন যদি ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিবর্তে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন, তথ্য যাচাই করে সংবাদ প্রকাশ করেন এবং সমালোচনার মুখেও পেশাগত নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে সেই আস্থা পুনর্গঠন সম্ভব। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনই হবে এই সময়ের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

স্বাধীন সাংবাদিকতা কেবল সাংবাদিকদের একার দায়িত্ব নয়। ৩৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিসইনফরমেশন অর্থনীতি কি? (এবং তা মোকাবিলার কৌশল)

৩৭-এর পৃষ্ঠার পর তাছাড়া, প্রতিক্রিয়াশীল ইনফ্লুয়েন্সাররা উসকানিমূলক কনটেন্ট ব্যবহার করে শ্রোতা-দর্শক তৈরি করে এবং পরবর্তীতে পডকাস্ট থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এর মাধ্যমে প্রায়শই তারা লোভনীয় ব্র্যান্ডভিত্তিক ব্যক্তিগত চুক্তির প্রস্তাব এমনকি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পদ গ্রহণের সুযোগ পান।

ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও ভুয়া সংবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমার গবেষণায় যা উঠে এসেছে – ডিজিটাল মার্কেটিং (বিপণন) যারা করছেন, তারা বিজ্ঞাপন কোথায় প্রদর্শিত হচ্ছে এবং কীভাবে সেগুলো রিপোর্ট করা হচ্ছে তা পুনরায় নিয়ন্ত্রণে এনে এই সমস্যা সমাধানের অংশ হতে পারেন।

বিগ টেকের ভূমিকা

টেক কোম্পানি বা প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্থাগুলো ডিসইনফরমেশন অর্থনীতির সরাসরি সুবিধাভোগী কারণ তাদের মূল ব্যবসা অ্যাডটেক বা বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি নির্ভর – এবং এ ব্যবসা এই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করছে। উদাহরণস্বরূপ, গুগল সার্চ, ভিডিও এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের বাজারে প্রভাবশালী; মেটা সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শীর্ষে; এছাড়া অ্যামাজন ই-কমার্স ও ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের নেতৃত্বে রয়েছে।

যদিও এই প্ল্যাটফর্মগুলো সমসময়ই 'ডিসইনফরমেশন' প্রতিরোধ করার দাবি করছে, তবে তাদের ব্যবসায়িক মডেল মূলত ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততা'র ওপরই নির্ভরশীল – যা সেই প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটা conflict of interest বা স্বার্থের সংঘাত তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রে মেটা কোম্পানির ফ্যাক্ট-চেকিং কো-অপারেশন বাতিল করার ঘটনা এর একটি উদাহরণ। অ্যাডটেক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এভাবে জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক তদারকি ছাড়াই বিজ্ঞাপনজনিত অর্থ বিলানো চালিয়ে যায়, তাহলে 'ডিসইনফরমেশন' ছড়ানোর আর্থিক প্রণোদনাও বজায় থাকবে।

ডিসইনফরমেশন অর্থনীতিকে মোকাবিলা

ডিসইনফরমেশনকে ব্যবসায়িক মডেলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে তথ্য প্রদান বা গণমাধ্যম সাক্ষরতার বাইরেও হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়। বাজারমুখী দৃষ্টিভঙ্গী বলছে ভুল তথ্য ও ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারে কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত কোনও উৎপাদন হিসেবে না দেখে বরং লক্ষ করা উচিৎ, কীভাবে এগুলো ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বর্তমান বাজারব্যবস্থাতেই স্বাভাবিকভাবে বিকশিত ও প্রসারিত হচ্ছে। 'মার্কেট ওরিয়েন্টেড ডিসইনফরমেশন রিসার্চ' শিরোনামে এক গবেষণা বলছে, এই সমস্যার সমাধানে আয়ের কাঠামোতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এতে তিনটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে আর্থিক খাতে সন্ত্রাসবাদ ও অর্থপাচার রোধে ব্যবহৃত হয়: know your customer (KYC), duty to care, এবং due diligence। KYC নীতিমালা অনুযায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করে এবং যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে তাদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে। ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার সঙ্গে আর্থিক বাজারের বেশ কিছু মিল থাকলেও বর্তমানে 'কালো টাকা' ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারকারী প্রচারণা চালানো সম্ভব। ব্যাংকের মতোই যদি জানা যায় কে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে অর্থ দিচ্ছে, তাহলে অজ্ঞাত উৎস থেকে অ্যাডটেক – এ প্রবাহিত অর্থ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

অ্যাডটেক প্ল্যাটফর্মের অস্বচ্ছতার কারণে, ডিজিটাল মার্কেটাররা তাদের বিজ্ঞাপন ঠিক কোথায় প্রদর্শিত হচ্ছে এবং সেগুলো কোন বিষয়কে অর্থায়ন করছে সবসময় সেসব জানেন না। তাই শেষ পর্যন্ত তাদের একটি 'ডিউটি টু কেয়ার' থাকা উচিত। অর্থাৎ, একটা আইনি দায়িত্ব, যে তারা নিশ্চিত করে তাদের যেকোনো ব্যয় অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বা উদ্দেশ্যমূলক তথ্য বা বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে উৎসাহিত করছে না এবং তাদের ক্লায়েন্টের অর্থ বিজ্ঞাপন জালিয়াতিতেও অপচয় হচ্ছে না। এর অর্থ হলো, অ্যাডটেক মধ্যস্থতাকারীরা বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ অর্থ সঠিকভাবে বিতরণ করছে কি না তা যাচাই করা এবং সেই অর্থ কোথায় যাচ্ছে তার দায়িত্ব নেওয়া।

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে জবাবদিহিতা দাবি করে – এমন ধরনের সংস্থা মনে করে জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের বিস্তার এবং ক্ষতিকর কনটেন্টসমূহের মুনাফাভিত্তিক সার্কুলেশন কমানো সম্ভব। তবে শেষমেশ, বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং অ্যাডটেক মধ্যস্থতাকারীদেরই উচিত যথাযথ due diligence এর বিষয়গুলো কিংবা তাদের দায়িত্ব পালন করা, যাতে তাদের ক্লায়েন্টদের বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ বাজেট বিজ্ঞাপন জালিয়াতি বা ক্ষতিকর কনটেন্টে ব্যয় না হয়। ●

কার্লোস দিয রুইয হ্যাঙ্কেন স্কুল অব ইকোনমিক্সের শিক্ষক। তার এই লেখা, 'What is the Disinformation Economy? (And how to counter it)' edmo.eu/blog এ প্রকাশিত হয় ১৩ জুন ২০২৫। বইয়ের লেখক। লেখাটি অনুবাদ করেন ইসাবা শুহ্‌রাত।

ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

২৯-এর পৃষ্ঠার পর

অফকম-এর 'যুক্তরাজ্যে সংবাদ গ্রহণ: ২০২১/২০২২' ('News consumption in the UK: 2021/2022') শীর্ষক একটি গবেষণা অনুযায়ী, কিশোর-কিশোরীদের কাছে সংবাদ পাওয়ার শীর্ষ তিনটি উৎস হলো ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও ইউটিউব। মূলধারার সংবাদমাধ্যম আইটিভি ও বিবিসি রয়েছে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

অফকম-এর ২০১৯ সালের আরেক গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক সংবাদ গ্রাহকদের অর্ধেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে খবর গ্রহণ করে। কোনও সংবাদমাধ্যম না হয়েও ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও ইউটিউব সংবাদ গ্রাহকদের জন্য খবরের উৎস হিসেবে শীর্ষে থাকার কারণ হলো, মূলধারার গণমাধ্যমগুলো তাদের কনটেন্ট সেখানে স্বল্পখরচে সহজলভ্য করে দিয়েছে। একসময় ক্লিকবেইট লেখাগুলো অন্তত একটি কাজে সফল ছিল: পাঠককে মূল সংবাদ প্রকাশনার প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেগুলো এখন পাঠককে নিয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে। এর ফলে মূলধারার সংবাদমাধ্যম এখন পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ হারাচ্ছে। অন্য যেকোনও ব্যবসার মধ্যস্থতাকারীদের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর অ্যালগরিদমও ব্যবহারকারীর সংবাদ গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

এই অ্যালগরিদমগুলো ক্লিকবেইটের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। কারণ একজন ব্যবহারকারী একবার সামাজিক মাধ্যমে ক্লিকবেইটের ফাঁদে পড়লে, অ্যালগরিদম এরপর থেকে বারবার একই ধরনের কনটেন্ট দেখাতে থাকে। মানুষ ক্লিকবেইটে ক্লিক করে এবং এই চক্র চলতেই থাকে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রায়ই সামাজিক মাধ্যমে ক্লিকবেইটের ভিড়ে চাপা পড়ে যায়। একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো, অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

ক্লিকবেইটের বিরুদ্ধে লড়াই

ক্লিকবেইট কৌশলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াতে বেশি অবদান রাখে। ২০১৯ সালে স্পেনের গণমাধ্যম নিয়ে এক গবেষণায় দেখা যায়, ক্লিকবেইট অসম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে, এগুলো হালকা খবরে (সফট নিউজ) ভরা, এগুলো একই খবরকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে প্রকাশ করে ও পুনরাবৃত্তি করে এবং এগুলো অতিরঞ্জকতাপ্রবণ।

ক্লিকবেইট সাংবাদিকতাকে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের (False Advertising) সঙ্গেও তুলনা করা যায়। অনলাইনে কিছু কেনার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পণ্য আসলে ক্রেতা যেমন প্রতারিত বোধ করে, তেমনি পাঠকরাও প্রতারিত হয় ক্লিকবেইট দেখে। অনেক দেশে বস্তুগত পণ্যের বা মিথ্যা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতারণা বিষয়ক আইন থাকলেও ক্লিকবেইট, যা শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য পাঠকদের সময় নষ্ট করে, তার বিরুদ্ধে তেমন কোনও আইন নেই। তাহলে ক্লিকবেইটের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে লড়াই করব? আমাদের হয়তো এই লড়াই না-ও করতে হতে পারে; ক্লিকবেইট হয়তো নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।

প্রথমত, গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে মানুষ এখন ক্লিকবেইট সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন এবং এগুলো আগের মতো আর পাঠকদের বিভ্রান্তিকর ওয়েবসাইটে নিয়ে যেতে ততটা কার্যকর নয়। ক্লিকবেইট লেখাগুলোর জনপ্রিয়তা নিয়ে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ২৭টি শীর্ষ অনলাইন প্রকাশকের ১৯,৩৮৬টি লেখা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় হিসেবে ক্লিকবেইট লেখাগুলো সাধারণ লেখার তুলনায় অনেক কম শেয়ার হয়। গবেষণাটিতে আরো দেখা যায় যে সংবাদগ্রাহকরা এসব ক্লিকবেইটকে এখন প্রভাবিত করার একটি কৌশল হিসেবে দেখে যা ক্লিকবেইট সরবরাহকারীদের প্রতি তাদের এক ধরনের অবিশ্বাস তুলে ধরে।

দ্বিতীয়ত, এটি প্রমাণিত যে সংবাদ সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করার মাধ্যমে পাঠকসংখ্যা বাড়াতে পারে। মূলধারার গণমাধ্যম থেকে আলাদা হয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতার স্বাধীন বিকাশ এর একটি ভালো উদাহরণ। ক্রীড়া সংবাদ প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ হলেও সাধারণত তা সংবাদ বুলেটিনের তৃতীয় ভাগে বা পত্রিকার শেষের পাতাগুলোতে স্থান পায়। ফলে পাঠককে টানার জন্য প্রায়ই তা চমকপ্রদ শিরোনাম কিংবা 'গুজবনির্ভর' খবরের সাহায্য নেয়। কিন্তু ছোট পরিসরের কিছু স্বাধীন ক্রীড়া সাময়িকী এই ধারাকে বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের *ডিলেইড গ্র্যাটিফিকেশন* এবং *অ্যানাদার এস্কেইপ*, অস্ট্রেলিয়ার *অফস্ক্রিন*, *ফিনল্যান্ডের লাইন*, সুইডেনের *লাগম* এবং স্পেনের *জট ডাউন* এ ধরনের স্বাধীন, ছোট সংবাদমাধ্যমের কিছু উদাহরণ, যা ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে নতুন দিক দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এই ক্রীড়া সাময়িকীগুলো সফল হয়েছে কারণ তারা সচেতনভাবে মূলধারা থেকে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং উচ্চমানের সাংবাদিকতার চর্চা বজায় রেখেছে।

এখন মূলধারার গণমাধ্যমের সময় এসেছে সামাজিক মাধ্যমের সাথে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক এবং 'ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা'র প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করার।

রোকেয়া লিটা যুক্তরাজ্যভিত্তিক একজন সাংবাদিক। এই লেখাটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা মিডিয়া ইনস্টিটিউটের ব্লগে প্রকাশিত হয় ২৬ জুলাই ২০২২। লেখাটি অনুবাদ করেছেন ইসাবা শুহ্‌রাত।

ছাত্ররাজনীতির পরিবর্তনে নতুন সমীকরণ

৩৫-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সমাজসহ সবার সম্মিলিত দায়িত্ব এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে একজন সাংবাদিক ভয়, হুমকি বা চাপ ছাড়াই সত্য প্রকাশ করতে পারেন। কারণ স্বাধীন সাংবাদিকতা ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে না।

জুলাই-পরবর্তী বাস্তবতা বাংলাদেশের ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে যদি সাংবাদিকতা আরও পেশাদার, বস্তুনিষ্ঠ এবং জবাবদিহিমূলক হয়ে উঠতে পারে তাহলে এটি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের গণমাধ্যমের ভবিষ্যতের জন্যও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক আনুগত্য, গোষ্ঠীগত স্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত অবস্থান সাংবাদিকতার ওপর প্রাধান্য পায়, তাহলে পরিবর্তনের এই সুযোগও হারিয়ে যাবে।

সবশেষে বলা যায়, জুলাই-পরবর্তী ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ক্ষমতার পরিবর্তন নয় বরং সাংবাদিকতার চরিত্র কতটা পরিবর্তিত হবে। সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়েই ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা তার প্রকৃত শক্তি অর্জন করতে পারে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই মুহূর্তকে যদি সাংবাদিকরা আত্মসমালোচনা, পেশাগত উন্নয়ন এবং নৈতিকতার পুনর্গঠনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে ভবিষ্যতের ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা হবে আরও স্বাধীন, আরও দায়িত্বশীল এবং আরও জনমুখী। সেই প্রত্যাশাই আজ সবচেয়ে বড়। ●

ইবতেশাম রহমান সায়নাভ রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি দৈনিক নিউ এজ-এর ক্যাম্পাস প্রতিনিধি।

ক্ষমতার কাঁধে চড়ে ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার উত্থান

২৯-এর পৃষ্ঠার পর

৩) *এদের তাড়ানোর জন্য লাঠি হাতে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না: সর্বমিত্র চাকমা (কালের কণ্ঠ/ অনলাইন ও ফেসবুক/৫ নভেম্বর ২০২৫)*

উপরোল্লিখিত এই ৩টি শিরোনামের বাক্যে ভবঘুরে, লাঠি, মাদক, জবাব দিয়েছেন, তাড়িয়ে দিয়েছেন, এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এবং এমনভাবে শিরানামটি ঠিক করা হয়েছে – মনে হবে সর্বমিত্র যা করেছেন সেটিই সঠিক। দৈনিক *কালের কণ্ঠ* পত্রিকাটি একই দিনে মাত্র আধা ঘণ্টা ব্যবধানে সর্বমিত্র'র একই ধরনের বক্তব্য যুক্ত করে, আলাদা করে দুটি কার্ড বানিয়ে প্রচার করেছে। শুধু শিরোনাম নয়, প্রতিবেদনের ভেতরেও শুধুমাত্র সর্বমিত্র চাকমার বক্তব্য নেয়া হয়েছে – যেখানে তিনি নিজের পক্ষে, এই অনৈতিক অভিযানের পক্ষে সমর্থন পুনরুৎপাদন করছেন।

তবে মিডিয়ার এই শক্ত সমর্থন থাকার পরেও এই 'উচ্ছেদ অভিযান' নিয়ে সমালোচনা এড়াতে পারেননি ডাকসু নেতা সর্বমিত্র চাকমা। এই পরিস্থিতিতে ৬ নভেম্বর ২০২৫, নিজেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বানিয়ে, অভিনয়ের মাধ্যমে একটি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে প্রচার করেন। এই ভিডিওতে তিনি মোটাদাগে ঢাবিতে আশ্রয় নেওয়া সকল গরিব মানুষকে 'ছিনতাইকারী' হিসেবে ট্যাগ দেন। এর আগে ছিন্নমূল সকল মানুষকেই 'যৌন নিপীড়ক' ও 'মাদক ব্যবসায়ী' দাবি করে অভিযানকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তার অভিনীত ও নির্মিত এই কনটেন্টটিও সর্বমিত্রের পক্ষ নিয়ে প্রচার করেছে প্রায় সকল সংবাদমাধ্যম।

সর্বমিত্র চাকমার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ঢাবি শিক্ষিকা মোনামি (যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, আরটিভি অনলাইন মাধ্যম, ৬ নভেম্বর ২০২৫)

লক্ষ করুন, এই ৩টি সংবাদমাধ্যমে প্রায় একযোগে, একই শিরোনাম ছিল। এই শিরোনামটিতে কোনো ভুলতথ্য নেই। কিন্তু শিরোনামটি একটি ধরন অনুসরণ করে, যা জানতে হলে আপনাকে 'ক্লিক' করতে হবে। একইসঙ্গে ঢাবি শিক্ষককে সামনে রেখে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত রাখা হয়েছে যে সর্বমিত্র আবারও সঠিক কাজ করেছেন।

ভাসমান বিক্রেতাদের সাথে ডাকসু নেতাদের দুর্ব্যবহার ও আপত্তিকর আচরণ, মধ্যরাতে বৃদ্ধ মানুষকে লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে – এসব তথ্য ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনার পাশাপাশি তুমুল সমালোচনাও হয়। কিন্তু কোনো সংবাদমাধ্যমেই এই বিষয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া গেল না। এমনকি ভুক্তভোগীদের কাছে কোনো সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদক যাননি। উচ্ছেদের শিকার ও ভুক্তভোগীদের কণ্ঠ আমরা কোথাও দেখতে ও শুনতে পাইনি।

এই অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠেছে ডাকসুর গঠনতন্ত্রে অভিযান সংক্রান্ত কোনও নির্দেশনা আছে কি না? নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের এই ধরনের অভিযানের এখতিয়ার আছে কি না? বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু নেতৃবৃন্দের পেশিশক্তি প্রদর্শনকে প্রশ্রয় ও সমর্থন দিতে পারে কি না? অথচ এই প্রশ্নগুলোর সন্ধান দেশের সংবাদমাধ্যম করেনি। ডাকসুর গঠনতন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যেই মূল ৮টি কার্যাবলী আছে সেখানে আদতে এই ধরনের অভিযান সংক্রান্ত কোনো বিষয় নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক, শ্রেণিকক্ষ ও আবাসিক হলকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কথা বলা আছে। লাঠি হাতে-গায়ের জোরে, পিটিয়ে, গরিবের বাড়ি হানা দিয়ে কোনো অভিযান পরিচালনার বিষয় গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। ডাকসু নেতারা সম্পূর্ণভাবে ডাকসুর গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ পালাক্রমে চালিয়ে গেলেন – এতে ঢাবি প্রশাসন যেমন প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি সমর্থন জুগিয়েছে সংবাদমাধ্যম।

ঢাবি প্রশাসনের সমর্থনে ডাকসু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ছিন্নমূল মানুষের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ঘর উচ্ছেদ অভিযানের ঘটনাটি সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে বোঝা যায় – 'ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা' এখানে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার মধ্য দিয়ে টিকে আছে এবং বিস্তার লাভ করছে। এখানে সর্বজনের কোনো স্বার্থ নেই। গরিব মানুষ মানেই তাদের শিক্ষিত সমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে থাকার অধিকার নেই। গরিব মানুষের ঘরে ঢুকে যখন-তখন হানা দেওয়া যায়। তাদেরকে যাচ্ছেতাই অপমান করা যায়। শিক্ষিত ও ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী গরিব মানুষকে লাঠি দিয়ে পেটাতে পারেন। মিডিয়ার দৃষ্টিতে, এসব কোনো অপরাধ নয়। ●

সামিয়া রহমান প্রিমা দৃক ও দৃকনিউজে গবেষক ও সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত আছেন। এই লেখাটি ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এ প্রকাশিত হয়েছে।

প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজমের অধীনে সাংবাদিকতা

সাংবাদিক কে?

শোভন দাস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একটি ভোট কেন্দ্রে মুঠোফোন সাংবাদিকতার চিত্র। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। *আলোকচিত্র: এমএইচ আকাশ/দৃক*

এই কথা অনস্বীকার্য যে সাংবাদিকতার ধারণা এবং অনুশীলন একটা গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, স্মার্টফোন এবং প্ল্যাটফর্মভিত্তিক অর্থনীতি এমন এক বাস্তবতা তৈরি করেছে যেখানে তথ্য ও খবর উৎপাদন আর কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকদের একচেটিয়া ক্ষেত্র নয়। এই পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটি আবার সামনে এসেছে – সাংবাদিক কে? বাংলাদেশে এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে রাজনৈতিক বাস্তবতা, গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তার একইসঙ্গে সাংবাদিকতার সীমানাকে ক্রমাগত ঝাপসা করে দিচ্ছে।

অনলাইন সংবাদমাধ্যম গড়ে ওঠার আগে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ছিল সংবাদপত্র ও টেলিভিশনকেন্দ্রিক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। *প্রথম আলো*, *ডেইলি স্টার*, *সমকাল*, *কালের কণ্ঠ* বা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের রিপোর্টারদেরই সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো কারণ তারা সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ, তথ্য যাচাই এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার মধ্যে কাজ করতেন। সাংবাদিকতা তখন মূলত গেটকিপিংয়ের একটি ব্যবস্থা ছিল যেখানে কোন তথ্য জনপরিসরে যাবে তা নির্ধারণ করত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার সেই কাঠামো ভেঙে দিয়েছে। এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক জে রোজেন (২০১২) বলেন, একসময় পাঠককে সংবাদের নিষ্ক্রিয় ভোক্তা ভাবা হতো তারা এখন নিজেরাই তথ্য, খবর উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার অংশ। জুলাই গণঅভ্যুত্থান বা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মতো ঘটনাগুলোতে দেখা গেছে, ছবি ও ভিডিও বেশিরভাগ সময় সাধারণ নাগরিকদের মোবাইল ফোন থেকেই এসেছে, যা পরে মূলধারার মিডিয়া ব্যবহার করেছে। এই বাস্তবতায় সাংবাদিকতা এখন আর একক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পেশা নয়, বরং একটি নেটওয়ার্কভিত্তিক প্রক্রিয়া।

এই পরিবর্তনের পেছনে কেবল প্রযুক্তি নয়, একটি নতুন অর্থনৈতিক যুক্তিও কাজ করছে, যেটাকে 'প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজম' বলা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং একটি মনোযোগভিত্তিক অর্থনীতি, যেখানে মানুষের লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং দেখার সময় সরাসরি অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডামের মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক ক্যারোলিন গেয়ারলিট্‌জ এবং আনা হালমুন্ড (২০১৩) বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইক, অ্যাংরি, হার্টসহ নানা ইমো-বাটনগুলো মানুষের মধ্যকার যোগাযোগ ও প্রতিক্রিয়াকে ডাটায় রূপান্তর করে, যে ডাটা গোনা যায়, এবং উপার্জনের উৎসে পরিণত করা যায়, মানে যত লাইক তত আয়। এই 'লাইক ইকোনমি' বাংলাদেশে ফেসবুকভিত্তিক নিউজ পেজগুলোর উত্থানের ভূমিকা রেখেছে। সড়ক দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির ভিডিও ভাইরাল হওয়া এবং সেখান থেকে আয়ের সম্ভাবনার কারণে প্রচারিত হয়ে থাকে। এখানে সাংবাদিকতার চেয়ে মনোযোগ অর্থনীতির বা পাবলিকের মনোযোগ কেনাবেচার যুক্তি বেশি গ্রহণযোগ্য।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে এক নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের অনেকেই প্রথাগত সংজ্ঞায় সাংবাদিক নন কিন্তু তারা নিয়মিতভাবে মোবাইল ক্যামেরা বা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন। ঢাকার যে কোনও দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক মিছিল বা জনসমাগমে এখন দেখা যায় ইউটিউবার, ফেসবুক লাইভ ব্যবহারকারী বা টিকটক কনটেন্ট নির্মাতারা উপস্থিত আছেন। তাদের উদ্দেশ্য প্রায়ই তথ্য যাচাই বা জনস্বার্থে রিপোর্টিং নয়, বরং ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করা। সমকালীন ডিজিটাল মিডিয়া, প্ল্যাটফর্ম স্টাডিজ এবং সামাজিক মাধ্যম গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুইজন গবেষক য়োজে ভ্যান ডাইক এবং টমাস পুল (২০১৩) এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে বলেন, প্ল্যাটফর্মই নির্ধারণ করে কোন কনটেন্ট দৃশ্যমান হবে এবং কোনটি হারিয়ে যাবে। ফলে সাংবাদিকতা এখন কেবল তথ্যের বিষয় নয়, বরং দৃশ্যমানতা ও অ্যালগরিদমের রাজনীতির অংশ হয়ে উঠেছে।

একদিকে অ্যালগরিদম অনলাইনে মানুষের আচরণ, পছন্দ এবং প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে কোন কনটেন্ট কার সামনে দেখানো হবে তা নির্ধারণ করে। অন্যদিকে অ্যাটেনশন ইকোনমি/মনোযোগের অর্থনীতি মানুষের মনোযোগকে – ক্লিক, ভিউ, শেয়ার, লাইক – টাকায় রূপান্তর করে। ফলে অ্যালগরিদম এমন কনটেন্টকে অগ্রাধিকার দেয় যা বেশি আবেগ, ক্লিক, লাইক বা শেয়ার তৈরি করতে পারে, কারণ সেটিই প্ল্যাটফর্মের জন্য বেশি মুনাফা আনে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ক্লিক বা ভিউয়ের জন্য কী মূলধারার মিডিয়া কাজ করে না? শুধু ইউটিউবার বা রিল মেকাররাই কী এই লাইক ইকোনমিতে অংশগ্রহণ করে? অনেক টেলিভিশন চ্যানেল তাদের টকশোর অংশবিশেষ কেটে আলাদা কনটেন্ট বানায়। অনেক টেলিভিশন সাংবাদিক নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল চালান, অথবা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করেন। সাংবাদিকতা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্যে সীমারেখা এখানে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায় কারণ এখন রিপোর্টার হওয়া মানেই কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়া নয়, বরং একটি ডিজিটাল উপস্থিতি তৈরি করা। তাহলে ইউটিউবারের সঙ্গে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্টের পার্থক্য কোথায়?

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংকট হলো তথ্যের দ্রুততা এবং সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশে গুজব ছড়িয়ে সহিংসতার ঘটনা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কুমিল্লার পূজামণ্ডপকে কেন্দ্র করে ছড়ানো গুজব বা বিভিন্ন সময় ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে পড়া দেখায় যে ভাইর‍্যালিটি অনেক সময় সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একটি অসত্য তথ্য মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, যা সাংবাদিকতার নৈতিক সংকটকে আরও গভীর করে।

এই প্রেক্ষাপটে সাংবাদিক কে? – প্রশ্নটির উত্তর আসলে সাংবাদিকতার নৈতিক মানদন্ডগুলোর সাথে জড়িত। যদি আমরা সাংবাদিকতা পেশাকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা প্রচারের মাধ্যম দিয়ে সংজ্ঞায়িত না করি, অর্থাৎ, ব্রডকাস্ট বা মোবাইল জার্নালিস্ট হিসেবে বিভাজন না করে বরং আমরা যদি এই পেশার নৈতিক মানদন্ডগুলো অনুশীলন করা, যে বা যারা করছেন তারাই সাংবাদিক বা সেটাই সাংবাদিকতা হিসেবে দেখি, তাহলে এই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি তথ্য যাচাই করেন, প্রেক্ষাপট তৈরি করেন এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন, তিনিই সাংবাদিকতার চর্চায় যুক্ত – তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিক বা স্বাধীন কনটেন্ট নির্মাতা হতে পারেন। অন্যদিকে শুধুমাত্র ভাইরাল হওয়ার উদ্দেশ্যে কনটেন্ট তৈরি করা সাংবাদিকতা নয়, বরং প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির অংশ।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা এখন প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজম, লাইক অর্থনীতি এবং মোবাইল মিডিয়ার সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাস্তবতায় সাংবাদিকতা আর একটি স্থির পেশা নয়, বরং একটি চলমান ও প্রতিযোগিতামূলক নৈতিক ক্ষেত্র। তাই শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি 'সাংবাদিক কে?' এই প্রশ্নের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: 'কোন ধরনের তথ্য ও খবর উৎপাদন জনস্বার্থ রক্ষা করে এবং কোনটি কেবল মনোযোগের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে?' ●

শোভন দাস কানাডায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বে পিএইচডি গবেষক।
লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সায়দিয়া গুলরুখ।

ডিসইনফরমেশন অর্থনীতি কি? (এবং তা মোকাবিলার কৌশল)

কার্লোস দিয রুইয

একসময় যা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা বা প্রতারণা হিসেবে বিবেচিত হতো, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সেসকল ডিসইনফরমেশন অর্থনীতি (disinformation economy বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অর্থনীতি) এক ধরনের লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল ও বিজ্ঞাপন প্রচার-প্রসারের অ্যালগরিদমিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চালিত হয়ে কনটেন্ট নির্মাতা থেকে শুরু করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অনলাইন পক্ষ উসকানিমূলক কনটেন্ট প্রচার ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রণোদনা পেয়ে থাকেন।

ইন্টারনেট দুনিয়ার ব্যবসায়িক মডেলগুলোর একটা মৌলিক নীতি আছে, যেটা খুবই সরল: যত বেশি এনগেজমেন্ট ততই আয়। প্রত্যেকটা ভিউ, ক্লিক, মন্তব্য ও পুনরায় পোস্ট করা কে এনগেজমেন্ট বা আকর্ষণীয় সংযোগ বলা হয় – যা মূলত পরবর্তীতে আর্থিক আয়ে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ফলে কনটেন্ট নির্মাতারা ঠিক সেই ধরনের কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার করে থাকেন যেখানে বেশি বেশি ক্লিক পড়বে। বিদ্যমান গবেষণা থেকে আমরা জানি – যে এধরনের কনটেন্টগুলো সাধারণত চমকপ্রদ বা চাঞ্চল্যকর হয়, আবেগপূর্ণ ও ট্রাইবালাইজিং বা জাতি ও গোষ্ঠীগতভাবে বিভাজনমূলক হয়। এখানে 'ট্রাইবালাইজিং' বলতে বোঝায় এমনসব বিতর্কিত কনটেন্ট, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে 'আমরা বনাম তারা' – এ ধরনের বিভাজনে নিজেদেরকে একটি পক্ষ নিতে বাধ্য করে। এগুলোর ফলেই কনটেন্টগুলোতে ইন্টারঅ্যাকশন বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাড়ে। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভিত্তিক অ্যালগরিদম তা আকর্ষণীয় কনটেন্ট হিসেবে শনাক্ত করে আরও বেশি ছড়িয়ে দিতে থাকে।

বিজ্ঞাপনদাতারা অজান্তেই ফেক নিউজ অর্থায়ন করছে

পরিকল্পিত বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারে (disinformation) কে একটি বাজারব্যবস্থার অংশ হিসেবে ভাবলে এর সরবরাহ চেইনটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। উৎপাদন পর্যায়ে রাষ্ট্র, রাজনীতিবিদগণ বা ইনফ্লুয়েন্সারসহ বিভিন্ন পক্ষ ক্ষতি করার জন্য হোক কিংবা নিজেদের মুনাফার উদ্দেশ্যেই হোক পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায় বা বয়ান তৈরি করে। এর মাঝে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রয়েছে প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম ও রিকমেন্ডেশন সিস্টেম, যা এসব কনটেন্টকে বারে বারে সামনে আনে এবং আরও ছড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি, 'বট ফার্ম'-এর মতো আরেক ধরনের 'শিল্প' গড়ে উঠেছে, যেখানে ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ও স্বয়ংক্রিয় কিছু স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে একদিকে বিজ্ঞাপন জালিয়াতি করা হয় এবং অন্যদিকে চাহিদা অনুযায়ী 'বিভ্রান্তিমূলক তথ্য' ছড়ানো হয়। শেষ পর্যন্ত, বিজ্ঞাপনদাতারা কখনও জেনে বা কখনো না জেনেই এই উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অর্থনীতিকে অর্থায়ন করে, কারণ তারা তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ অর্থ এই অর্থনীতির ওপর ন্যস্ত করে; অধিকাংশ সময়ই যেগুলো কোনো প্রকার নজরদারি বা জবাবদিহিতার বাইরেই পরিচালিত হয়।

ডিসইনফরমেশন অর্থনীতির আর্থিক প্রণোদনা আসলে বিশাল। ভুয়া সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলো প্রোগ্রাম্যাটিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিপুল আয় করে, যেখানে কোনও ব্যবহারকারী যে কোনও একটা লেখা বা আর্টিকেলে ক্লিক করলেই ওয়েবসাইটগুলো অর্থ পায়। কার্টার সেন্টার এবং মেককেইন ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ডিসইনফরমেশন তৈরি ও ছড়ানোর পরিচিত উৎসগুলোর আনুমানিক ৮১.৪৭% ট্র্যাফিক সরাসরি অনলাইন প্রোগ্রাম্যাটিক বিজ্ঞাপনে অ্যাক্সেস পায়' (Scholtens et al., 2024, পৃ. ৩)। একটা নিউজগার্ড রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী, মোট ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বাজেটের প্রায় ১.৬৮% ভুয়া সংবাদ ওয়েবসাইটগুলোতে চলে যায়। যার পরিমাণ শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ২.৪ বিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাপী হিসেব করলে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার। সাংবাদিকরাও এটা নথিবদ্ধ করেছেন যে, পরিচিত অনেক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের বাজেটও বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট তৈরি করা ওয়েবসাইটের পেছনে চলে যায়, এবং টেক প্ল্যাটফর্মগুলো বিভ্রান্তিমূলক তথ্য তৈরিতে সহায়তা করলেও বিজ্ঞাপনের অর্থ নিজেদের কাছেই রাখে।

৩৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো দৃশ্যমান বৈষম্য কমাতে পারে, কিন্তু বাঙালি শ্রেষ্ঠত্ববাদ মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত’

১৭-এর পৃষ্ঠার পর

করবেন? এটা কি আদিবাসীরা নির্ধারণ করবেন, নাকি কোনো বাঙালি নির্মাতা তার রোমান্টিক বা ‘এক্সোটিক’ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তা নির্মাণ করবেন ঠিক যেমনটা বিটিভি করত?

এই কারণে, এই সুপারিশগুলোকে আমি দেখি ‘সফট পাওয়ার’ হিসেবে যা দৃশ্যমান বৈষম্য কমাতে পারে কিন্তু গভীরের বাঙালি জাতীয়তাবাদী শ্রেষ্ঠত্ববাদ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নয়। এর জন্য দরকার মিডিয়া সেন্সরশিপ পলিসিতে আমূল পরিবর্তন এবং পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী ইতিহাসের সঠিক অন্তর্ভুক্তি। প্রকৃত পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সিধু-কানু’র সাঁওতাল বিদ্রোহ বা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা’র লড়াই, এসব ইতিহাস যতদিন না জাতীয় ইতিহাসের অংশ হিসেবে মূলধারার মিডিয়ায় স্থান না পাচ্ছে – ততদিন পর্যন্ত এই দেশটা আসলে বৈচিত্র্যময় জাতি ও পরিচয়ের দেশ হয়ে উঠতে পারবে না, এবং ‘এক জাতি, এক ভাষা’র ন্যারেটিভের মধ্যে বাকিরা শুধু টোকেন হিসেবেই উপস্থিত থাকবে।

সায়দিয়া গুলরুখ: আদিবাসীদের দুঃখ-কষ্ট, লড়াই-সংগ্রামের খবর গণমাধ্যমে পাওয়া যায় না। এটা কমিশনের প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে। তবে এই খবর না পাওয়া বা তথ্য প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান কারণ সম্পর্কে তারা আলাদা করে কিছু বলেননি। ২০১৬ সালে গোবিন্দগঞ্জে পুলিশ আদিবাসী গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়োছিল। সেই খবর কিন্তু দেশি মিডিয়া প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই নিয়ন্ত্রণ আরও প্রত্যক্ষ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশের বাইরে গণমাধ্যমে আদিবাসীদের জীবন ও বাস্তবতার খবর সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশ কী হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশ কী হবে?

ডালিয়া চাকমা: গোবিন্দগঞ্জ কিংবা সমতলের আরো অন্যান্য অঞ্চলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনাগুলোতে মূল বাধা যতটা না মিডিয়ার অনিচ্ছা, তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ। বর্তমান সুপারিশগুলো মূলত একটা ‘আদর্শিক পরিস্থিতি’র জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু সংঘাতপুর্ণ বা নজরদারিমূলক পরিবেশে বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাই মিডিয়াতে আদিবাসী উপস্থিতি ও উপস্থাপন নিয়ে যখন সুপারিশ করা হচ্ছে, তখন একই সাথে আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নিয়ন্ত্রণকে খর্ব করার জন্যও সুপারিশ করতে হবে। এই জটিল কিন্তু সমাধানযোগ্য পরিস্থিতিকে আমলে নিয়ে আমার কিছু সুর্নিদ্দিষ্ট প্রস্তাবনা আছে :

১) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) – এর তথ্যের ওপর একচেটিয়া নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। বর্তমানে পাহাড়ের কোনও ঘটনা ঘটলে মিডিয়া কেবল আইএসপিআর এর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে। বিকল্প হিসেবে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ (স্বাধীন অনুসন্ধানমূলক) সেল গঠন করতে হবে যেখানে স্থানীয় আদিবাসী সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক থাকবে।

২) সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নীতিমালা তৈরি করা, যেন কোনও বাহিনী তাদের ক্যামেরা বা ফুটেজ কেড়ে নিতে না পারে বা যখন-তখন ক্যাম্পে ডেকে নিতে না পারে।

৩) পাহাড়ের আদিবাসী সাংবাদিকদের জন্য এমন প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া উচিত যাতে তাদের পাঠানো তথ্য স্থানীয়ভাবে বাধাগ্রস্ত বা নজরদারি করা না যায়।

৪) আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে রেডিও, টেলিভিশন বা অনলাইন নিউজ পোর্টাল চালুর আইনি বাধা দূর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন থাকবে কিন্তু পরিচালনা থাকবে আদিবাসীদের হাতে।

৫) সরকারের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত তহবিল গঠন করা, যা কেবল আদিবাসী ভাষায় এবং আদিবাসী নির্মাতাদের কর্তৃক কনটেন্ট তৈরিতে সরাসরি অর্থায়ন করবে।

৬) কানাডার আদলে বাংলাদেশের সকল ক্যাবল অপারেটর ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে আদিবাসী মালিকানাধীন চ্যানেল বা অনুষ্ঠান প্রচার বাধ্যতামূলক করা।

৭) অস্ট্রেলিয়ার আদলে একটি ‘ন্যাশনাল কালচারাল প্রোটোকল’ গঠন করা যেখানে আদিবাসীদের চিত্রায়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত ইতিহাস, বীরদের বীরত্বগাথা এবং সংবেদনশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো উপস্থাপন নিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে। যা ‘বাঙালি আধিপত্যবাদী’ বা ‘এক্সটিক’ দৃষ্টিভঙ্গী দূর করতে ভূমিকা রাখবে।

৮) কেবল মাঠপর্যায়ে সাংবাদিক নিয়োগ নয় বরং সংবাদমাধ্যমের নীতি-নির্ধারণী বোর্ড বা এডিটোরিয়াল কাউন্সিলে আদিবাসী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

ডালিয়া চাকমা একজন অধিকারকর্মী ও গবেষক। সায়দিয়া গুলরুখ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ৯ এপ্রিল ২০২৬।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণমাধ্যম সত্য প্রকাশ না করায়, হলুদ সাংবাদিকতা বর্জনের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লা। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪। *আলোকচিত্রী: সুলতান মাহমুদ মুকুট/দৃক*

‘গাজা গণহত্যাকে অস্বীকার করে যে সাংবাদিকতা, তা যুদ্ধাপরাধের শামিল’

২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, দৃক পিকচার লাইব্রেরির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আয়োজিত গোলাম কাশেম ড্যাডি বক্তৃতা প্রদান করেন আল-জাজিরা মিডিয়া ইনস্টিটিউটের মিডিয়া ম্যানেজার মোনতাসের মারাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গাজায় চলমান ইসরায়েলি গনহত্যাকে বৈধতা প্রদানে পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভূমিকাকে প্রশ্ন করে মোনতাসের মারাই বলেন, ‘জেনোসাইড ডিনায়াল জার্নালিজম (genocide denial journalism) এর চর্চা যারা করেন, তাদেরও একদিন আর্ন্তজাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের মুখোমুখি হতে হবে।’ সাংবাদিকতার হালচাল এর পাঠকদের জন্য মোনতাসের মারাইয়ের বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করা হলো।

গাজা গণহত্যার খবর প্রকাশে পশ্চিমা মিডিয়ার এজেন্ডা বিশ্লেষণ করেছেন আল-জাজিরার সাংবাদিক মোনতাসের মারাই। পাশে আলোকচিত্রী ও অ্যাক্টিভিস্ট শহিদুল আলম। পান্থপথ, ঢাকা। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আলোকচিত্রী: সুমন কান্তি পাল/দৃক

... আমি যেখানেই যাই, আমার সহকর্মীদের সাথে কথা বলি। আমি তাদের বলি... আপনাদের নিজেদের নৈতিকতা, কাজের ধরন এবং মূল্যবোধ পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এগুলো নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন তুলতে হবে... আমি যেখানেই যাই, সবাইকে বলার চেষ্টা করি যে দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এটা করতে হবে। আপনারাই দেখুন, গাজায় কত মানুষ নিহত হয়েছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

একটি নমুনা দেই, *দ্য গার্ডিয়ান* ১০০ বছর পরে ব্যালফোর ঘোষণা সমর্থন করার জন্য ক্ষমা চেয়েছে। আপনারা অনলাইনে দেখে নিতে পারেন। ১০০ বছর পর, যখন আমরা ফিলিস্তিন হারিয়েছি, লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, অসংখ্য মানুষ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। *দ্য গার্ডিয়ান* ব্যালফোর ঘোষণা সমর্থন করেছিল, এবং শত বছর পর এসে তার জন্য ক্ষমা চাইল। কারণ, (আপাতদৃষ্টিতে) তাদের শতবর্ষ উপলক্ষে তারা নিজেদের সবকিছু পর্যালোচনা করেছিল, আর তার মধ্যে এই বিষয়টি ছিল প্রধান আলোচ্যগুলোর একটি।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেছিল। আমরা *নিউ ইয়র্ক টাইমস* এর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কথা অনেক শুনি, কিন্তু ইরাকের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখিনি। সত্যি বলতে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রগুলো ইরাকে ছিল। আসলেই ছিল। এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সেগুলো কোথায় ছিল জানেন? শুধু পশ্চিমা মিডিয়াতেই, মাঠপর্যায়ে নয়। *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* ও বছরখানেক পর ক্ষমা চেয়েছিল। বলেছিল, ‘আমরা ইরাকের বিষয়ে ভুল ছিলাম।’ ইরাকে প্রায় ১০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন। ১০ লাখ।

এই কারণেই আমি বলছি, এইসব পত্রিকা বা পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো মূলত তাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে। নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ খবরের ক্ষেত্রে দেখবেন তারা পেশাদার। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদের ক্ষেত্রে তারা সবসময় নিজেদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাথেই একাত্ম থাকে। এটা থেকে আমরা বের হতে পারি না।

দ্য আটলান্টিক এর করা একটা মজার স্টোরি দেখতে পারেন। সম্ভবত দুই মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়েমেনে বোমা হামলার আগে সিগন্যাল অ্যাপে একটি গ্রুপ খুলেছিল। আমার মনে হয়, সবার এই ঘটনাটি মনে আছে। পরে তারা বলেছিল যে ভুল করে তারা *দ্য আটলান্টিক* এর মতো নামকরা একটি ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদককে সেই গ্রুপে যুক্ত করেন। ফলে তিনি তাদের পুরো কথোপকথন দেখতে পান। পরদিন এটি বড়সড় একটি কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়, যেহেতু তারা ইয়েমেনে বোমা হামলার পরিকল্পনা করছিল। এখন সেই প্রধান সম্পাদক, যিনি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জন্য পরিচিত, তিনি পুরো আলাপটা দেখলেন ও পরিকল্পনাটা দেখলেন। কিন্তু তিনি খবরটা প্রকাশ করলেন কখন? যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনে বোমা হামলা চালানোর পরে, তার আগে নয়। ভাবুন তো, যদি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে কোনও সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা তিনি জানতেন, তাহলে কি তিনি হামলা হওয়ার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন? আমরা কি এটাই শিখি না যে, সাংবাদিকতা হলো মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য? তাহলে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে তার সম্পাদকীয় এজেন্ডা মানুষের জীবন বাঁচানো নয় বা ইয়েমেনে প্রাণহানি বন্ধ করা নয়, বরং ছাপানোর মতো খবর। তাই তিনি সবকিছু প্রকাশ করলেন তখন, যখন ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, যখন সাধারণ মানুষ বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন। এই ধরনের আচরণ ও প্যাটার্ন আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং গাজায় স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

আমাদের সহকর্মী ওয়ায়েল আল-দাহদুহ। যখন তিনি তার ছেলেকে হারিয়েছেন, এবং আরও আগেই তার নাতনি, তার স্ত্রী এবং তার আরেক ছেলে সন্তানকেও হারিয়েছিলেন, তখনও তিনি গাজার কণ্ঠ ছিলেন। আসলে সারা বিশ্বের কণ্ঠ ছিলেন। আমি পর্দায় তাকে দেখলে কিংবা তার কথা শুনতে পেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করতাম। তাই সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানো খুব সহজ, আর তারপর আপনারা বলেন ‘স্যরি’। প্রতি বছর ২ নভেম্বর আমরা বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের স্মরণ করি। আমরা তাদের হত্যাকারীদের খুঁজি ও যারা সাংবাদিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে বা তাদের ওপর হামলা চালায় তাদের চিহ্নিত করি। কিন্তু বাস্তবে আসলে এটাই শাস্তি এড়ানোর পথ। অপরাধ করে ক্ষমা চাওয়াটাই হচ্ছে দায়মুক্তি। একদম, এটাই দায়মুক্তি। এটাই দায়মুক্তি এবং আমরা আর তাদের বিচারের আওতায় আনতে পারি না।

এই কারণেই আমি মনে করি, এবং প্রথম দিন থেকে আমরা যা শিখে আসছি, সাংবাদিকতা হলো ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা, সব ধরনের কর্তৃপক্ষকে পর্যবেক্ষণ করা যেন তাদের প্রশ্ন করা যায় ও জনমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ আমাদের গণমাধ্যমকেই প্রশ্ন করতে হচ্ছে।

আমি মনে করি কিছু গণমাধ্যম, কিছু সাংবাদিক এই গণহত্যায় জড়িত। তারা সহযোগী (complicit), তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘনকে বৈধতা দিচ্ছে। যখন তারা বলে হামাস যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে ইসরায়েল হাসপাতালে বোমা মেরেছে, তখন তারা মূলত বেসামরিক স্থাপনা (civilian establishment) আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করাকে বৈধতা দিচ্ছে, যেটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। এটি একটি যুদ্ধাপরাধ। যখন আপনারা ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডাকে গ্রহণ করছেন, সেটাও যুদ্ধাপরাধ। আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে প্রশ্ন করতে শিখেছি, ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডাকে যাচাই করতে শিখেছি, এবং এটা স্পষ্ট যে এগুলো সত্য নয় বরং বানানো খবর। যখন ইসরায়েলের মুখপাত্র কিছু বলে, *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট* বা অন্যান্য মূলধারার পশ্চিমা গণমাধ্যম তা সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তারা সেটাকে পুনরুৎপাদন করে, একে ‘খবর’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তখন সেটাই হয়ে যায় ‘সত্য’ আর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আজকেও একই ঘটনা ঘটল। গাজায় একটি বড় ভবন বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইডিএফ (ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স) একটি ভিডিও ছড়িয়ে দিল, যেখানে বলা হচ্ছে এই ভবনটি নাকি গাজায় প্রতিরোধ বাহিনীর একটি কেন্দ্র ছিল, সেখানে ইসরায়েলিদের ওপর নজরদারির জন্য ক্যামেরা বসানো ছিল। একটি বিশাল ভবন তারা ধ্বংস করে দিল। কিন্তু এটাই প্রোপাগান্ডা। কে যাচাই করবে যে এটা মিথ্যা ছিল? ভবনটি গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পর? কিন্তু ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডা ঠিকই ছড়িয়ে পড়ছে। কোথায়? পেশাদার, মুলধারার গণমাধ্যমেই।

আমার মনে হয় বিষয়টি অনেকটা রুয়ান্ডান গণহত্যার মতো। রুয়ান্ডার গণহত্যায় কিছু রেডিও স্টেশন ও পত্রিকাকে আদালতে নেওয়া হয়েছিল কারণ তারা ওই হত্যাকে বৈধতা দিয়েছিল, রুয়ান্ডার মানুষগুলোকে অমানবিক বস্তুতে পরিণত করেছিল। গাজায়ও একই জিনিস হচ্ছে। কেন? আমি কল্পনাও করতে পারি না যে পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন কিছু ঘটলে গোটা দুনিয়া তা মেনে নিত। অথচ গাজার ক্ষেত্রে সেটা মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ কাঁদি, তারপর আবার নিজেদের জীবনে ফিরে যাই। আমি বুঝতে পারি না, পৃথিবী কোথায় এসে পৌঁছেছে? এই গ্রহের কী হয়েছে? প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচার হওয়া একটি গণহত্যাকে মেনে নিচ্ছে! প্রশ্নও করছে না কেন সাংবাদিকতার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সবার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য নয়? কেন তা গাজার জন্য প্রযোজ্য নয়?

তাই আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এই গণহত্যায় জড়িত সব গণমাধ্যমকে চিহ্নিত করতে থাকব। যদি এটাই আমার জীবনের শেষ মিশন হয়, তাহলে আমি এটাই করে যাব। আমি তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকব, যাতে আমরা তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে পারি; খুনিদের মতো এদেরকেও আমাদের আদালতে আনতে হবে। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ●

ইংরেজীতে প্রদানকৃত মূল বক্তৃতার বাছাইকৃত অংশ অনুবাদ করেছেন ইসাবা শুহ্‌রাত। পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতাটি দৃক বুকস হতে প্রকাশিত হয়েছে।

Montaser Marai: Media Genocide in Gaza (Golam Kashem Daddy Lecture on Drik's 36th Founding Anniversary), Dhaka: DrikBooks, 2026

সাংবাদিকতার হালচাল

শেষ পাতা

বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ । ৯ আশ্বিন ১৪৩৩ । ১২ রবিউস সানি ১৪৪৮

জাতীয় প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সংগঠন

জুলাই পরবর্তী দলীয়করণের নতুন অধ্যায়

সামিয়া রহমান প্রিমা

আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ বেশিরভাগ সাংবাদিক সংগঠন সমূহের চূড়ান্ত দলীয়করণ হয়েছিল। ৫ আগস্ট ২০২৪, শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অবস্থিত আওয়ামীপন্থী সাংবাদিকদের কার্যালয়ের তালা ভেঙে চলে ভাঙচুর। প্রেস ক্লাবে আওয়ামী সমর্থক নেতাদের দ্বারা স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ভেঙে ফেলা হয়। দেশের অনেক জেলার প্রেস ক্লাবেই দফায় দফায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আমলে ১৯৫৪ সালের ২০ অক্টোবর, প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেস ক্লাব। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিল থেকে শুরু করে পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের লড়াই ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার লড়াই, জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতে আন্দোলন ও সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রেস ক্লাব। দেশের জ্যেষ্ঠ ও পেশাদার সাংবাদিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্র ছিল এই প্রেস ক্লাব। ঠিকানা ১৮ নম্বর, তোপখানা রোডের 'লাল ইটের দালান' উল্লেখ করে জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্মৃতিচারণ করেছেন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, নির্মল সেন, এ বি এম মূসাসহ সাংবাদিকতার কিংবদন্তিরা। এই প্রেস ক্লাব থেকেই গণমাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস লিখেছিলেন তারা। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সংবাদকর্মীদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যে প্রেস ক্লাব, সেই প্রেস ক্লাব তার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলীয় স্বার্থ রক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার কারণেই – জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী হামলা-আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে মনে করেন আন্দোলনকারীদের অনেকেই।

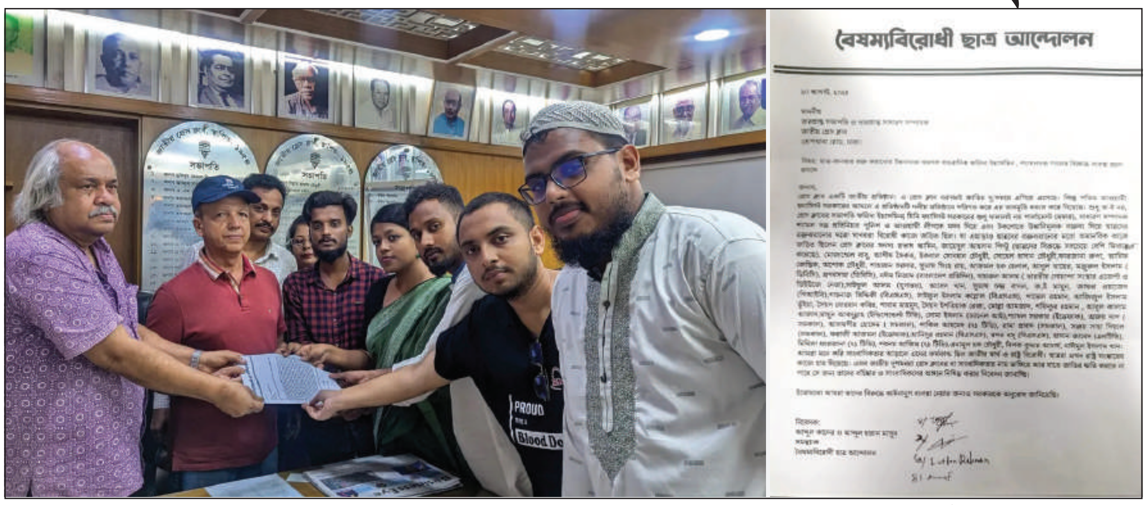

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা আওয়ামী লীগের পতনের পর প্রেস ক্লাবের নতুন নেতৃত্বের কাছে আওয়ামী ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের তালিকা প্রদান করে তাদের সদস্যপদ বাতিলের দাবি জানান। জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা। ১০ আগস্ট ২০২৪। ছবি: সময়ের কণ্ঠস্বর

জাতীয় প্রেস ক্লাব নেতৃত্বের পতন ও উত্থান

হামলা-মামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে ২০২৪ এর ৫ আগস্ট থেকেই প্রেস ক্লাবের আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আগের নেতৃত্ব পলাতক হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট ২০২৪, প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কবি ও সাংবাদিক হাসান হাফিজ। ১১ আগস্ট ২০২৪, হাসান হাফিজের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হাসান হাফিজকে সভাপতি ও আইয়ুব ভূঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হাসান হাফিজ এর আগে সহ-সভাপতি ছিলেন এবং আইয়ুব ভূঁইয়া ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। এই সভায় আরও জানানো হয়, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা গত ১০ আগস্ট ২০২৪, জাতীয় প্রেস ক্লাবে কয়েকজন সাংবাদিকের সদস্যপদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। সেই মোতাবেক ফরিদা ইয়াসমিন, শ্যামল দত্ত এবং শাহনাজ সিদ্দিকী সোমাকে ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানসহ তাদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। সেসময় তৎকালীন সমন্বয়ক আব্দুল কাদের ও আব্দুল হান্নান মাসউদ স্বাক্ষরিত সাংবাদিকদের একটি তালিকাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রেস ক্লাবের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য সাংবাদিক জানান, 'বার্ষিক সাধারণ সভা করে এর মধ্য দিয়ে কো-অপশন [নিজস্ব স্বার্থে নিজ বলয়ের নতুন সদস্য নির্বাচিত করা] করে সবকিছু বৈধ করল। আবার কিছুদিন পরপর আগের সদস্যদের বহিষ্কার করতে থাকল। সদস্য নির্বাচনে নিয়ম অনুযায়ী যাচাই-বাছাই কমিটিসহ যেসব প্রক্রিয়া ছিল, কিছুই মানা হচ্ছে না। আগে অন্তত দুই ইউনিয়নের সুপারিশ দেওয়ার সুযোগ ছিল। আওয়ামী লীগের প্রভাব বেশি ছিল, আবার পাশাপাশি কক্ষে এক ধরনের সহাবস্থান ছিল। এখন একদম একতরফাভাবে সবকিছু হচ্ছে।'

এই প্রতিবেদককে তিনি আরও বলেন, 'এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, কিছুক্ষণ পরে আমার মেম্বারশিপ থাকবে কি না কোনো গ্যারান্টি নাই, পরিস্থিতিটা এরকম।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অন্তবর্তী সরকারের দেড় বছরে প্রায় আড়াইশ জনের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে অনেক সদস্যপদ, নতুন সদস্যপদ পেয়েছেন প্রায় দেড়শ। অভিযোগ রয়েছে, নতুন সদস্যদের মধ্যে অনেক অসাংবাদিকও রয়েছেন। আওয়ামী লীগের আমল থেকেই প্রেস ক্লাবে অসাংবাদিকদের সদস্যপদ পাওয়ার জনশ্রুতি রয়েছে।

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর প্রথম সাধারণ সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা জানান, সেসময় দলীয় বলয়ের বাইরে থাকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের মধ্য থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব গঠনের প্রস্তাব আসে। একইসঙ্গে ঢালাওভাবে নতুন সদস্যপদের বিষয়ে পর্যালোচনার দাবিও উঠে। এমন প্রস্তাবে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং প্রস্তাব করা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের একপ্রকার লাঞ্ছিত করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে এই সভায় পরিচিত আওয়ামীপন্থী সাংবাদিকরা মূলত নীরব ছিলেন।

সাংবাদিকরা মনে করেন, সরকার পতনের এক সপ্তাহের মধ্যেই একতরফাভাবে নির্বাচিত হয়ে নতুন যে নেতৃত্ব এসেছে তারা নির্বাচন দিয়ে স্বল্প সময়ে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে চাইবেন না। নীতিমালা অনুযায়ী দুই বছর পরপর নির্বাচন হয়ে থাকে এবং সে হিসেবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই প্রেস ক্লাবের নির্বাচন হওয়ার কথা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সেই নির্বাচন হয়নি। আরও এক বছর পর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে শুরু হয় ২০২৬-২৭ মেয়াদে নির্বাচনী প্রস্তুতি। তবে শেষ মুহূর্তে এই নির্বাচন স্থগিত করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেই প্রেস ক্লাবের নেতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই নির্বাচনে অংশ নিতে তিনটি প্যানেল গঠিত হয়:

১) সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুল হাই শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী কাদের গনি চৌধুরী
২) সভাপতি পদপ্রার্থী কামাল উদ্দিন সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ইলিয়াস হোসেন
৩) সভাপতি পদপ্রার্থী এম এ আজিজ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদ কামাল

জানা যায়, এই তিন প্যানেলের তিনজন সভাপতি পদপ্রার্থী ও দুইজন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্বাচন কমিশনের কাছে 'অনিবার্য কারণ' দেখিয়ে নির্বাচন স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে চিঠি দেন। এই প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, 'তিনটা প্যানেল থেকেই আমি বাদে সবাই মিলে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছে, নির্বাচন কমিশনও অনিবার্য কারণে নির্বাচন স্থগিত করেছে। আমাকে কেউ বলেনি, ডাকেনি, কিছুই জানি না। এখন এই অনিবার্য কারণটা কী জানতে চাইলে ঠিকমতো কিছুই বলেন না। আসলে কোনও সদুত্তর নেই।'

নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জানানো হয়, ঈদের পর সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচন প্রস্তুতি নেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ বেড়ে যায়।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে সার্বিক অনিয়মের অভিযোগ ও নির্বাচন স্থগিত করার বিষয়ে জানতে সভাপতি হাসান হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

বিএনপির হাত ধরে সাংবাদিক সংগঠনের দলীয়করণের ইতিহাস

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আমলেই তাদের দলীয় স্বার্থরক্ষার প্রক্রিয়ায় সাংবদিকদের ঐক্য ভেঙে যায়। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ছিলেন তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী। এই সময়ে ইউনিয়নে সদস্য অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়, আন্তঃকলহ শেষে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি কক্ষের মাঝে দেয়াল ওঠে। সেই থেকেই ভাঙন, মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তখন মালিকপক্ষ প্রয়োজনে ইউনিয়নের অফিসে আসতেন। সাংবাদিকরা মনে করেন, এই বিভক্তি ও দলীয় স্বার্থে সাংবাদিক সংগঠনসমূহ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় ক্ষতিসাধন হয়েছে। অধিকার, নিরাপত্তা-সুরক্ষা ও এই পেশার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

সাংবাদিকদের দলীয় বলয়ের বাইরে আসা ও পরিবর্তন আনার লক্ষ্যেই এবার নির্বাচন করতে চেয়েছেন উল্লেখ করে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাসুদ কামাল আরও বলেন, '৯১ সালে বিএনপি আমলের ভাঙন থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বলয়ে থাকাতে সাংবাদিক সংগঠনগুলো মারাত্মক মতাদর্শিক ক্ষতি সাধিত হয়। আওয়ামী লীগ আমলে শফিকুর রহমানরা (প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি) বলতে গেলে গায়ের জোরে প্রেস ক্লাব দখল করেছেন। এত দলীয় ব্যক্তি সদস্যপদ পেয়েছেন যে এই দলের (আওয়ামী লীগ) ভোটার অনেক বেশি ছিল। তখন থেকেই অসাংবাদিকদের সদস্য বানানোর সংস্কৃতি শুরু হয়। আবার শওকত মাহমুদ সভাপতি থাকাকালীন বিএনপিপন্থীদের দল ভারি ছিল। এখন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ইচ্ছেমতো সদস্যপদ বাতিল হচ্ছে, আবার তাদের দল ভারি করতে ইচ্ছেমতো সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকের পেশাগত স্বার্থ রক্ষার কেউ নেই।'

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে চাকরিচ্যুত একজন সাংবাদিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বকেয়া পাওনার আশায় এক বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানের আমরা প্রায় ৩০ জন ভুক্তভোগী সাংবাদিক, নেতাদের পেছনে ঘুরছি। বকেয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ, সবই পাওনা আছে। সাংবাদিক নেতাদের মাধ্যমে মধ্যস্থতা চলছে বলে সবাই মিলে মামলার সিদ্ধান্তও নিতে পারছি না।' সাংবাদিক নেতাদের চাওয়া-পাওয়া, সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের জন্য গোটা সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজের এই বিশাল ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে মনে করেন ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা।

দেশজুড়ে প্রেস ক্লাবে হামলা, অব্যাহত দলীয়করণ

আওয়ামী লীগ আমলে প্রেস ক্লাবের নিচতলায় পাশাপাশি দুটি কক্ষে বিভক্ত সাংবাদিক ইউনিয়নের দুই পক্ষের আলাদা কার্যক্রম চলত। সাংবাদিকদের বিভক্ত ইউনিয়নকে 'বিএনপিপন্থী' ও 'আওয়ামীপন্থী' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অতীতে 'জামায়াতপন্থী' সাংবাদিকরা সাধারণত প্রকাশ্যে পরিচয় দিতেন না। ফলে আওয়ামী লীগের প্রায় ১৬ বছরের আমলে তারা কোথায় বিরাজ করেছেন তা বলা মুশকিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের মতে, জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি, দুই পক্ষেই বিরাজ করেছেন। প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রেস ক্লাবে জামায়াতপন্থী সাংবাদিকরা দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন এবং সার্বিকভাবে তাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

খুলনার *মানবজমিন* পত্রিকার সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বলেন, 'আওয়ামী লীগ আমলে খুলনার প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সেক্রেটারি কারা হবেন তা 'রাজপরিবার' নামে খ্যাত (পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) ওই বাড়ি থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। খুলনায় ওই রাজপরিবারের একটা সাব-অফিস ছিল, যেখান থেকে ঠিক করা হতো সাংবাদিক নেতা কে হবেন, কীভাবে পরিচালিত হবে। আমরা এখন সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়েছি, তা নয়। খুলনার সাংবাদিক ইউনিয়ন, প্রেস ক্লাব কে পরিচালনা করবেন? বিএনপি নেতৃবৃন্দ চিন্তা করেন তারা করবেন, জামায়াত চিন্তা করে তারা পরিচালনা করবেন – এই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে আবারও সাংবাদিকতায় শুধু ক্ষমতার পালাবদল হলো। এই যে সাংবাদিক সংগঠনগুলো দলীয়করণ মুক্ত হতে পারছে না, এর অবসান হওয়া দরকার।'

২০২৪ সালের আগস্টে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে দফায় দফায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ৬২ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি বলে জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট চট্টগ্রামের ২৭০ জন সদস্য সাংবাদিক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে তারা জানিয়েছেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর সুযোগসন্ধানী দুর্বৃত্তরা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, ৬ আগস্ট, ১২ আগস্ট ও ১৪ আগস্ট পর্যায়ক্রমে চার দফায় হামলা চালিয়েছে। দেশীয় অস্ত্র, হাতুড়ি-শাবল নিয়ে ফটকের তালা ভেঙে বারবার ক্লাবে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালানো হয়। এসব ঘটনায় ২০-এর অধিক সাংবাদিক ও প্রেস ক্লাব সদস্য আহত হয়েছেন। এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় বাধা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ধ্বংসের পাঁয়তারা বলে মত দিয়েছেন চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা।

এছাড়া গত ২৯ অক্টোবর ২০২৪, নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এসময় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা বাধা দিলে দুই পক্ষের ধস্তাধস্তিতে আহত হন বেশ কয়েকজন। এই প্রেস ক্লাব সদস্যরা সেসময় গণমাধ্যমে বলেন, বাইরে থেকে প্রেস ক্লাব দখল করতে এসেছিল প্রায় ২৫ জনের একটি দল। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলে মাসুদ রানা রনি নামে একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নজরুল ইসলাম। সাংবাদিকরা জানান, আটককৃত রনি নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের মতে, ভাঙচুর-লুটপাট করা, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া সহ যে প্রক্রিয়ায় সদস্যপদ বাতিল ও নতুন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে, এসবই নিন্দনীয়। এসব কর্মকাণ্ড সাংবাদিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার ও সুরক্ষার পরিপন্থী। সাংবাদিকতার পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাংবাদিকদর অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলের সুযোগ-সুবিধা ও লেজুড়বৃত্তি থেকে বের হতে হবে বলে মত তাদের। ●

বিনিময় প্রিন্টার্স, ২৫। সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ৮৬৩১৮৪৪
প্রকাশনা: দৃক পিকচার লাইব্রেরি, দৃকপাঠ ভবন, ১৬, শুক্রাবাদ, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ০২ ৫৮১৫৫৭১৩, ০২ ২২২২৪৩১৯৮। office@drik.net